প্রথম সংস্করণ
মহালয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীমান মানসকুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
এস্. প্রামাণিক
সোমা মুদ্রণ
২এ, বেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

বাইণ্ডার্স
ঘোষ স্টেশনারী ওয়ার্কস
২৬।১এ, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

বেলা-পাঁচটার এক্সপ্রেস

হেমন্তের রিক্ত প্রকৃতির বুকে ভেসে চলেছে কয়েকজন শববাহকের দল, কৌতূহলী জনতার চোখের সামনে দিয়ে। তারপর সকলে যখন শ্মশানে এলো তখন শুরু হোল, বিবর্ণ ভাবসর্বস্ব শোকসঙ্গীত। কবরের মধ্যে মৃতদেহটা যখন মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন সেখানে উঠে এলো দশ বারো বছরের একটি বালক। সে যেন এই হেমন্ত ঋতুর থেকেও নিঃসঙ্গ। পাকা ধানের মতোই তাকে তুলে ফেলা হয়েছে তার মার বুক থেকে। সকলে যখন চুপ করে গেল তখন ছেলেটি যেন কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারল না। বাক্‌রুদ্ধ কান্নাকে ঢাকতে সে তাড়াতাড়ি মুখে ঢাকতে ব্যস্ত হোল। মামা নিকোলে নিকোলেভিচ এগিয়ে এলেন ছেলেটির কাছে। তারপর বোন মারিয়ার মৃত দেহের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শক্ত হাতে ছেলের হাত ধরলেন।

তারপর দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে গেলেন।

সে রাতের জন্ত তারা একটি কুঠুরিতে আশ্রয় পেল। কুঠুরির চারদিকে সব্জি ক্ষেত। তার পাশ দিয়ে একেবেঁকে সাপের মতো চলে গেছে রাস্তাটা— তার ওপাশেই তার মা শায়িত ঠাণ্ডা বরফ জমানো মাটির বিছানায়। সব্জি ক্ষেতের একপাশে বাঁধাকফির চাষ করা হয়েছে আর একদিকে একটা চওড়া দেয়াল যার পাশ ঘেঁষে একেশিয়ার ঝোপ বাতাসে নাচন শুরু করেছে।

বাইরের ঠাণ্ডার হাত থেকে ঘরের উষ্ণতাকে রক্ষা করার জন্ত বড় বড় জানালার কপাটগুলো নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাচের বাইরে থেকে ঝোড়ো বাতাসের উন্মত্ত গর্জন বালক ইউরাকে ভয় দেখাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ঘরে শুয়ে শুয়ে ইউরা একবার ভাবল কাপড় পরে এক ছুটে বাইরে গিয়ে দেখে আসে তার মা এখন কেমন আছে, তাঁর শীত করছে কিনা।

কিন্তু পারল না, বাইরের তুষার-ঝড় তাকে ক্রমাগত ভয় দেখাতে লাগল। অসহায়ের মতো কাঁদতে লাগল ও। ওর কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নিকোলের। যখন ইউরা শান্ত হোল তখন পূবের আকাশে সূর্য উঠতে আর দেরী নেই।

ছেলেবেলায় ইউরাকে বোঝানো হয়েছিল তার বাবা বিদেশে চাকরি করেন, সেজন্য বাল্যকালেই বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে। মায়ের চিকিৎসার জন্যও তাকে মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্স বা ইটালির উত্তরে যেতে হয়েছিল।

এখনও চেষ্টা করলে তার মনে পড়ে তার বাবার নামে বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কথা। এখনও তার স্বপ্নের মধ্যে এসে দেখা দেয় তাদের সেই স্বপ্নের মতো সুন্দর শান্ত নিরিবিলি ছায়াচ্ছন্ন শান্তিময় বাড়িটার কথা।

এরপরের যে দৃশ্যটা উঠছে সেটা হোল কোন এক গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত দুপুর। দুপাশে সোনালী গমের শোভা দেখতে দেখতে ইউরা চলেছে তার মামার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। সমস্ত গ্রামটা যেন ঘুমোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে ইউরার। কেবলমাত্র দু-একটা পাকা শস্যের লম্বা শীষ মাথা উঁচু করে দূরের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করছে যেন কেউ তার শস্যগুলো কেড়ে না নিয়ে যায়।

গাড়িতে করে যেতে যেতে নিকোলে একবার দূরের দিকে তাকিয়ে ফসলগুলোর ওপর দৃষ্টি রাখলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এই ফসলগুলো কার? যাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোন একজন প্রথিতযশা লেখকের কর্মচারী। পাভেল তার নাম। সে এখন নিজেই গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিকোলেকে সেই লেখকের কাছে, কেননা তিনিও চলেছিলেন ওই প্রকাশকের কাছে সংশোধিত প্রুফগুলো ফেরৎ দিতে। ওরা যখন কৃষি সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত তখন ইউরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারপাশে লক্ষ্য রাখছে। রাস্তার দুপাশে ঘন ঝোপ দেখলেই কেন জানি না তার মনে হচ্ছে এইবার বুঝি তার সেই চির পরিচিত মাঠ, নদীর সাক্ষাৎ সে পাবে। তারা দেখা দেয় না বটে, কিন্তু বালক জানে এই উদার উন্মুক্ত বিশাল প্রকৃতি সুদূরের দিকে হাতছানি দেয়।

একই সঙ্গে নতুনের জন্য, সত্যের জন্য, আনন্দের জন্য এক অনুভূতি জন্মলাভ করে নিকোলের মনে। তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে, এই অনুভূতির সার্থক প্রকাশই একদিন ইউরাকে বিখ্যাত করে তুলবে পৃথিবীর অন্যান্য খ্যাতকীর্তি মানুষের মতোই। শান্ত সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভূপ্রিয়ানকা গ্রামের প্রকৃতির স্নেহস্পর্শ গায়ে মাখতে মাখতে ইউরার মনে হয় বুঝি তার মা জীবন্ত হয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতি-প্রেমিক মামার কাছে থাকতে তাই ভালো লাগে ইউরার।

আর একজনের কথাও এই সঙ্গে মনে পড়ে যায় তার। স্কুলের ছাত্র নিকি ভুভোরস্কের সেই সাদর অভ্যর্থনার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

ঘরে বসে লেখক ইভান ইভানোভিচের সঙ্গে প্রুফ দেখছিলেন নিকোলে। বাইরের তুষার ঝড় থেকে ঘরের উষ্ণতাকে বাঁচাবার জন্য বারান্দায় চারপাশ ঢেকে দেবার ফলে ঘরটা আধো অন্ধকারে রহস্যময়। দরজার বাইরে বাগানে কাজ করার সরঞ্জামগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ চলে গেল নিকোলের। বললেন, বিদায় বন্ধু, বাড়ি যাই, নইলে ঝড় এসে যাবে।

কিন্তু কিছুতেই তাকে যেতে দিলেন না ইভান। দাসীকে ডেকে চা-জলখাবার আনার হুকুম করলেন। তারপর বললেন—চলো বাইরে ঘুরে আসা যাক।

জমিদার কলোগ্রিবলের বাড়ি এখান থেকে কিছু দূরে। বাড়ীটাতে তার দুই মেয়ে নাডিয়া আর শিপা থাকেন, আর থাকেন তাদের শিক্ষয়িত্রী ও দাস-দাসীবৃন্দ।

আস্তে আস্তে জমিদার বাড়ীর পাশ দিয়ে নায়েবের বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যানের ধার ঘেঁষে মালির ঘর পেরিয়ে দুজনে সাহিত্যালোচনা করতে করতে এগিয়ে চললেন।

'আমার মনে হয় ইভান, যারা প্রকৃত সত্যকামী তারা নিজের মনে মনে বড্ডো নিঃসঙ্গ। তাই না? আমার তো মনে হয় নশ্বর পৃথিবীর মধ্যে আত্মাই একমাত্র চিরকাল বেঁচে থাকার অধিকার পায়, তাই না? আর আত্মার প্রতি এই বিশ্বাস থেকেই মানুষ সত্যের সন্ধানে আগ্রহী হয়।'

'উহুঁ, আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না নিকোলে।' দাড়িতে হাত বুলিয়ে তার ডগাটা কামড়ে ধরলেন ইভান। তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, 'আচ্ছা তুমি পুরোহিতের পোষাকটা পাল্টাবার সময় জনসাধারণ বিরক্ত হয়ে ওঠেনি তো?'

সঙ্গীর দিকে একবার তাকিয়ে তার মনোভাবটা বুঝতে দেরী হোল না নিকোলের। বিরক্তি চেপে বললেন, 'তার জন্য মস্কোর পিটার্সবার্গে যাওয়া বাদ আমার। কিন্তু কি যেন তোমায় বলছিলাম'—সব কিছু ভুলে গিয়ে আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাইলেন নিকোলে। তারপর একটানা বক্তৃতা শুরু করলেন মানুষের জীবনের বাস্তব আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের স্বরূপ সম্পর্কে। যখন তার চোখ পড়ল যে তিনি কেবল একাই বকে যাচ্ছেন, তার সঙ্গীর কোন কৌতূহলই নেই এ ব্যাপারে তখন মনের বিরক্তিভাবকে তিনি আর চেপে রাখতে পারলেন না। কিছু

বলবার জন্ত তার দিকে চোখ ফেরাতেই তার চোখে পড়ল নদীর জলে কে যেন সিঁদুর গুলে দিয়েছে। ওপরের আকাশটাও লালে লাল হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ধাক্কায় নদীর লাল জল কেঁপে কেঁপে উঠছে।

দূরে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা যেতে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা ছোট পরিচ্ছন্ন রঙিন বাচ্চাদের খেলার ইঞ্জিনের মতো একটা গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কিন্তু একেবারে কাছে আসতেই গাড়িটা হঠাৎ থেমে যেতেই দুজনে অবাক হোল। তারপর দৃষ্টি বিনিময় করে বাড়ির দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়ালেন, তারপরে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

সারা বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও নিকিকে দেখা পেল না ইউরা। বাগানে খালের ধারে নেমে এলো ও। বাতাসে ফুলের গন্ধে, দূরে মধুর বাঁশীর সুরে আর পাখিদের সুরেলা কণ্ঠে সে যেন তার হারিয়ে যাওয়া মার উপস্থিতি অনুভব করতে লাগল। যেখানেই যেতে লাগল ও সেখানেই মনে হোল ওর মা যেন ওর পিছু পিছু চলেছেন, ওকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছেন। আনন্দে সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে যেতে লাগল ইউরার। দুহাত জোড় করে কান্নাভেজা গলায় ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল মায়ের আত্মার শান্তি কামনায়। যখন হুঁশ হলো তখন শুনতে পেল ওর মামা ওকে ডাকছেন। তাড়াতাড়ি মাটি থেকে উঠে পড়ল ইউরা। সামনের দিকে ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মনে পড়ে গেল বাবার কথা। আর একদিন তাঁর জন্ত প্রার্থনা করা যাবে ভেবে সামনের দিকে পা বাড়ালো ও।

চলতে চলতে রেলগাড়িটা থামতেই কালো গভীর দু'চোখও থমকে দাঁড়িয়ে গেল মিশার। ওর বাবা গ্রিগরির সঙ্গে মস্কোতে চলেছে। ওর মা আর দিদিরা আগেই চলে গিয়েছে ওদের নতুন বাসায়। সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ে যায় ওর, চোখে পড়ে দূরে অপেক্ষমান সূর্যের রক্তিমাভায় রাঙানো ঘোড়ার পাগুলো; চলমান জনতাকে দেখে ওর মনে হয় যেন আর সকলেই এই জগতে বিচিত্র সুখের সন্ধানে সততই ব্যস্ত।

এই চলমান জগতের মধ্যে নিজেকে বড়ো একা আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় মিশার। মাঝে মাঝে ও এর কারণ জানতে চায় ওর বাবার কাছে। কিন্তু যখন কোন সন্তোষজনক উত্তর পায় না তখনই তার বিক্ষুব্ধ মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

ও কিছুতেই বুঝতে পারে না ওই লোকটি যখন চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে পড়ল তখন কেন ওর বাবা ট্রেনের শিকল টেনে গাড়ির

দুরন্ত গতিকে থামিয়ে দিলেন, আর গাড়িটা কেনই বা মূল্যবান সময় নষ্ট করে চলতে এতো দেরী করছে। গাড়ির যাত্রীরাও ভালো করে বুঝতে পারছিল না কেন গাড়িটা হঠাৎ এমন করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত পেশ করতে আরম্ভ করল।

মিশার সামনে দিয়ে চলে গেল কয়েকজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা, যাদের মুখের উগ্র পেণ্ট তাদের বয়সকে আর ঢাকতে পারবে না। গাড়ীর কয়লা আর উগ্র কসমেটিকের সাহচর্যে তাদের মুখটা আরও বেশী স্ফীত হয়ে পড়েছে। চাপা ঠোঁটের ওপর ফুটে উঠেছে স্পষ্ট অবজ্ঞা।

নদীর ধারে কাদার ওপর রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত যে শরীরটা পড়ে আছে সে এই গাড়ীরই একজন যাত্রী। তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে উকীল ভদ্রলোকটি তিনি সকলের প্রশ্নের উত্তরে রীতিমত অবজ্ঞা করে তার একদা সঙ্গীর মৃতদেহের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'মাতালের এইরকম দশাই হয়।' গাড়ীর কামরা থেকে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা নেমে এলেন তারপর পড়ে থাকা মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করে বুকের পাঁজর ফাটানো একটা দীর্ঘনি শ্বাস ফেললেন।

কামরায় বসে থেকে প্রকৃতির এই রঙবাগানো গোধূলির সূর্যকে দেখে মৃতদেহটা মনে করে বুকে একটা প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করল মিশা। মনে পড়ে গেল, বাবার কথা আর একটু আগের ঘটনাগুলোর কথা। বাবা বলেছিলেন ভদ্রলোকের নাম-জিভাগো। ইনি একদা বিত্তবান ছিলেন কিন্তু এখন তিনি প্রায় অর্ধ উন্মাদ। গ্রেগরি জিভাগোর কাছ থেকেই তার স্ত্রী ও ছেলের কথা জেনেছিলেন। মিশাও দেখেছিল একটু আগেই ভদ্রলোক তার বাবার হাত ধরে কি বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু বলতে না পেরে দরজা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

ওর কথা মনে করে কখন যে মিশার দুচোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ছে তা ও জানে না। যখন হুঁশ এলো তখন দেখল সামনের জনতা গাড়ির ওপরে যে যার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে আর তখন পুলিশ জিভাগোর মৃতদেহটাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে টেনে তুলল। মৃতদেহটাকে গাড়িতে তোলার সময় মিশার চোখেও বুঝি জল এসে গেছিল। যখন ও চোখ মুছে বাইরে তাকাল তখন ট্রেনে দোলা লেগেছে, নির্বিকার মুখে গাড়িটা তার গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

বাইরে অতিথিদের পদশব্দ শুনে বেশ বিরক্ত হোল নিকি। তারপর তাদের

থেকে আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি খাটের নীচে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল ও নিকোলে আর ইভান জানতেও পারলো না যে তাদের আলোচনার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অদৃশ্য উপস্থিতি ঘটেছে।

যা হোক আধ ঘণ্টা বাদে নিকি যখন বাগানে গেল তখন আকাশটা ভালোভাবে পরিষ্কারও হয়নি। আকাশের কোণে কোণে তখনও জমাট অন্ধকার বেঁধে আছে। পায়ের ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে গেল ওর, কিন্তু সেদিকে ওর কোন নজরই ছিল না। ও তখন বাগানের চঞ্চল গাছগুলোকে শাসন করতে ব্যস্ত।

নিকির বাবা ডেমেণ্টি নির্বাসিত, আর মা বাইরের হুজুগে সর্বদাই ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। মা নিকিকে বহু নামেই ডাকতেন। খাটের তলায় বসে বসে নিকি ঠিক করে নিয়েছে যে ওর নামটি কোন ধরণের হবে সে সম্পর্কে মাথা গলানোর জন্য ইভানকে শাস্তি দেবে। ও শাস্তি দেবে আর একজনকে।

ওর চৌদ্দ বছর বলে মাত্র এক বছরের বড়ো নাডিয়া ওকে দেখলেই মুখ বিকৃত করে। নিকি ভাবে ওর মা-ও ওকে ধোকা দিয়েছে। তাই ও ভাবে সকলকে ও শাস্তি দেবে এবার! তারপর চুপচাপ সাইবেরিয়ায় ফিরে যাবে। সেখানে বাবা আছেন; তার সঙ্গে যোগ দেবে ও।

দুহাত বাড়িয়ে নিকি আর নাডিয়া জল থেকে শালুক ফুল তুলতে ব্যস্ত ছিল। ফুল তুলতে তুলতেই নিকি বলল, 'স্কুলে যেতে আমার একদম ভালো লাগে না'।

'তাই নাকি, আমি তো আবার অঙ্কটার জন্য তোমার সাহায্যই নেব ভাবছিলাম।' বললে নাডিয়া।

ওর ঠাট্টাটা গায়ে না মেখে নিকি বললে, 'তুমি কাকে বিয়ে করবে?'

"কাউকেও না।" উদাস মনে জবাব দিল নাডিয়া।

এবার রেগে গেল নিকি। ভয় দেখাল ওকে জলে ডুবিয়ে রাখার। মারামারি করতে করতে জলে পড়ে গেল দুজনে। যখন জল থেকে উঠল তখন রাগ আর বিরক্তিতে নাডিয়ার মুখটা বিস্ফোরকের মতোই ভয়ঙ্কর, আর যন্ত্রণা আর বেদনায় অবশ নিকি চিৎকার করতেও ভুলে গেছে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকার পর নাডিয়াই প্রথমে কথা বলল, 'তুমি একটা পাগল।' বয়স্কের মুখের ভাব এনে নিকি জবাব দিল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

সারাটা পথ যেতে যেতে নিকির হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার স্বভাবটার কথা। মনে মনে চাইল, আবার নাডিয়ার সঙ্গে জলে পড়তে। কিন্তু উত্তরটা পেল না বলে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

অন্য দেশের ললনা

জাপানের সঙ্গে একটা শান্তিময় সহাবস্থানের আগেই বিক্ষুব্ধ রাশিয়ার বুকে জেগে উঠল নানা বিদ্রোহ। স্বামী মারা যাবার পর তাই সামান্য কিছু সম্বল নিয়ে মেয়ে লারিসা আর ছেলে রডিয়নকে নিয়ে উরাল থেকে মস্কো চলে এলেন শ্রীমতী গুইশার। তারপর হাতের অবশিষ্ট টাকা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে লেফটন্যান্টের দরজির দোকানটা কিনে ফেললেন—অবশ্য সবই তিনি করেছিলেন স্বামীর বন্ধু বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী কমারোভস্কির পরামর্শে। এর পরামর্শেই ছেলে রডিয়ন ভর্তি হোল সামরিক স্কুলে আর মেয়ে লারিসা ভর্তি হোল হাইস্কুলে—ওখান থেকে সহপাঠিনী নাডিয়ার সঙ্গে ওর ভাব। কমারোভস্কির সামনে আসতে নাডিয়া রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে।

মণ্টেনিগ্রো হোটেলের দারিদ্রপূর্ণ নোংরা পরিবেশে অসুবিধা বোধ করছিল না ওরা। কেননা, বাল্যকাল থেকেই ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ওদের মার সোনালী চুলে ঘেরা দুর্বল হৃদয়ে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। পাশের ঘরের প্রতিবেশী ভদ্রলোক মাকে খুব সাহায্য করেন। যাবার সময় কমারোভস্কি ও মার আলোচনার সুবিধার জন্য নিজের ঘরটাও মাঝে মাঝে ছেড়ে দেন। লারা আর রডিয়ন জানে ভদ্রলোক কোন একটা থিয়েটার হলে ঢোল বাজান। খুব সুন্দর ওঁর হাত। ভদ্রলোক ওদের পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছেন। ওদের প্রকাণ্ড পারিবারিক ব্যাপারে মা এক ভদ্রলোকেরও সাহায্য চান. ভদ্রলোকের নাম টিশকোভিচ।

শ্রীমতী গুইশারের সেলাইয়ের দোকানটি রেলওয়ে ইঞ্জিনের ডিপোর কাছে। ওর কাছাকাছিই রেলকর্মচারীদের কোয়ার্টার। ওলিয়া ডেমিনি—যার কাকা রেলের একজন কর্মচারী—দুঃখ কষ্টে চালাকচতুর এই মেয়েটি শ্রীমতী গুইশারের সেলাইয়ের দোকানে কাজ করে। দোকানের মালিকের সে খুব প্রিয়পাত্রী,

লারা গুইশায়কেও সে ভালবাসতো খুব। ছোট্ট সেলাই ঘরটার মধ্যে অসংখ্য মেসিন একটানা কাজ করে চলেছে। মেয়েরা কেউ কল চালাচ্ছে, কেউ সেলাই করছে, কেউ বা ব্যস্ত মুখে মাপ দেখে দেখে কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটছে।

বসবার ঘরের দরজার দিকে একটা টুল পেতে বসে আছেন হৃষ্টপুষ্ট ধূমপানে কেতাদুরস্ত মহিলা ফেসটিকভা। ওপাশের কাউন্টারে দলবদ্ধ মহিলাদের গায়ের মাপ, অর্ডার আর খদ্দেরদের ঠিকানা লিখে রাখেন একটা লম্বা খাতায়। মাঝে মাঝে হলদে দাঁত দিয়ে চেপে ধরা হাতের সিগারেট হোল্ডারের ধার দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠতে থাকে।

কর্মচারীদের সততা আর কর্মদক্ষতার ওপরেই নির্ভর করতে হোত গুইশায়ের। মাঝে মধ্যে যখন কমারোভস্কি আসতেন তখন সকলেই তার দৃষ্টির সামনে পড়ে কেমন যেন বিব্রতবোধ করত। আড়ালে এই বুড়ো ভদ্রলোকটির উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য ছুঁড়ে দিত হয়ত।

একদিন লারার পায়ের মোজাটা ছিঁড়ে দিল কমারোভস্কির কুকুর ম্যাক। রাগে বিরক্তি ভরা চোখে ওর দিকে তাকালো লারা। বিরক্তি মাখানো মুখে ওলিয়া বলে উঠলো, তোমার মার ঘর থেকে পাথরের ডিমগুলো নিয়ে এসো তারপর দেখো, বদমাইসটাকে আমি কেমনভাবে সাজা দিই। লারা অবাক হোল, ভেবেই পেল না মার আলমারীতে সযত্নে রাখা পাথরের ডিমগুলো দিয়ে ও কেমন করে কুকুরটাকে জব্দ করবে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গের তরঙ্গ অনুভব করছিল লারা। সত্যিই অসামান্য সুন্দরী ও। বয়সের তুলনায় ওর স্বাস্থ্য বেশ উন্নত ধরণের।

ছুটির দিন বলে ওর আজ আর কোন তাড়া নেই। ইস্কুলও বন্ধ। অলস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে রাস্তার লোকজন দেখতে দেখতে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল লারার। সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল ওর। এই নির্জন ঘরের মধ্যেও ওর শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ জাগল।

সেদিন কমারোভস্কির এক বন্ধুর মেয়ের জন্মদিনে লারা গিয়েছিল। আর সেখানেই নাচের সঙ্গে সঙ্গে এই অনাস্বাদিত শিহরণের নাগাল পেয়েছিল ও। উদ্দাম নাচের তালে তালে কমারোভস্কি ওকে কাছে টেনে নিচ্ছিল আর থেকে থেকে ওর ঠোঁটের ওপর নিজের পুরু ঠোঁটকে দীর্ঘক্ষণ বন্দী রাখছিল। ওর শরীরের নানাস্থানে কমারোভস্কির দুষ্টু হাত ঘুরে ফিরে যাচ্ছিল। তখন কেমন

যেন ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন শুয়ে শুয়ে সারা প্রতিজ্ঞা করল আর সে অমন প্রশ্রয় দেবে না।

শীতকালের সকাল। সকাল থেকেই অনেক লোক এসে অফিসে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শরীরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আনন্দ উকিঝুকি মারছে। আজকে ওদের মাইনে দেবার তারিখ।

বাতাসে মিশে আছে কয়লার গুঁড়ো, ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ আর খাবারের দোকান থেকে ভেসে আসা রুটির গন্ধ। ইঞ্জিন আসছে আর যাচ্ছে। একবার থামছে তারপর বিশ্রাম করেই দূরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে।

কিন্তু এদিকে মন নেই ফুফ্লিগিনের। মন নেই পাভেলেরও। ওরা দুজনে রেললাইনের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পাকা সড়কের ওপর দিয়ে পায়চারি করছিল আর চিন্তা করছিল যে যার নিজস্ব সমস্যা নিয়ে। ফুফ্লিগিন একবার পরিষ্কার পোষাক আর জুতো জোড়ার দিকে তাকাচ্ছে আর একবার দূরের দিকে দৃষ্টি চালিয়ে কাকে খুঁজছে। আর পাভেলের দৃষ্টি গাড়ির লাইনের ওপর। ওর মনে হচ্ছে এ লাইনটা ঠিক রেল চলার উপযুক্ত নয়, ঠিকাদারেরা নিশ্চয়ই ইস্পাতের সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে দিচ্ছে। সেদিকে বিভাগীয় পরিচালক ফুফ্লিগিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে। কিন্তু ফুফ্লিগিনের সেদিকে মন ছিল না। তাই কোন রকমে কথাটার একটা উত্তর দিল—'কেন মিঃ পাভেল! এদিকে তো কেবল খালি ইঞ্জিনই চলাফেরা করে। আপনার আশঙ্কা মত তো তেমন বেশী সংখ্যক রেলগাড়ি আসে না। আমার মনে হয় আপনার এ ধরণের আশঙ্কা অমূলক।' ফুফ্লিগিন কথা বলছে আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

দূরে পাহাড়ের ধার দিয়ে রেল লাইনের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটার ওপর একটা গাড়ির শীর্ষদেশ দেখা গেল। কথা সমাপ্ত না করেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ও। তারপর গাড়িটা কাছে আসতেই লাফ দিয়ে গাড়িটায় উঠে বসল। ওর পাশে বসে থাকা ভদ্রমহিলা ওর স্ত্রী। এতক্ষণে ওর ব্যস্ততার কারণ বুঝল পাভেল। নিমেষের মধ্যে দম্পতিকে নিয়ে গাড়ীটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দূরের মুখটা যখন আস্তে আস্তে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল, যখন আকাশে একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করল, তখন রেললাইনের ধারের পরিত্যক্ত বিরাট মাঠের ওপর সন্ধ্যার আবছায়া-অন্ধকারে দুটো বিন্দু দেখা দিল।

আস্তে আস্তে বিন্দু দুটো ক্রমশঃ বড়ো হতে লাগল, পরিশেষে সেটা মানবদেহের আকৃতি নিল। মূর্তি দুটো কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসতে লাগল।

টিভেরজিন নামের ছায়ামূর্তিটা বলল, 'শুনলাম আজ নাকি সকলে মাইনে পাচ্ছে। তা না হলে তোমাদের সবাইকে এরকম ভীতু আর অস্থির চিত্তের জন্য কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিতাম। পুলিশের ভয় আমি করি না, কিন্তু ভয় করি এই ধরণের একটা ভীতু দলকে। যাই দেখে আসিগে আফসের কি অবস্থা। অফিসের দিকে চলে গেল টিভেরজিন, অন্যমূর্তিটা অন্যদিকের রাস্তায় আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

অফিসে ঢুকবার মুখেই বাধা পেল ও। দরজার গোড়ায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফুফ্লিগিনের গাড়ীতে বসে আছেন ওঁর স্ত্রী। ওর স্বপ্নালু দৃষ্টিটা আটকে আছে অফিসের জানলার গায়ে আটকানো বংফকুর্চির ওপর। আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে রেললাইনের ধারের ডিপোগুলোর দিকে চলে গেল ও।

ওখান থেকেই ও শুনতে পেল কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। একটা স্ত্রীলোকের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চার চীৎকারও মিশে আছে। ঘরের ভেতর থেকে খুডশোয়েভের বীভৎস নির্যাতনের চটাপট শব্দও টিভেরজিনের কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

খুডশোয়েভকে ভালো করেই চেনে টিভেরজিন। ও শুনেছে এই লোকটি নাকি যৌবন বয়সে প্রচুর সুনামের অধিকারী ছিলেন। তিনি তার মা মার্থার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু বিবাহ যখন হয় তার বাবা নিকিটিচের সঙ্গে, তখন থেকেই মাথাটা কেমন যেন বিকৃত হয়ে যায় খুডশোয়েভের। বাবা মারা যাবার পর লোকটা তার মার কাছ থেকে পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হয়। আর তারপর থেকেই ওদের পরিবারের প্রতি একটা দারুণ প্রতিহিংসা গ্রহণে তৎপর হয়। রেলমুটে গিমাজেৎদিনের ছেলে ইউসুপকাকে টিভেরজিন আশ্রয় দিয়েছিল। তাই ইউসুপকার ওপর এই অত্যাচার করে এসেছে খুডশোয়েভ।

ওর তকলিটা ভেঙে দেবার মিথ্যা অপবাদে ওকে পেটাচ্ছিল খুডশোয়েভ। ওর কাকুতি মিনতি আর অসহ্য চীৎকার আর শুনতে পারছিল না টিভেরজিন। সোজা বেরিয়ে এল, তারপর ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে মেরেছো কেন?'

'বেশ করেছি, তোমার সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসা কেন? ওকে আমি খুন করব।' আর তারপরই বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে খুডশোয়েভ ওর মা তুলে

অশ্লীল গালাগালি দিতে লাগল। ওকে থামাতে পাশেই পড়ে থাকা ভারী লোহার ডান্ডা তুলে নিল টিভেরজিন—কিন্তু ছোঁড়বার আগেই সকলে এসে ওকে থামিয়ে দিল। অসহ্য ক্রোধে ফুঁসতে লাগল ও। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দুজনে দুজনকে ধরে রেখে দিয়েছে—ছেঁড়া জামা আর রক্তাক্ত দেহে দুজনের দুজনের দিকে এমন রক্তচক্ষু নিয়ে তাকিয়ে আছে, যে একবার ধরতে পারলে হয়।

কিন্তু তা আর হোল না। অসংখ্য জনতাকে কেটে বেরিয়ে যেতে পারল না টিভেরজিন বা খুডশোয়েভ। কিছুক্ষণ এভাবেই কেটে গেল। উত্তেজিত জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল আর সেই সুযোগেই হঠাৎ বাঘের মতো একটা বিরাট লাফ দিল টিভেরজিন আর তারপরই জনতা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল ও।

অন্ধকারের মধ্যে আপন মনে হাঁটতে হাঁটতেই টিভেরজিন ভাবছিল, খুড-শোয়েভের বীভৎস ব্যবহারের কথা। ওর বিকৃত মানসিকতা আর উন্মাদ আচরণের জন্য ওর প্রতি টিভেরজিনের একটা ঘৃণা জন্মে যাচ্ছিল। প্রবল উত্তেজনায় সুদীর্ঘপথ খুব সহজেই অতিক্রম করে গেল। ভুলে গেল যে, ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামীকাল থেকেই ও রেলধর্মঘট শুরু করবে।

প্রায় ছুটতে শুরু করে দিয়েছিল। অবশ্য চলার সময় ওর গতির পরিমাণ সম্বন্ধে ও নিজেই রীতিমত অসতর্ক ছিল। প্রবল উত্তেজনায় ও প্রায় হাওয়ার মধ্যে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

ইঞ্জিন সারাবার কারখানায় গিয়ে বাঁশী বাজাল টিভেরজিন। তীব্র হুইসিলের শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে হারিয়ে যেতে লাগল। উঠোন থেকে বেরিয়ে আসা লোকদের পিছু নিল আরও অনেক কর্মরত শ্রমিক, সকলেই সিগনালের অর্থ অনুযায়ী হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রেখেছে। অসংখ্য জনতার মধ্যে বিচিত্র জনরব শোনা যেতে লাগল, কেউ জিজ্ঞাসা করল—আগুন লেগেছে? কেউ বা বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে জানাল, না না, আগুন-টাগুন নয়, সব ভাওতাবাজী। আসলে ধর্মঘট শুরু হবে। তারই সিগন্যাল ধ্বনি। কেউ বলল, হাতের যন্ত্র নামিয়ে রাখো, এখনই ধর্মঘট শুরু হবে। কেউ কিছু না বুঝেই হাতের অস্ত্র নামিয়ে রাখল। নিমেষের মধ্যে কর্মমুখর কারখানাটা মৃতের মতো স্থির হয়ে গেল।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ঢুকলো টিভেরজিন। ঢুকবার মুখেই দেখা হোল গ্রিগানেৎসিনের সঙ্গে। টিভেরজিনের অশেষ প্রশংসা করে কৃতজ্ঞতায় থরথর করে বুড়ো বলতে লাগল, পুলিশ এসেছিল, রোজই আসছে। ওরা আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিল ; আমি বললুম—জানি না। ওরা বোধ হয় বিশ্বাস করেনি। তাই বোধ হয় ওরা যে কোন মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে। আপনি এখান থেকে পালান।

একটা চকমিলানো পাথরের বাড়িতে থাকে টিভেরজিন আর তার মা। ভাইটাকে জার্মানরা জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এখন অসুস্থ অবস্থায় ও হাসপাতালে। নোংরা উঠোন পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল টিভেরজিন। সিঁড়ির চাতালে জলের বালতির গায়ে আটকানো মগটা দেখে ওর মনে পড়ে গেল গ্রভের কথা। অল্প একটু হেসে রান্নাঘরের দরজায় টোকা দিল ও।

দরজাটা খুলে একটা উষ্ণ অভ্যর্থনা লাভ করল টিভেরজিন। তারপর মায়ের নরম উষ্ণ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। বারবার করে ছেলের মাথায় বুকে পিঠে মার আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে থাকল। কিঞ্চিৎ আবেগ প্রশমিত হবার পর টিভেরজিন জানালো—'মা, আন্টিগ্রভ গ্রেপ্তার হবার পর ওর বাচ্চাটা বাড়িতে একা পড়ে আছে। ভাবছি—ওকে এখানে নিয়ে এলে কেমন হয়? তোমার কি মত? গ্রভই বা কি বলে।' ছেলের বুদ্ধির তারিফ করলেন মা। যখন শুনলেন জলের বালতির গায়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় রাখা মগটা দেখে শেষে আন্দাজ করে নিয়েছে এ বাড়িতে প্রায় এসেছে তখন। মা হাসলেন ; তারপর মেনে নিলেন ছেলের প্রস্তাব।

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ কি মনে পড়ে থমকে দাঁড়ালেন মা।

তারপর টিভেরজিনের দিকে ঘুরে দাড়িয়ে বললেন, 'জানিস, গ্রভ বলছিল আমাদের জার নাকি নতুন নিয়ম প্রবর্তন করবেন। সেই নিয়মানুযায়ী আমরাও আমাদের হাতে সম্পত্তি ফিরে পাব।' আশার আনন্দে মায়ের চোখে জল এসে গেল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও মার দিকে, তারপর দুহাত বাড়িয়ে মাকে কাছে টেনে নিয়ে পরম ভালোবাসার আশ্রয়ে মুখ গুঁজল।

১৭ই অক্টোবরের দিন রাস্তা দিয়ে যে বিরাট মিছিল চলেছে সেখানে আশ্রয় থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্য্যন্ত। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও টিভেরজিনের

মাও যোগ দিয়েছে এই মিছিলে। মিছিলটা পথ ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায়ই চলছিল সামনের দিকে। টিভেরজিনের মার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পাশা। ওর লাল চুলগুলো পরিষ্কার করে আঁচড়ানো হয়েছে—মধ্যিখান থেকে দুভাগে ভাগ করা, প্রসন্ন কৌতুকে উজ্জ্বল চোখ জোড়া নির্বাক আছে কৌতুককর কাজ করবার প্রেরণায়। পরিষ্কার জামা জুতো পরে সেও সদর্পে হেঁটে চলেছে সামনের দিকে। মাঝে মাঝে থামছে আর তারপর পিছিয়ে পড়ে টিভেরজিনের মার সঙ্গ ধরে আবার বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে।

মিছিলটা চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সকলের আগে দাঁড়িয়ে যিনি মিছিলটা পরিচালনা করছিলেন তিনি হাতে ধরা লাঠির ওপর রাখা টুপিটা মাথার ওপর তুলে ধরলেন তারপর সকলকে শুনিয়ে সাবধান করে দিলেন—অশ্বারোহী সৈন্যেরা অর্থাৎ আমাদের প্রতিপক্ষেরা ওত পেতে আছে—আমাদের মিছিল ভেঙ্গে দেবার জন্য। উত্তেজিত জনতা চীৎকার করে জানাল তারা পিছু হটবে না।

আস্তে আস্তে উত্তেজিত জনতা একটা স্কুল বাড়ির রোয়াকে এসে উঠল আর তারপর কোনরকম সংকেত বার্তা কানে না নিয়েই দরজা ঠেলে সোজা ওপরে উঠে গেল। ছাত্রখান জনতাকে যখন লেকচার হলে জমায়েত করানো হল তখন নেতাদের রীতিমতো কালঘাম ছুটছিল। তারপর উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে সকলেই একে একে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে লাগল। উত্তেজিত জনতার সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না।

ওদের ক্লান্ত শরীরটা একটুখানি বিশ্রাম পেয়েই তৃপ্ত ছিল। কেউ কেউ ধিক্কার জানাতে লাগল। কেউ কেউ আবার নেতাদের নকল করে সকলকে হাসাতে লাগল।

এরকম বিশ্রী গণ্ডগোলের মধ্যে দিয়ে জনতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর হুড়মুড় করে নীচে নেমে এল রাস্তায়। তখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। দূরে বরফ-জমা রাস্তার ওপর সূর্যের লাল আলো কেমন যেন মনে হচ্ছিল।

বেশ চলছিল মিছিলটা, হঠাৎ একজন 'বাবাগো' বলে লুটিয়ে পড়ল। জনতার মধ্যে একটা বিশ্রী বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হোল। তার মাঝখান দিয়েই দেখা গেল লাল টুপি পরা ঘোড়সওয়াররা এগিয়ে আসছে। ওদের হাতের তীব্র তরবারি বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে আন্দোলিত হচ্ছে। শীঘ্রই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কেউ বা ছুটে পালাল, কেউ বা লুটিয়ে পড়ল, কেউ বা তাদের অত্যাচারের শিকার হোল।

রাস্তার ধারে ভিড়ের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন টিভেরজিনের মা। সেই অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে ভিড়ের মধ্য থেকে 'পাশা পাশা' করে কাকে যেন খুঁজছিলেন। একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এল, এই বৃদ্ধার আচরণ তার যেন সহ্য হল না। চালিয়ে দিলে এক চাবুক বৃদ্ধার পিঠ লক্ষ্য করে। তারপর খুব যেন একটা বীরত্বের কাজ করেছে এমন ভাবে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সঙ্গীদের পিছু নিলো। রাগে অপমানে চীৎকার করে উঠছিলেন মা। ওরা চলে যেতেই রাস্তার ওধার থেকে ছুটে এলো পাশা। প্রচণ্ড ভয়ে ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

শরীর কাঁপছে বৃদ্ধারও, তবে ভয়ে নয়, অপমানে আর বিরক্তিতে। দুর্বল মানুষের ওপর এই নিপীড়ন তার মনকে ঘৃণায় বিষণ্ণ করে তুলেছে। ভারী রাগ হোল ছেলের ওপর। বাড়ী গিয়েই সেই রাগটা আচ্ছা করে ঝেড়ে নিলেন টিভেরজিনের ওপর। রাগে আর আপমানে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কভেন্‌টিটস্কিদের বাড়ীর তিন তলায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন নিকোলে। ছত্রখান জনতার মধ্যে আঁতি পাঁতি খুঁজছিলেন যাকে তাকে পেলেন না। মনে হোল যেন নিকিও ওই দলে ছিল। ভ্রু কুঁচকে গেল তাঁর।

নিঃসন্তান কভেন্‌টিটস্কি তাদের বহুদিনের পুরোনো বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিলেন তাকে। বিরাট বড়ো বাড়িটার তিনদিক খোলা। একপাশে এই বাড়িরই প্রাক্তন মালিকের সম্পত্তি আছে এখনও।

ওপরের পড়ার ঘরে টেবিলের ওপর অবিন্যস্ত কাগজের স্তূপ। ঘরটি প্রায়ান্ধকার যদিও ঘরের মধ্যে জানালা আছে চারটি। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার ওপর পড়ে থাকা গাড়ির দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন নিকোলে, কেন তিনি এলেন এখানের এই বিশৃঙ্খলতার রাজত্বে। স্বপ্নের মধ্যে ভেসে এল সুইজারল্যাণ্ডের শান্তিময় মধুময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। আবেগে দুচোখ বুজে এল নিকোলের।

এখানে আসার আগে ইউরাকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন ফ্রেডির কাছে। কিন্তু ওখানকার পরিবেশ রীতিমত অসুস্থ বলে ওকে ওখান থেকে গ্রোমেকো পরিবারে নিয়ে আসা হোল।

হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল নিকোলের, গ্রোমেকের মেয়ে টোনিয়া, ইউরা আর ওর সহপাঠী মিশা গর্ডনের অত্যাধিক রকমের বাচ-বিচারের কথা মনে করে।

শরীর সম্পর্কে ওরা যেন একটু বেশী রকমেই সচেতন বলে মনে হয় একসময় নিকোলের। যা কিছু শরীর সম্বন্ধীয় বলে ওদের মনে হয়, তাকেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার জানিয়ে পরিত্যাগ করে। বয়ঃসন্ধির এই ধরণের মানসিকতার কথা অজানা ছিল না নিকোলের। তাই বেশী ভয় না পেলেও একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি মনে মনে। ভাবলেন, এবার মস্কোতে ফিরে গেলে আর কখনও ইউরার এ ধরণের পরিবর্তন আসতে তিনি দেবেন না।

ঘরে ঢুকলেন নীল কেওপস্টার্লভিচ। কিন্তু করমর্দন করতে গিয়ে হাসি চাপলেন নিকোলে ভদ্রলোকের অবিন্যস্ত পোষাক দেখে। তার পোষাক সামলাতে লাগলেন ভদ্রলোক। ওকে রীতিমত বিব্রত হতে দেখে নিকোলে তাড়াতাড়ি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কোন রকমে আমতা আমতা করে ভদ্রলোক জানালেন যে তিনি এসেছেন নিকোলেভিচকে নিমন্ত্রণ করতে, একটা স্কুলবাড়ির পক্ষ থেকে। নিকোলেভিচ প্রথমে রাজী হলেন না, কেননা তিনি জানালেন যে তিনি এর আগে বহুবার ওখানে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা রাখার জন্যে।

কাজের ব্যাপার হয়ে যাবার পরও ওদের আলোচনা চলছিল। যদিও অত্যন্ত নিরর্থক আর আজেবাজে কথায় ভর্তি ছিল সেগুলো। উভয়েই যে সে সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন না তা নয়, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটা শোভন নয় বলেই কেউ কাউকে চলে যাবার কথা বলতে পারছিল না। অনেকক্ষণ ধরে এলোমেলো ভাবে বকে যাবার পর নিকোলে আলোচনার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনতে চাইলেন। সুন্দরের প্রসঙ্গে টলস্টয়ের মতবাদ আনলেন। তারপর বললেন, এদেশে তিনিই একমাত্র সৌন্দর্যের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন আর তার বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি তাই প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জোর করে মানুষকে পরিবর্তিত করানো যায় না। তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হলে প্রকৃত সৌন্দর্যের স্বরূপ কি, জীবনের মধ্যে সেই সৌন্দর্যের প্রকৃত তাৎপর্যের স্বরূপকে আগে জানানো উচিত। একথা বুঝতে পারলেই মানুষ পৃথিবীর কাছ থেকে অমরত্বের দাবী করতে পারে, কেননা প্রকৃত সৌন্দর্য অমর।

ও চলে যেতেই নিজের ওপরেই রাগ এসে গেল নিকোলের। অযথা মূল্যবান উপদেশগুলির অপপ্রয়োগ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ডায়েরীর পাতায় কিছু লিখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। ডায়েরীটা কাছে টেনে নিলেন। তারপর সেদিনের

ডায়েরি লেখা পাতাটা বার করে খসখস করে আজকের তিক্ত অভিজ্ঞতার একটা মোটামুটি খসড়া লিখে ফেললেন। লিখলেন, প্রাচীন যুগে মানুষ ছিল প্রকৃতির দাস। প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলত তারা নীরবে। প্রকৃতির হিংস্র নখ-দন্তকে তারা রীতিমত ভয় করে চলত।

তারপর যখন প্রাচীন জগতের অবসান হোল রোম সাম্রাজ্যের উত্থানে তখন মানুষ আর প্রকৃতির দাস হয়ে রইল না। দেবতা নামে এক অলৌকিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তার থেকে নিজেদের মধ্যে একটা লৌহ কঠিন ব্যবধান সৃষ্টি করে ফেলল। দেবতাদের স্বীকার করে নিজেদের মনুষ্যত্বের অবমাননা করলে তারা, আর তার ফলেই তাদের জীবন তাদের শরীর সবই হিংস্রতায় বিষাক্ত হয়ে গেল। সুখ জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়ে দুঃখ এসে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধলো। জীবন্ত মানুষ পরিণত হোল সোনার চোখ ঝলসানো লোভী আলোতে, পাশবিকতায় আর মনুষ্যত্বের অবমাননায় তারা স্বাভাবিক জীবন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাথরে তৈরী হল।

মানুষের যখন এহেন চরম দুরবস্থা তখনই আবির্ভূত হলেন এক মহাপুরুষ। যিনি এলেন এই দুর্গন্ধ গলিত শবের মাঝখান থেকে মানুষের মনুষ্যত্বের পুনরুদ্ধারের জন্য।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর এই পেট্রোভকা, এখানকার অধিবাসীরাও প্রায় সকলেই সজ্জন।

ভিক্টর ইপ্পোলিটোভিচ কমারোভস্কিও এই শহরেরই একটা চারতলা বাড়ির ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করেন। এমার নেপথ্য পরিচালনায় তার ঘরটিও ছবির মতো পরিষ্কার। এই শান্ত সুনিপুণ গৃহকর্ত্রী নিজে থেকে কখনও কমারোভস্কির ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চান না, কমারোভস্কিও তাঁকে অকারণে উত্তেজিত বা বিরক্ত করতে সাহস করেন না। মাঝে মধ্যে বিকালে পোষা বুলডগটিকে নিয়ে পেট্রোভকার রাস্তা ধরে দূরের পথে উধাও হয়ে যান তিনি, এই বৈকালিক ভ্রমণে মাঝে মাঝে সঙ্গ দেন বিখ্যাত অভিনেতা এবং জুয়াড়ি ইমারিমোভিচ সাটামিভি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল লারা। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের দিকে একবার দেখে নিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলে। ওর কান্নার দমকে দমকে বেগুনি রঙের পোষাকটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। অনুশোচনায়, নিজের ওপর ঘৃণায় ও নিজেকে পৃথিবীর জঘন্যতম মানুষরূপে ভাবতে শুরু করল,

কেননা ও আজ যা করেছে তা শুনলে পৃথিবীর যে কোন নৈতিক মর্য্যাদাসম্পন্না মহিলা শিহরিত হতে পারেন। নিস্তব্ধ ঘরে কেবলমাত্র লারার কান্নার শব্দ আর বাইরে বরফ গলার বিচিত্র সুরলহরী একতালে বেজে চলল।

মনে মনে নিজের ওপর বিরক্ত হতে লাগলো কমারোভস্কি। একবার সে চেষ্টা করলো লারার অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণের থেকে সে দূরে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে লারার দেহ সৌন্দর্য ভেসে উঠলো তার চোখে। কল্পনায় ভেসে উঠলো তার পবিত্র কোমল দুই হাত, মুখ, কপাল কালো কুঞ্চিত কেশদাম। না, অসম্ভব, লারার কাছ থেকে দূরে থাকা তার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। রাগে আলমারির সব জিনিসপত্র টেনে বার করে ফেলল তারপর এক ছুট কুকুরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ধীরে ধীরে ফিরে এলো। মনের আবেগকে শান্ত করার জন্য অনেক রকম প্রতিজ্ঞা করলো। তারপর লাথি মারলো কুকুরটার পেট লক্ষ্য করে—অসহ্য রাগে আর বিরক্তি মেশানো ক্ষিপ্রতার দম দম করে কাঠের রেলিং ধরে ওপরে উঠে গেল।

লারার জীবনে কমারোভস্কি যেন একটা দুষ্ট গ্র হর মতো। কমারোভস্কি সম্পর্কে লারার ধারণাটা ঠিক কি ধরণের তা সে নিজেও নিশ্চিত করে জানে না। ওর অগাধ সম্পত্তি, প্রচুর সুনাম ওর কাছে আসতে লারাকে কেমন যেন মোহগ্রস্ত করে। ওর মুখে নিজের সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য, ওর মনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে এক ধরণের মিষ্টি সুখও সে আস্বাদন করে।

অন্যদিকে যখনই মনে পড়ে যায় এই কল্পনার নায়ক একজন প্রৌঢ়, যার সঙ্গে তার বয়সের ফারাক অনেক অনেক বেশী, তখনই এক ধরনের অব্যক্ত যন্ত্রণার উন্মেষ হয়।

তার মনে পড়ে যায় সে এখনো স্কুলের ছাত্রী, এখনো সে নিতান্তই শিশু-- অভিজ্ঞতাও তার অল্প, এখনও অতি তুচ্ছ কৌতুকও তার হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। তার এই ছোট্ট শিশু মনে দেহের নিপীড়ন যেমন একটা অজানা পুলকের উন্মাদনা জাগায় তেমনি এই তীক্ষ্ণ তীব্র, নির্মম আঘাতে সে বিরক্তও হয়।

তাই বরাবর তার মনে অনুশোচনা জাগে। অজ্ঞাত সুখের আস্বাদনের পরে জাগে গভীর দুঃখ আর হৃদয় নিঙড়ানো অনুভূতি।

চোখের জলে বুক ভিজিয়ে ভাবতে বসে লারা, কিসের জন্য ও কমারোভস্কির হাতে বন্দী থাকবে? ও তো ইচ্ছা করলেই সব শেষ করে দিতে পারে। তবে পারছে

না কেন ও? নিজেকেই নিজের মারতে ইচ্ছা করে লারার। ও বুঝতে পারে ও কমারোভস্কির মতো হতে পারবে না কোনদিনও, আর তাই তাকে চিরকাল বন্দীর মতো জীবনযাপন করতে হবে। কমারোভস্কির হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে তাকে, এ থেকে তার মুক্তি নেই।

ওর প্রণয়ের ধরণ দেখে হাসি পায় লারার। আবার একপ্রকার লজ্জা পায় ও। ওই প্রায় বৃদ্ধবয়সী লোকটা যখন ওর পায়ে পড়ে অনুনয় বিনয় করে, যখন ওকে বিবাহ করার প্রস্তাব করে তখন ওর হাসি পায়। আবার হোটেলে যখন ওকে কাছে টেনে নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ওর ঠোঁটের ওপর চুম্বন এঁকে দেয় তখন মনে মনে বিরক্তি আর লজ্জায় ওর শরীরে ঘাম দেখা দেয়। কিছুদিন আগে দেখা স্বপ্নটা বুঝি মনে পড়ে যায় ওর।

লারা ধর্ম বিশ্বাসী নয়। তবুও যখন মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে একা নিঃসঙ্গ, অপরিসীম বেদনার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে ছুটে যায় গির্জায়। সেখানে একমনে শোনে প্রভুর আবেগ নিয়ে জিবের গড়গড় করে উচ্চারিত শেষের মন্ত্রগুলি—ওর উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত করে তারা। চোখের জল ওর সব পাপ বুঝি ধুয়ে মুছে দেয়।

মোমবাতি কিনে আনতে আনতে থমকে দাঁড়াল লারা। কানে এল প্রভুর বাণী—"তারাই সুখী যারা পদদলিত। নিজের কথা কিছু বলার আছে তাদের।"

প্রেম শিরায় শিরায় বিপ্লব শুরু করেছে। এই বিশেষ ধরণের যুদ্ধে অন্যান্য বিপদাশঙ্কার মধ্যে আছে—নির্বাসনের, মৃত্যুদণ্ডের, ভয়ের। তবুও ভয় পায় নি এই ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলোতে দুই বালক যাদের লারা বেশ ভালো করে চেনে।

একজন হোল. নিকি ডুডোরভ অন্যজন তার সহপাঠী নাডিয়ার বন্ধু। নিকি চলায় বলায়. আচরণে স্বভাব চরিত্রে কতকটা লারার সমধর্মী। কিন্তু অন্যজন পাশা অ্যান্টিপভ, যে বালকটি টিভেরজিনের বাড়িতে আশ্রিত তার প্রতি কেমন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ অনুভব করে লারা।

ওর বাড়িতে যখনই গেছে ও দেখেছে ছেলেটা ওর দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে থাকে, ওর আগমনে আনন্দিত হয়। দুজনে দুজনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। দূর থেকে ভেসে আসা গুলির শব্দ শুনে লারা চঞ্চল হয়ে গেল।

শোনা গেল বিপ্লবীরা নাকি শুইসারদের বাড়ির সামনের ব্যারিকেডটা গুলি মেরে উড়িয়ে দেবে। প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি লারা তার মাকে নিয়ে আর অতি-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোল। কিন্তু তার মা সহজে যেতে চাইলেন না।

কিন্তু যেদিন বিকেলবেলা একটা লোক এসে হাত-পা নেড়ে কেটিস্ভাকে কি যেন বোঝাতে লাগলেন আর সে চলে যেতেই মেয়েরা যে যার মেশিন ছেড়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরলে সেদিন শ্রীমতী শুইসার যাবার যেন সঙ্কেত শুনতে পেলেন। ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তোমরা সব চলে যাচ্ছ কেন? সকলে জানাল ধর্মঘটের জন্য তারা বাধ্য হচ্ছে চলে যেতে। অবশ্য যাবার সময় তারা বারবার সান্ত্বনার সুরে প্রবোধ দিতে লাগল শ্রীমতী শুইসারকে, আপনার কোন ভয় নেই, ধর্মঘট শেষ হলেই চলে আসব।

মাথায় যেন বাজ পড়ল শ্রীমতীর। তিনি চীৎকার করে কান্না শুরু করে দিলেন আর কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিজের প্রশ্রয়দানের ওপর দোষারোপ করতে শুরু করলেন।

একটু শান্ত হবার পর তিনি ঝিলাটকে ডেকে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে লারা আর রডিয়ার হাত ধরে হিমশীতল পৃথিবীর বুকে পা রাখলেন যখন তখনও বিপদের মেঘ সম্পূর্ণ কাটেনি, রাস্তায় কড়া পাহারা।

রাস্তায় চলতে চলতে লারা ভাবলো, ভালোই হয়েছে। এবার ভগবান তার আর কমারোভস্কির মধ্যেকার প্রার্থিত ব্যবধানটা তুলে দিয়েছেন। ওর কথা মনে হতেই আর একবার কেঁপে উঠল লারা, তারপর তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলো।

হুঁশ ফিরলো মায়ের ডাকে, কিরে অত জোর হাঁটছিস কেন? অগত্যা গতি কমাতে বাধ্য হোল ও। সেই সময় দূরের থেকে গুলির শব্দ কানে এল ওর। লারার মনে হোল ওটা যেন বুলেটের শব্দ নয়, ওরই মধ্য দিয়ে করুণাময় যীশু আর্তজনকে মুক্তির বাণী শোনাচ্ছেন।

মিভ্‌ৎসেভ ভ্রাজেক ও আর একটি ছোট রাস্তার ধার ঘেঁষেই সম্ভ্রান্ত অতিথিবৎসল উন্নত রুচিবান ও শিল্প সংগীত প্রেমিকোর চারতলা বাড়ি। বড় ভাই আলেকজাণ্ডার আলেকজান ড্রকিচ আর ছোটভাই নিকোলে আলেকজান ড্রকিচ গ্রোমেকো দুজনেই রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক; তা সত্ত্বেও তাদের বাড়ীতে শিল্প-

সংগীতের আসর বসে। দুজনেই গান বাজনা ভালোবাসেন। বড় ভাইয়ের স্ত্রীর নাম আনা, ছোট ভাই বিয়ে করেননি।

এই বাড়িরই নীচের তলাটা এখন বহু অতিথির আগমনে গম্‌গম্‌ করছে। রান্নাঘর থেকে মুর্গির মাংসের রান্নার সুস্বাদু গন্ধ ভেসে আসছে আর আসছে সেই সঙ্গে বাজনার টুংটাং শব্দ। আর যে মহিলাটি খুব ঘনঘন ব্যস্তসমস্ত ভাবে এধার-ওধার যাওয়া আসা করছেন—যার ছাই রঙের পোষাকের সঙ্গে রঙ মেলানো ওড়না-যুক্ত আবট্র ঘাম টুপি—চলার এবং কথা বলার ভঙ্গিটি ঠিক পুরুষের মতো তাঁর নাম ভুরা গ্রেমিঙ্গর। আনার পরম বন্ধু তিনি। অনেকবারই বিবাহ হয়েছে ভুরার, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে সেই সঙ্গেই। তাই এখন সে একা। ওর সাথী হলেন আনা। ভুরা গল্প জানতেন, ছোটো ছোটো ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্বকথা জানতেন, জানতেন মস্কোর সংগীত বিদ্যালয়ের সেরা শিক্ষকের ঠিকানা আর কে কার সঙ্গে বাস করে—সে সবের বিশদ বিবরণ। এ বাড়ির কিছু অনুষ্ঠান হলেই সব কিছু দেখাশোনার ভার পড়ে তার ওপর।

অতিথিরা একে একে এসে পড়লো। এসে পড়লেন নবীন সুরকারও। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি উঠল উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে। আস্তে আস্তে শুরু হোল বাজনা, অনেকক্ষণ একটানা বেজে চলে, তারপর এক সময় শান্ত হোল।

শুরু হোল সমালোচনা। তারপর পশ্চিম আকাশের মিলিয়ে যাওয়া সূর্যের মতো তা মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তে, সকলের ইঙ্গিতে শুরু হোল টিশকোভিচের পিয়ানোর করুণ বিলাপ।

এই সভায় তৃতীয় সারিতে বসেছিল, ইউরা, টোনিয়া আর নিশা। বাজনাটা চলার মধ্যিখানেই ফিস ফিস করে উঠল ইউরা—মিঃ আলেকজাণ্ডার, ইয়াগোরোভনা আপনাকে ডাকছে। বিরক্ত মুখে দরজার দিকে তাকালেন তিনি, উঠতে ইচ্ছা না করলেও আনার বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে না উঠেও পারলেন না। কি ব্যাপার ইয়াগোরোভনা? গলার স্বরে মনোভাব স্পষ্ট ফুটে উঠল। কাঁচুমাচু হয়ে দাসী বললে, টিশকোভিচের বাড়ী থেকে একটা দুঃসংবাদ এসেছে, এক্ষুণি ওর বাড়ী যাওয়া দরকার।

কিছুতেই রাজী হলেন না আলেকজাণ্ডার। অনুষ্ঠানটিকে এভাবে মধ্যিখানেই শেষ করে দেবার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। বললেন, "এই বাজনাটা শেষ হলে বলবো। তার আগে পারবো না।"

কিন্তু ইয়াগোরোভনাও নাছোড়বান্দা যেন। "কিন্তু মহাশয়, ওর বাড়ী থেকে কে লোক এসেছে ওঁকে নিয়ে যেতে। নীচে ওঁদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

অগত্যা ফিরে দাঁড়াতে হোল আলেকজাণ্ডারকে। তিনি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলেন তারপর টিশকোভিচকে ইশারা করলেন তাঁর বাজনা থামিয়ে দিতে। বাজনা থেমে যেতে কৌতূহলী জনতার সামনে এগিয়ে আসলেন, তারপর সবকথা খুলে বললেন। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি টিশকোভিচকে সঙ্গে নয়ে তার বাড়ী যাবার জন্ম গাড়ীতে উঠে বসলেন। সঙ্গে চলল ইউরা, টোনিয়া আর নিশা। বাবাকে এতো রাতে একা একা যেতে দিতে পারে না ওরা।

রাস্তার বিপর্যয় আর ভয়াবহতা দুঃস্বটাকে যেন আরও বাড়িয়ে দিলো। তার ওপর যখন তারা মণ্টোনিগ্রো হোটেলে পৌছল তখন হোটেলের অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ দেখে আলেকজাণ্ডারের রীতিমত ভয় ধরে গেল—কেননা সঙ্গে তার বাচ্চারা এসেছে। সকাল বেলা বাসা ভাড়ার জন্ম যে বিশ্রী ঝগড়টা চলেছিল তখনও তার রেশ সম্পূর্ণ মেলায়নি।

পর্দা সরিয়ে ওরা যখন ভেতরের ঘরে ঢুকলেন, তখন ডাক্তার শ্রীমতী গুইসারকে বমির ঔষধ দিয়ে পেট ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, সেটাতে ঘরের যথেষ্ট আলোর অভাব দূর হচ্ছিল না। একটা পার্টিশান দিয়ে ঘরটাকে দুভাগে ভাগ করানো হয়েছে। ঘরময় তীব্র আইওডিনের গন্ধ ছড়িয়ে ছিল।

"মঁশিয়ে টিশকোভিচ, এগিয়ে এসে আমার হাত ধরুন। দেখুন আমি বেঁচে আছি এখনও, মরিনি।" প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাতর স্বরে চেঁচাতে লাগলেন আনেলিয়া কার্লোভনা। অতিথিদের সামনে এহেন বিশ্রী পরিবেশের জন্ম মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি। লজ্জায় আর অপমানে তার মুখ লাল হয়ে গেছিল। তাড়াতাড়ি তিনি শ্রীমতীকে শান্ত করার জন্ম এগিয়ে এলেন। তারপর সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আপনি শান্ত হোন। আনেলিয়া কার্লোভনা, আমি মিনতি করছি—কী অস্বস্তিকর ব্যাপার, উঃ কী অস্বস্তি।"

আস্তে আস্তে বললেন আলেকজাণ্ডার আলেকজান ড্রকিচ—"চল, এবার আমরা বাড়ী যাই।"

বাচ্চারা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো। সামনের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন আলেকজাণ্ডার, যাবার আগে টিসকোভিচকে বলে যেতে হবে। অতএব তারা অপেক্ষা করতে বাধ্য হলেন।

পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনে সকলেই ভাবলো যে টিশকোভিচ ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু লোকটির হাতে ধরা বাতির আলোয় তার মুখ দেখে সকলকে নিরাশ হতে হোল। যিনি এলেন তিনি টিশকোভিচ নন, ভিক্টর কমারোভস্কি।

তাকে দেখেই এতক্ষণ ধরে ওধারে কুশনের ওপর নিঃসাড়ে শুয়ে থাকা মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল, তারপর একটা গোপন ইঙ্গিত করল।

আগন্তুক ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল নিশা। ইউরার কানে ফিস্‌ফিস করে কি যেন বলতে গেল সে। কিন্তু সকলের সামনে এ ধরণের অভদ্রতা-জনক ফিস্‌ফিস্ করাটা ঠিক শোভন নয় জেনে ওকে নিরস্ত করল ইউরা।

কিন্তু সে নিজে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে নিষ্পলক নেত্রে—কেননা, সে যেন বুঝতে পারছে এই বয়স্ক ভদ্রলোকটি আর কিশোরী মেয়েটির চোখের গোপন সঙ্কেত। যাকে এতদিন টোনিয়া আর নিশা 'অশ্লীল' আখ্যায় ভূষিত করে তর্ক থেকে নিরস্ত হয়েছে।

রাস্তায় এসে নিশা জানাল, লোকটিকে সে একদা ট্রেনের মধ্যে দেখেছে যে ইউরার বাবাকে হত্যা করেছে। কিন্তু সে সব কথা শোনার মতো মন ছিল না ইউরার, কেননা সে তখন ভাবছে মেয়েটির কথা আর তার ভবিষ্যতের কথা।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

কভেনটিট্স্কিদের বাড়িতে ক্রিসমাস উৎসব

একটা কালো পুরোনো কাজ করা আলমারিকে নিয়ে ভারী ভাবনায় পড়লেন আনা। আলমারিটা এতো বড়ো যার জন্য তাকে সিঁড়ির সামনেই রাখতে হোল। আলমারিটা উপহার দিয়েছিলেন তার স্বামী আলেকজাণ্ডার, কিন্তু একে দেখে কেমন যেন মৃতের কবর বলে মনে হোত আনার। তাই এটা ঠিক তার পছন্দও হয় নি।

যাহোক, মার্কেলের ডাক পড়ল আলমারিটার খোলা অংশগুলো জুড়ে দেবার জন্য। আর ঠিক সেই সময়ই বিপর্যয়টা ঘটল। মার্কেলকে সাহায্য করার কথা মনে এলো আনার, আর যেই না আলমারিটার মধ্যে ঢুকে তাকের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখতে গেল আনা সঙ্গে সঙ্গে তাক ভেঙ্গে একেবারে পপাত ধরণীতল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ছুটে এলো, আনাকে ধরে এনে তুলে সোফায় শোয়ানো হোল, ডাক্তার ডাকা হোল।

১৯১১ সালের নভেম্বর মাসটা ফুসফুসের অসুখে কাটাল আনা। এদিকে তার পরের বছরই ইউরা, টোনিয়া আর মিশা যথাসময়ে ডাক্তারি, আইনে আর দর্শনে স্নাতক পরীক্ষা দেবে।

যদিও ছোট বয়স থেকেই শিল্পকলা আর ইতিহাসের ওপর প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল ইউরার তবুও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয়তার এমন কোন কাজ শেখবার ঝোঁক ছিল তার। আর সেজন্যই সে ডাক্তারি পড়ল।

মাটির নীচে অন্ধকার ঘরে তরুণ তরুণীর মৃতদেহ কাটতে কাটতে কতোদিন সে মানব দেহের সৌন্দর্য্যের উৎস সন্ধানে যাত্রা করেছে, কতদিন তাদের বিচ্ছিন্ন শব ও পৃথক সৌন্দর্য উপলব্ধি করে রোমাঞ্চিত হয়েছে। কতোদিন মৃত্যুর গভীর অপার রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, কল্পনায় তার রহস্যময় কবর স্থানে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে।

আজও এইসব ভাবনা শব-ব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত তার মনকে অন্যমনস্ক করে তোলে। কিন্তু এই চিত্ত চাঞ্চল্যতার অভ্যাস হয়ে গেছে—তাই সে ভয় পায় না একটুও।

ইউরা ভাবে, বড় হয়ে সে কবিতা লিখবে না—আর তখন সে লিখবে এতো-দিনের অভিজ্ঞতা থেকে। আজও তার মনোমত জীবনদর্শন ইউরা এখন বুঝতে পারে, পঙ্কের মধ্য থেকেই পদ্মফুল ফোটার প্রায় তাৎপর্য কি হতে পারে। সে বুঝতে পারে মানুষের জীবনের ঘটনা থেকেই জমে তার অভিজ্ঞতায় সঞ্চয়ের ভাষায় মূল্যবান জীবনোপলব্ধি। ওর মনে পড়ে যায় মামার লেখা বিচিত্র ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন বইগুলি, যেখানে তার মামার সুগভীর দার্শনিক উপলব্ধিগুলি কতো মনোজ্ঞ উপমায়, ছন্দে অলঙ্কারে রসে রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

এই রচনাগুলি খৃষ্ট ধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত। এই রচনাগুলি বালক নিশাকেও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে, তাকে প্ররোচিত করে তার ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে।

কিন্তু ইউরা শুধুমাত্র এখানেই থেমে থাকেনি, তার উদগ্র কৌতূহল তাকে এরপরেও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চললো, আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হতেও শিখলো সে। কিন্তু নিশা তা পারেনি। ইউরা বোঝে তার কারণ—তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য—তাই সে পরিবর্তনের দিকে না এগিয়ে আদর্শের পথেই বিচরণ করতে শিখলো। ইউরা মনে মনে প্রার্থনা করলো, নিশার অভিজ্ঞতা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে যেন ঈশ্বর তাকে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলুক।

একদিন কলেজ থেকে একটু দেরী করেই বাড়ী ফিরল ইউরা। যখন ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়েই গেছে। বাড়ী ঢুকতেই ও শুনল আনা নাকি গুরুতর অসুস্থ। তাড়াতাড়ি আনার ঘরে চলে গেল ও। চতুর্দিকে ঔষধের বাক্স আর ইঞ্জেকশনের শিশি ছড়ানো। তার মধ্যে আনা শুয়ে। ওকে দেখেই আনা ভেঙ্গে পড়লেন, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, মুখ দিয়ে অস্ফুটে কি যেন উচ্চারণ করতে লাগলেন। এগিয়ে এল ওঁর কাছে ইউরা, তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

ও চুপ করে যেতেই আনা ধীরে ধীরে বলল, 'আমি কি আর বাঁচব, তোমার কি মনে হচ্ছে ইউরা ?' এক মুমূর্ষু রোগিণীর মুখে এ হেন উক্তি শুনে ধাঁধায় পড়ে গেল ইউরা। কি বলবে যেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তারপর অতিকষ্টে রোগিণীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। তার অজান্তেই একটা বিরাট বক্তৃতা হয়ে গেল, নিজের মুখ থেকে এধরণের দার্শনিক কথাবার্তা শুনে হঠাৎ ইউরা চমকে উঠল।

আস্তে আস্তে শান্ত হতে লাগলেন আনা। ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি ঘর

থেকে বেরিয়ে এল ইউরা। তারপর নার্সকে ডেকে সে ঘরে পাঠিয়ে দিলে। পরের দিন থেকে আনার অবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগল।

তারপর থেকেই আনার ঘরে ইউরা আর টোনিয়ার ঘনঘন ডাক পড়তে লাগল। ওদের ডেকে কাছে বসিয়ে বাল্যকালের কথা বলতেন আনা। ওর বর্ণনা ইউরার কল্পনায় ছবি হয়ে উঠত।

সেদিন তাদের নূতন তৈরী সান্ধ্য পোষাক পরে টোনিয়া আর ইউরা যখন আনন্দে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পরস্পর পরস্পরের পোষাকের দিকে প্রশংসিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তখন হঠাৎ আনা তাদের ডেকে পাঠান ওদের ঘরে।

ঘরে ঢুকতেই ওদের কাছে ডাকলেন আনা। বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই ইউরা।

ওর কথার মাঝখানেই দুম করে বলে বসল ইউরা, জানি আমি। আপনি বলতে চাইছেন যে কেন আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তিটার দাবী ছেড়ে দিলাম। আসলে আমি চাইছিলাম না একটা কোন হিংসা আর নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে। একটা অধৈর্য্যের সুর বাজল তার কণ্ঠে।

ওর মনোভাব বুঝে চুপ করে একটুক্ষণ রইলেন আনা। তারপর বললেন, আমি ঠিক তা চাই না ইউরা। যদিও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পৈতৃক সম্পত্তিটা বিনা মামলায় ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি ইউরা। কি যেন বলতে গেলেন উনি হঠাৎ কাশির দমক এসে ওর গলার স্বর বুজিয়ে দিল। কাশি হতেই লাগল, দম বন্ধ হয়ে এলো আনার।

ওরা ছুটে এলো আনার আরও কাছে। ওদের হাত দুটো একত্রে ধরে বললে আনা, তোমরা দুজনে বিয়ে করে ফেল। আমি আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও। ওরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, আনার দুচোখ জলে ভরে গেছে।

কমারোভস্কির লাম্পট্যের সীমা লারার সহ্যের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেল। ওর কঠিন-নির্দয় দৈহিক অত্যাচার আর কামনা ভরা বিষচক্ষুর দৃষ্টি লারার মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দিল।

পতনের শেষ দিকে নামতে নামতে লারার মনে হতে লাগল এ ধ্বংসের বুঝি শেষ নেই। বসন্তের দৈগ্র কামনা ভরা বাতাস তার সারা শরীরকে অজানা আশঙ্কায় শীতল করে তুলতে লাগল। ফ্লাশায়নের মধ্যে বসে বসে চোখের জলে

বুক ভিজিয়ে সে সিদ্ধান্ত করল আর এ ভাবে চলতে পারে না, এর একটা আশু পরিবর্তন দরকার।

ও যখন এসব ভাবছিল তখন পশ্চিমের ঘন অন্ধকার মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকল। ঝোড়ো বাতাস বইতে লাগল, নামল বৃষ্টি। ফ্লাশায়নের মেঝে মুহূর্তের মধ্যেই ভিজে গেল, উড়ে গেল ব্লটিং কাগজগুলো ডেস্কের ওপর থেকে।

ছাত্রীরা তাড়াতাড়ি দারোয়ানকে ডেকে জানালা বন্ধ করে দিল। ঝড় উঠেছিল লারার মনেও। তার হাত থেকে বাঁচতে চাইল সে। তাই একটা ছোট্ট চিরকুটে কিছু কথা লিখল সে, তারপর কাগজটা আস্তে করে পাশে বসে থাকা নাডিয়ার কাছে এগিয়ে দিল। নাডিয়া দেখল তাতে লেখা, "নাডিয়া, আমি মার কাছ থেকে চলে যেতে চাই। আমাকে সাহায্য করতে পারিস।" তেমনি করেই অতি কৌশলে চিঠির জবাব দিলে নাডিয়া—"পারি। যদি তুই লিপার গভর্নেস হতে রাজি থাকিস।" এতো তাড়াতাড়ি এমন সুযোগটা হাতে পাওয়ার আনন্দে প্রায় নেচে উঠল লারা তারপর আগামী ভবিষ্যতের জন্য খুব তাড়াতাড়ি মনস্থ করে নিল।

কলোগ্রিভরা এই নতুন গভর্নেসকে আপন করে নিলো। তার পুরোনো বন্দী-জীবন থেকে মুক্তিলাভ করে নিজেকে পাখির মতো হাল্কা মনে হোল লারার।

একদিন ঘরে বসেছিল লারা, এমন সময় প্রবেশ করলো রডিয়া। সে এসেছে লারার কাছে কিছু টাকা চাইতে। টাকাটা তাকে ক্যাডেটার দিয়েছিল কিন্তু সে জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে। সব শুনে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল লারা। রাগে ঘৃণায় তাঁর মুখ দিয়ে কথাও বার হচ্ছিল না। 'বলল, দূর হয়ে যাও, টাকা আমার কাছে নেই।' ও স্থির হয়ে বসে রইল। ওর অনুমানই সত্য হোল। একটু পরেই লারা টাকাটা এনে দিল ওর হাতে। কিন্তু যাবার সময় পর্যন্ত তিরস্কার করতে লাগল ওকে।

আস্তে আস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরোবার শেষ ধাপে উপস্থিত হোল লারা। ওর ছাত্রী লিপারও বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে।

পাশাকে না জানিয়েই লারা সাইবেরিয়ায় তার বাবাকে টাকা পাঠাতো। মা আর পাশার বাড়িওলাকেও সে টাকা পাঠায়। লারা জানে তার সম্বন্ধে পাশার

কি ধারণা। আর তার ওপরই ভিত্তি করে সে স্বপ্ন দেখে সেও পাশার আগামী ভবিষ্যতের।

অনেক বছর বাদে ১৯১১ সালের গ্রীষ্মকালে কলোগ্রিভদের সঙ্গে ভুগ্রিয়ানকায় হাজির হল লারা। যতক্ষণ সে রাস্তা দিয়ে চলছিল, ততক্ষণই দুচোখ ভরে লারা প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যসুধা পান করতে ব্যস্ত ছিল।

সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ধরেই নানা উৎসব চলছিল কলোগ্রিভদের বাড়িতে। কিন্তু লিপা বড়ো হয়ে যাওয়াতে কি রকম আঘাত পেয়ে বসেছিল লারাকে। আর সেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে পালাতে না পেরে অসহ্য যন্ত্রণার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এই রকম এক ধরণের যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে বাস করেই লারা ঠিক করল, না, এবার সে এখান থেকে চলে যাবে অনেক দূরে। তারজন্য তার সাহায্যের দরকার কমারোভস্কির, নিজের মনেই চিন্তা করল লারা, কমারোভস্কি কি তাকে সঙ্গে করে এখনও সম্মান দেখিয়ে এগিয়ে আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে কেননা তার কাছ থেকে এরকম একটা দাবী করার অধিকার আছে লারার।

সেদিন ছিল ১৭ তারিখ। সারাদিনের পর রাত্তিরবেলা পেট্রোভকা যাবার জন্য গাড়ীতে উঠল লারা। মাথার মধ্যে সেই মতলবটা আর হাতের পাশে লুকানো পিস্তলটা তার এই যাত্রার সঙ্গী।

সারাটা পথ গাড়ীতে ভাবতে ভাবতে চলছিল লারা, যদি কমারোভস্কি তাড়িয়ে দেয়? যদি তাকে অস্বীকার করে অপমান করে। জানালা দিয়ে একবার রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে আবার মাথা ঢুকিয়ে নিলে লারা। তারপর সোফায় গায়ে নিজের উত্তপ্ত ভার-সর্বস্ব মাথাটাকে রেখে ভাবলে, সঙ্গে বন্দুক আছে ত? সেই তাকে সবশেষে সাহায্য করতে পারবে। ওর বুক ভেঙ্গে একটা গাঢ় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে সোজা ওপরে উঠে গেল লারা। এম্মাকে জিজ্ঞাসা করল। ও বলল, কমারোভস্কি নেই, বাইরে বেড়াতে গেছেন। উনি লারাকে অপেক্ষা করতে বললেন, কিন্তু ততক্ষণে লারা নেমে গেছে নীচে। ওর গাড়ির ঘণ্টার শব্দ দূর হতে ভেসে আসছে।

এই প্রথম রাত্রে একা গাড়িতে চড়ে যেতে যেতে এই জনাকীর্ণ পৃথিবীতে নিজেকে বড়ো অসহায় বলে মনে হল লারার। ব্যর্থতায়, হতাশায় ওর চোখ দিয়ে

জল গড়িয়ে পড়লো—তুষারপাতে জমে থাকা শূন্য পথের ওপর দিয়ে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে চললো সে। কামেরনের পাশ দিয়ে গাড়িটা যখন দ্রুতবেগে ছুটে চললো, তখন কেঁদে ফেললো লারা। আর পারি না, আর সহ্য হয় না—চীৎকার করে উঠল ও। তারপর চালককে ওখানেই গাড়িটা থামাতে বলে দ্রুতবেগে নেমে গিয়ে পাশার বাড়ির সদর দরজাটার কড়া নাড়তে লাগল।

সামনের ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে অর্ধ সমাপ্ত পোষাকে নিজেকে দেখতেই ব্যস্ত ছিল পাশা। যখন বুঝতে পারলে যে লারা ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকে পড়েছে, নির্লিপ্ত শান্ত পায়ে ওর দি কই এগিয়ে আসছে তখন তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে বিছানায় বসালো পাশা। নিজের জ্যাকেটটা খুলে আলনায় রেখে সোফার দিকে ফিরে গেল লারা। তারপর বলল, পাশা আলোটা নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী ব্যাপারে কিছু আলোচনা করার দরকার আছে।

মোমবাতির নরম আলোয় আরো ঘন হয়ে এলো পাশা লারার কাছে। জানালার ওপর মোমের আলোয় গলে যাওয়া ফুটোটার দিকে তাকিয়ে একটু উদাসীন স্বরে লারা বললে, পাশা আমি এক ভীষণ বিপদে পড়েছি। আমি চাই আমাদের বিয়েটা শীঘ্র হয়ে যাক। তোমার কি মত? অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল পাশা। তারপর উৎফুল্ল নেত্রে গলার স্বর গাঢ় করে বললে, আমিও আর বিলম্ব করতে চাই না লারা। কিন্তু তুমি যে আশঙ্কার কথা বলছ, সেটা কি ধরণের, শুনতে পারি কি?—"তোমাকে সব কথ খুলে বলতেই এসেছি আমি।" একটু নড়েচড়ে বসল লারা। তারপর অনেকক্ষণ একটানা বকে চলল, কিন্তু সেগুলো সবই অসংলগ্ন আর আগের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন যে পাশা তার সঙ্গে সেই সম্ভাব্য বিপদের কোনই যোগসূত্র খুঁজে পেল না।

টোনিয়ার পাশাপাশি গাড়িতে করে যেতে যেতে ভাবছিল ইউরা তার প্রতিযোগিতায় পাঠানো চোখের স্নায়ুতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধটি সম্পর্কে। টোনিয়া ভাবছিল তার মায়ের ভবিষ্যৎ নির্দেশের কথা, আর ভাবতে ভালো লাগে ইউরার—যে টোনিয়া তার বাল্যকালের সাথী ও সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই এখন তার আজীবনের সঙ্গিনী হিসাবে নির্বাচিত। একটা অজ্ঞাত সুখের ছোঁয়ায় ইউরা বারবার কম্পিত হচ্ছিল।

রাস্তার বুকে গাড়ির চাকার ঘরঘর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মনের তার যোগসূত্রে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল ইউরার। একবার তার মনে হোল আনার নির্দেশ মেনে টোনিয়াকে নিয়ে এখানে আসা তার উচিত হয় নি, কেন না আনার শরীর খুব অসুস্থ।

শীতে জমে যাওয়া বাড়িগুলো আর রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ইউরার —গায়ে যেন শুভ্র পোষাক পরিহিত কোন অচঞ্চল মানুষ। উৎসব মুখর জনাকীর্ণ রাস্তার বিচিত্র শব্দ ইউরার কানে প্রবেশ করছে ক্ষণে ক্ষণে। ওদের দেখতে ইউরার মনে একটা প্রবাদ রচনার প্রেরণা এলো। ভবিষ্যতে কোন একদিন দেখা যাবে, এই ভেবে নিজেকে তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিল ইউরা।

ওরা যখন স্ভেনটিটস্কিদের বাড়ীতে পৌঁছল তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। হল-ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য নাচিয়েদের দোদুল্যমান দেহভঙ্গীমা। নাচের আসরে নায়কত্ব করছে তরুণ কোকা কর্নাকভ। ভাল্‌জ নাচের পর যখন উত্তেজিত ও শান্ত নর-নারীরা তাদের রক্তিম মাদকতাময় ঠোঁটে ঠাণ্ডা পানীয় ভরা গ্লাসগুলো ছোঁয়ালো, তখনই তাদের ঘরের পাশ কাটিয়ে ইউরা আর টোনিয়া ফ্ল্যাটের অন্যদিকে এগিয়ে গেলো।

ওরা যখন নিমন্ত্রণকর্তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন স্বামী স্ত্রীতে উপহারের কার্ডের আর লটারির টিকিটের নম্বর লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই ওরা ওদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর ওদের হাতে দিলেন একটু আগের প্রায় গোলমাল করা বিপর্যস্ত উপহারগুলো ঠিকমত সাজিয়ে দেবার জন্য। ফলে সেদিন তারা যখন এখান থেকে ছুটি পেল তখন রাত্রি অনেক, বাইরের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এই উৎসবে লারাও নিমন্ত্রিত ছিল। কিন্তু ও জানত না বোধহয় যে কমারোভস্কিও এখানে আসবে। ওকে দেখেই কেন জানি লারার ইচ্ছা জাগল কমারোভস্কির সাদর আপ্যায়নের স্বাদ পাবার। কিন্তু যতোই সে কৌশল করে কমারোভস্কির সামনে আসতে লাগল ইচ্ছা করে, ততোই দেখল কমারোভস্কি তাকে যেন ইচ্ছা করেও না দেখার ভান করে সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে। অপমানে মাটিতে মিশে গেল লারা। তারপর ওখান থেকেই যখন সে দেখলে যে সামনের দিকে চলে যাওয়ার একটা মেয়ের দিকে কমারোভস্কির দৃষ্টি একমনে নিবদ্ধ। যখন তারা কৌশলে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো, তখন লারা বানরোপম জন্তুর

মতো প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো. তারপর সব কিছুকে জোরের সঙ্গে উপেক্ষা করে নাচঘরের দিকে এগিয়ে গেলো।

রাত তখন প্রায় দুটো। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ইউরা, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরে সুন্দরী টোনিয়ার ওপর। টোনিয়া তখন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে নাচে ব্যস্ত; নাচের সঙ্গে সঙ্গে ওকে মাঝে মাঝে মৃদু ছুঁয়ে যাচ্ছিল টোনিয়া। ওর রুমালের মৃদু আঘ্রাণের মধ্যে একটা নরম উত্তেজনা মেশানো ছিল। দুচোখ মুগ্ধ আবেশে বুঁজে এলো ইউরার। বারবার রুমাল ঠোঁটে আর নাকে-চোখে বুলোতে বুলোতে কখন যেন টোনিয়ার স্বপ্নে নিজেকে হারিয়ে ফেলল ইউরা।

গুলির আওয়াজে এই মধুর স্বপ্ন টুটে গেল ইউরার। সকলের পেছন পেছন ও হলঘরে ছুটে এলো টোনিয়ার হাত ধরে। ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার ওরা নাচ ঘরে চলে এলো, চোখে পড়লো ইউরার একটা মেয়েকে—হ্যাঁ এবার সে মেয়েটিকে চিনতে পেরেছে। টিশকোভিচের বাড়ীতে দেখা সেই মেয়েটিকে ধরে আনছে একদল লোক আর সামনে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে কর্নাকভ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার বৃথাই চেষ্টা করছে। তিনি যতো বলছেন—তার কিছু হয় নি, ততোই উত্তেজিত জনতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী কর্ণাকভ চীৎকার করে বলছেন, 'বোরিয়া বোরিয়া তোমার কিছু হয় নি; তুমি বেঁচে আছ তো?'

কমারোভস্কি.কে দেখে চমকে উঠল ইউরা। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরলো তাকে। একটু পরেই নিজের ভুল বুঝতে পারলো। যারা লারাকে ধরে নিয়ে আসছিল, তারা কোন প্রতিহিংসা বশতঃ নয়, সহানুভূতির সঙ্গেই ওকে ধরে নিয়ে আসছিলো।

আস্তে আস্তে ওরা কেদারায় শুইয়ে দিল লারার অচৈতন্য দেহটাকে। ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে এল ইউরা, আর ঠিক তখনই দেখতে পেল টোনিয়া আর ফেডিরণভার বিষণ্ণ পাংশুমুখ। তাড়াতাড়ি ওদের কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কি হয়েছে?

বাড়ি থেকে খবর এসেছে এখুনি যেতে হবে, ওদের গলার স্বর কাঁপছিল প্রচণ্ড ভয়ে। কি একটা মনে পড়ে গেল ইউরার, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে টোনিয়ার হাত ধরে গাড়িতে উঠল সে দ্রুতপায়ে, পেছনে পেছনে এল ফেডিরণভা। মুহূর্তের মধ্যেই একটা ক্ষীণ শব্দ তুলে গাড়িটা সামনের দিকে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেল। ধীরে ধীরে একটা কিছু আকৃতি নিল, তারপর দূরের রাস্তার ওপর মিলিয়ে গেল।

বাঁচল না আনা, ফুসফুসে জল জমে শ্বাসকষ্টে মারা গেল। মায়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টোনিয়াকে দেখে মনে পড়ে গেল ইউরার, বাল্যকালে নিজের মায়ের মৃত্যুর কথা। মায়ের মৃত্যুর সময় বালক ইউরা বড়ো বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সব সময় তার মনে হতো সে বড়ো একা। তার এই একক সত্তার কোন পৃথক মূল্য নেই, এই বিরাট পৃথিবীতে। ইউরার মনে পড়তো তার সান্ত্বনাদায়িনী, শুশ্রূষাকারিণী করুণাময়ী ধাত্রীর কথা, যার উপস্থিতিতে স্বর্গ নেমে আসত পৃথিবীতে। মনে পড়ল সেই স্বর্গীয় পবিত্রতায় ভরা গলির ধারের ছোট্ট গার্ডেনটার কথা যেখানে সে নার্সের হাত ধরে রোজ বেত।

তখনকার বালক মনের সেই বিচিত্র কৌতূহল আজ আর নেই ইউরার। বালক বয়সে তাই নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করে। বালক ইউরা জানিয়েছিল ঈশ্বরের কাছে তাঁর মায়ের আত্মার শান্তির জন্য, আজ আর তা পারল না পরিণত প্রজ্ঞার অধিকারী যৌবন গর্বিত ইউরা। কেননা, এখন সবকিছু বদলে গেছে, পরিবর্তিত হয়েছে বালক ইউরা যুবক ইউরায়।

ইউরাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সারা বাড়িতে তাই হুলস্থূল পড়ে গেছে। নীচে কফিনের মধ্যে শায়িত আছেন আনা, তাঁর চারপাশ ঘিরে বহু শোকার্ত নর-নারী।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো মার্কোল। কিন্তু ততোক্ষণে ইউরা নীচে নেমে গেছে। ওকে দেখে আশ্বস্ত হোল সবাই, নেমে আসতে বলল মার্কোলকে। দরজায় লাথি মেরে পাল্লাটাকে ভেঙে এক লাফে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল মার্কোল। ও আসতেই সকলে আনার কফিনকে কাঁধে তুলে নিল তারপর নিঃশব্দে লাইন করে এগিয়ে চললো শ্মশানের দিকে।

ওরা কবরখানার দিকে এগিয়ে চলছিলো আস্তে আস্তে, নানাজনে নানারকম মন্তব্য করছিল। কিন্তু সেসব দিকে মন ছিল না ইউরার। শক্ত হিমে জমে যাওয়া কবরের মাটির দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল এই মাটিতেই ওর মাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। অনেক বছর আগে যেভাবে একটা অসহায় বালক তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের খোঁজে কান্নাভরা গলায় ডেকে উঠেছিল, ঠিক তেমনি করেই ও ভয় পেয়ে উচ্চারণ করলে ইউরা, 'মা'! এই ছোট্ট শব্দটা দিক হতে

দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগল, ইউরার সর্ব শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হ'তে থাকল, একটা অনাবিল আনন্দে তার সর্ব শরীর অবশ হয়ে যেতে শুরু করল।

দূর থেকে দেখতে পেলে ইউরা কালো পোষাক পরে বিষণ্ণ মুখে টোনিয়া ওর বাবার হাত ধরে ফিরে যাচ্ছে। গির্জার উঠোনের কোণে এখন যেখানে কাপড় জামা ঝুলছে সেখানে সেদিন তুষার ঝড় বালক ইউরাকে ভয় দেখিয়েছি। এই শোকস্তব্ধ জনতার থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে ইউরা, ওর স্বপ্নের চিন্তা ওকে ক্রমশঃ যেন উত্তেজিত করে তুলেছে, এই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার।

মনে মনে ঠিক করল, আনার মৃত্যু স্মরণ করে সে একটা শোক-গাথা লিখবে। তারজন্য সে এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্য অনেক দূরে চলে যাবে। তার কবিতায় থাকবে বালক ইউরা থেকে যুবক ইউরাকে কেন্দ্র করে বহু ঘটনার বহু স্মৃতির কাব্যময় প্রকাশ।

থমকে দাঁড়াল ইউরা, সে অনেক এগিয়ে এসেছে। পেছনের জনতা সামনে এসে পড়তে, সে মিশে গেল ওদের মধ্যে, তারপর সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শুরু করল।

চতুর্থ অধ্যায়

১ অনিবার্যের আবির্ভাব

জ্বরের ঘোরে চেতনা হারিয়ে লারা শুয়ে আছে ফেলিটসাটা সামওনোভনার বিছানায়।

নীচের গলিতে ক্রুদ্ধ বিরক্ত কমারোভস্কি দ্রুতবেগে পায়চারি করছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মনে মনে লারার এই অবিবেচকের মতো কাণ্ডকারখানায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে কমারোভস্কি—কারণ এতে তার মুখ চোখের ওপর আঘাত এসে পড়তে পারে, অন্যদিকে এই অসামান্য সুন্দরীটার ওপর মায়াও যেন অনুভব করে ও। সত্যিকার বলতে গেলে, ওর জীবনটা নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী কমারোভস্কি।

মনে মনে ওকে ভয় করে কমারোভস্কি। তাই অনেক ঝামেলা সয়ে তাঁকে গণ্ডগোল এড়িয়ে মনটাকে শান্ত করতে হয়েছে। লারাকে বাঁচাতে গেলে তার বিরুদ্ধে খুন করার অভিযোগটাকেও সম্পূর্ণ ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করতে হবে তাকে, তাই অযথা নিজেকে উত্তেজিত না করে শান্ত মাথায় চিন্তা করতে লাগল।

কমারোভস্কি বন্ধুর খালি ফ্ল্যাট বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিলেন সে রাত্রেই তারপর সকলেরই সহায়তায় দু ঘণ্টার মধ্যেই অচেতন লারাকে এনে ফেললেন এ বাড়িতে।

ভীষণ রুক্ষ আর বদমেজাজী স্বভাবের এই রুফিনা অনিসিমোভনা, যার ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছেন কমারোভস্কি লারাকে নিরাপদে রাখার জন্য। প্রথম দিনেই লারাকে দেখেই রীতিমত বিরক্ত হলেন, তিনি মনে করলেন এটা হল লারার মতো সুন্দরীর একটা ঢং। অবজ্ঞার চোখে তিনি তাকাতেন লারার দিকে।

এদিকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে লারার মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা। ওর মনে পড়ে গেল মাত্র আট বছর আগেকার একটা ছোট্ট ঘটনার কথা। সেদিন সন্ধ্যায় মস্কো নগরীর রক্তিম সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল লারা। কমারোভস্কির সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় ও একটা নিমন্ত্রণ রাখতে যাচ্ছিল। সেদিন কমারোভস্কি হাসতে হাসতে একটা ঘন সবুজ রসে ভরপুর তাজা তরমুজ কেটেছিল। লারার

কেন জানি না মনে হয়েছিল, ওর রক্তাক্ত টুকরোটা বুঝি ওরই রক্তাক্ত হৃদয়। আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে গেলেও কমারোভস্কির অনুরোধে সে ওটা গিলতে বাধ্য হয়েছিল সেদিন।

এখন কমারোভস্কির উদাসীন অথচ সতর্ক আচরণ লারাকে বিস্মিত করে, বিস্মিত করে অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কলোগ্রিভের মনপূর্ণ ভিন্ন ধরনের আচরণও। যে ব্যক্তিটির শান্ত গম্ভীর মূর্তি বাড়ীতে লারার ভয় আর শ্রদ্ধা কুড়োত, তিনি বিছানার পাশে এগিয়ে এলেন, শান্ত মৃদু স্বরে সহানুভূতি জানালেন আর তারপর জোর করে লারার হাতে গুঁজে দিলেন দশ হাজার রুবলের একটা চেক।

অগত্যা সুস্থ হয়ে লারা কলোগ্রিভদের অনুমোদিত একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সেখানেই বাস করতে লাগাল।

ছটফট করছে পাশা, অনেকদিন লারাকে দেখতে পায় নি ও। ও শুনেছে লারা নাকি একজনকে খুন করতে গেছিল, অথচ পরে সুস্থ হয়ে তারই ইচ্ছা অনুযায়ী সে পড়াশুনো শুরু করেছে, সেই ভদ্রলোকেরও লারাকে রক্ষা করার জন্য কী প্রচেষ্টা। ভাবতে ভাবতে অসহ্য যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করে পাশা, লারাকে ও ঠিক বুঝতে পারে না।

যেদিন লারা বললে যে সে আর পাশাকে ভালোবাসা না, পাশা তাকে ভুলে যাক এই সে চায়, সেদিন নীরবে চোখের জল ফেললে পাশা। তার ভালোবাসার মানুষটির কাছে এহেন আচরণ এক জটিলতার সৃষ্টি করে তার মনে। অবশেষে সব জটিলতার, সব রহস্যের সমাধান করতে সে লারাকে বিয়ে করতে মনস্থির করে।

এক সোমবার ওদের বিয়ের দিন স্থির হয়। সূর্যের উজ্জল প্রখর সোনালি আলো আর অগণিত নিমন্ত্রিতজনকে সাক্ষী রেখে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহের সময় লারার ঠাকুরমার নির্দেশ অমান্য করে নিজের কর্তৃত্বকে পাশার হাতে তুলে দেবার জন্য মোমবাতিটা অসম্ভব রকমের নীচু করে লারা, কিন্তু তবু পাশাকে হারাতে পারে না। লারার হাতের মোমবাতি আরো নীচু হয়ে আসে।

সে রাত্রে সবাই চলে যাওয়ার পর পরস্পর খুব কাছাকাছি এলো। উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে নিয়ে লারাকে জিজ্ঞাসা করলে পাশা, তার ফেলে আসা জীবনের সম্বন্ধে অনেক অনেক কিছু, কিন্তু প্রত্যেকটা জবাব তার কল্পনাকে টুকরো টুকরো করে দিতে লাগল। সে রাত্রের পরদিন নতুন সূর্য ওঠার সঙ্গে পাশারও নবজন্ম হোল যেন।

আবার পাশার ঘরে অনেকে জমায়েত হয়েছে। ভালোভাবে পাশ করার জন্য নতুন চাকরিতে জয়েন করতে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে পার্টি ডেকেছে লারা আর পাশা। পরের দিন সকালেই তারা রওনা হবে, তাই লারা অফিসে গেছে জন্মপত্রিকা আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য।

যখন সে ফিরে এলো তখন অতিথিদের মধ্যে নতুন করে হুল্লোড় জাগল। রঙিন পানীয় উপচে পড়তে লাগল সকলের পাত্রে আবার। আস্তে আস্তে স্বামীর পাশে বসল লারা, হাসল—হেসে বলল, "সব জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে ?"

শান্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিল পাশা, হ্যাঁ।

এই পার্টিতে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কমারোভস্কিকেও। সবার শেষে কমারোভস্কি উঠানে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলে শক্ত দৃঢ় স্বরে অসম্মতি জানাল লারা। তারপর কথা শেষ না করেই দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলে গেল লারা, কিন্তু সেখানে কাজের থেকে অকাজই করল বেশী।

দরজায় কড়া নেড়ে নাডিয়া জানাল তার আগমনবার্তা। একটা তাজা ফুলের সুবাস নিয়ে ঘরে ঢুকল নাডিয়া তারপর তার পরিবারের উষ্ণ অভিনন্দন আর শুভকামনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে খুব সুন্দর পাথর বসানো একটা হার খুলে দিল লারার হাতে। পাথরগুলোর নীল আর হলুদ মেশানো উজ্জ্বল জ্যোতি লারাকেও আনন্দ দিলো প্রচুর।

খাওয়ার পর সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। একটা সোফার ওপর শুয়ে পড়ল লারা। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখল অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পাশা তার সুটকেশ ঘেঁটে কি যেন খুঁজছে। লোকটা যে পাশা নয় তা বুঝতে একটু সময় লাগল ওর। সঙ্গে সঙ্গে সকলকে সচেতন করার জন্য একটা কৌশল করল ও। পাশে শুয়ে থাকা ইরার পেটে হাটু দিয়ে গুঁতো দিল সে। অসহ্য যন্ত্রণায় ইরা চীৎকার করে উঠল, ছুটে পালিয়ে গেল চোরটা।

লোকটা পালাতেই ধড়মড় করে উঠে বসল লারা। তারপর তাড়াতাড়ি কফি তৈরী করে সকলকে ডেকে তুলে দিল ও। কফি খেয়ে সকলে যে যার বাড়ী চলে গেল ঠিক সময়ে ষ্টেশনে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। হট্টগোল কমে যেতে নিশ্চিন্ত-মনে জিনিষপত্র গোছাতে বসল লারা। ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছেও গেল। ওরা জিনিষপত্র গুছিয়ে বসবার পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে রাশিয়ায়। এ বছর অবশ্য সাফল্য নয়, নৈরাশ্যের বার্তাই বহন করে নিয়ে এলো শরৎকাল।

এমনই দিনে স্ত্রী টোনিয়াকে নিয়ে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে এলো ইউরি আন্দ্রিয়েভিচ ওরফে ইউরা। ডাক্তারের ঘরে নিয়ে গেছে টোনিয়াকে, এখন ইউরা একা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ইউরা, দেখল ছত্রখান বৃষ্টির রেখাগুলো পার্কের বাসা-বাড়ির কাঁচে ঢাকা বারান্দায়, বারান্দার ফাঁকে, কার্ণিশে ধাক্কা মারছে, প্রচণ্ড রাগে উপড়ে দিচ্ছে কোন এক গৃহস্থের লতা গাছটিকে।

সিঁড়ির নীচে শুয়ে থাকা অসুস্থ মানুষগুলোর দিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল, ওর মনে পড়ে গেল এখুনি ওকে রোগী দেখতে যেতে হবে। দুদিন অপেক্ষা করার অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হলো ইউরাকে, তৃতীয় দিন লম্বা করিডর দিয়ে এগোতে এগোতে শুনল নবজাত শিশুর আগমন বার্তা। ইউরার মনে হোল, ও যেন মর্তলোকের দেবদূত! খুশী আর আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলো ইউরা। টোনিয়াকে ভগবান মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, ঈশ্বরকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানাতে লাগল সে।

—একী, আপনি এখানে কী করছেন? উহুঁ, এখন তো আপনার স্ত্রীকে আপনাকে দেখতে দেওয়া হবে না। এর কারণ আপনার মতো একজন প্রথিতযশা ডাক্তারের পক্ষেও অজানা নয়। যান, নীচে ফিরে যান। দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে আসায় ইউরাকে ধমক লাগালেন ডাক্তার। একটু লজ্জিত হোল ইউরা নিজের আচরণে, তারপরে খুব করুণ মিনতি করে দরজার ফুটো দিয়ে দেখবার অনুমতি চাইল।

বাধ্য হয়ে অনুমতি দিলেন ডাক্তার। আর সেই ফুটো দিয়েই ঘরের ভেতর চোখ রাখলো ইউরা।

বিছানার ওপর শুয়ে আছে টোনিয়া, ও এখন গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত। ওরই দেহের এক অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে এক শিশু, যে দশমাস দশদিন ধরে ওরই রক্ত মাংস, নিঃশ্বাস থেকে তিল তিল করে ঋণ নিয়ে গড়ে উঠেছে ওর অস্তিত্বকে স্থায়ী করতে, ওকে মাতৃত্বের পরম স্বাদ এনে দিতে। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু কাঁচি আর ছুরির মৃদু টংটাং শব্দ।

ও হাসপাতাল থেকে নেমে আসার আগেই দ্রুত খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। সংবাদের এই অসাধারণ গতি দেখে অবাক হোল ইউরা। ওখান থেকেই

ও শুনলো, ওর আহ্বান এসেছে কোন এক বড়ো হাসপাতালে। ওখানে ডাক্তারের অভাবের দরুণ জিভাগোর যাওয়া প্রয়োজন।

ইউরিয়াটিনে বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই ওরা কাটিয়ে দিলে চার বছর। গুইসারদের মেয়ে লারা, একথা সবাই মনে রেখেছে। আর তাই সকলেই ওদের নতুন সংসারকে ভালবাসার চোখে দেখতে লাগল।

এখন সংসারের অনেক দায়িত্ব লারার মাথার ওপর। সারা দিন সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করার পর বিছানায় যখন ও ঘুমিয়ে পড়ে, তখন নিজের মুখ দেখে ওর নি জরই ঈর্ষা হয়। এখন ওর একটা মেয়ে হয়েছে তার নাম রেখেছে ওরা কাটিয়া। মাত্র তিন বছর বয়স তার। এদের নিয়েই অসম্ভব রকমের সুখী লারা।

মফঃস্বলের এই নির্জন গ্রামে অবসর সময়ে পড়াশোনা করে পাশা। ওর জ্ঞান, ওর দ্রুত পঠন, ওর প্রতিভা, ওর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তাক লাগায় লারাকে। এই জীবনে সুখী ছিল পাশাও, যদিও মাঝে মাঝে এক ধরণের চিন্তা এসে ওকে আচ্ছন্ন করে—মনে করে এই বুঝি লারা ওর ব্যবহারে দুঃখ পায় অথবা মনে করে সে পাশার কাছে এক ধরণের হাস্যাস্পদ অথবা তার ব্যর্থ প্রণয়ের প্রতি কটাক্ষ করছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে ওর মত করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করে পাশা আর তাতেই তাদের সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে ওঠে।

সেদিন অতিথিরা চলে যাবার পর পাশা অনুভব করলো লারা এসে তার বিছানায় শুয়েছে। ওর ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল পাশা। তারপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে এসে চন্দ্রালোকিত পরিচ্ছন্ন তুষারধৌত মাটির ওপর দাঁড়াল।

উন্মুখ আকাশের নীচে তাকিয়ে গলুইয়ের ওপর বসে ভাবতে শুরু করলো পাশা, লারা কি সত্যিই তাকে ভালোবাসে না সে শুধুই পাশার উন্মাদ ভালোবাসাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতাপাশে তার বাহুবন্ধনে ধরা দেয়। ঠিকমত বুঝতে পারে না লারাকে, এক একবার মনে হয় বুঝি লারা কমারোভস্কিকে ভালোবাসে, ভালোবাসে নিজেকে। আর সে?

চমকে নিজের দিকে ফিরলো পাশা, আশ্চর্য হোল সে নিজেকে দেখে। ওর আচরণকে সে এতোদিন লারার প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ বলে মনে করে এসেছে, আজ দেখছে তারাও আসলে এক ধরণের মনোমুগ্ধকর উন্মত্ততাবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অকস্মাৎ ও বুঝতে পারলো নিজেকে আর তার স্ত্রী কন্যাকে এই অসহ

বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিতে হলে তার এখুনি কিছু একটা করা দরকার। দূর থেকে একটা আলোর গোলা ছুটে আসছে, ভেসে আসছে তার আগমনের সঙ্কেতবার্তা—ভেসে এলো বুঝি পাশার সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও। একটু পরে ও যখন উঠে দাঁড়াল, তখন যেন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে।

যাবার প্রস্তুতি করছে পাশা, অবাক হয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে লারা। ও যেন এখানকার পাশাকে ঠিকমত চিনতে পারছে না। একবার তার পায়ে পড়ে না যাবার জন্য করুণ মিনতি জানালো লারা, চোখের জলে গা ভিজিয়ে পাশাকে ফিরোতে চেষ্টা করলো লারা। পরে যখন বুঝতে পারল, পাশা তাকে ভুল বুঝেছে, তার ভালোবাসার ঠিক মর্মটা বুঝতে পারেনি ও, তখন যেন বেদনায় কাঁদতেও ভুলে গেল লারা। পাশাকে ছেড়ে দিল ও।

প্রথম প্রথম ঘন ঘন চিঠি লিখত পাশা, এখন ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল, ব্যাকুল হয়ে উঠল লারা। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও যখন পাশার কোন খোঁজ মিলল না তখন লারা নেমে এলো পথে। মেয়েকে লিপার কাছে রেখে হাঙ্গেরীর সীমান্তগামী এক হাসপাতাল গাড়িতে নার্সের চাকরি পেলো সে। এর আগেই সে নার্স হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ওখানে অর্থাৎ জিস্কিতে লারা আশা করল একটা অতি পরিচিত পদধ্বনি শোনার, কেননা শেষ চিঠিতে পাশার ঠিকানা দেওয়া আছে জিস্কির, তার ট্রেনটা ওখান দিয়েই যাবে।

একটা রেডক্রশ ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নামলেন গর্ডন, জিভাগোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তিনি। হাতে তাঁর উপহার, সৈন্যদের জন্য।

একটা পতিত ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে দ্রুত চলেছে গর্ডনের ভাড়া গাড়িটা অন্ধকার থেকে সৈন্যদের হুকুম নেমে এল, তাড়াতাড়ি চালক গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। এই নতুন পথ দিয়ে যেতে যেতে পথ ভুল করে ফেলল সে, পরে যখন ইউরার গ্রামের সঠিক নিশানা পেল, অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হয়ে গেছে।

একটা উঁচু মাচার ওপর বসে দূর থেকে দূরবীন দিয়ে সমস্ত যুদ্ধটাকে দেখতে ব্যস্ত গালিউলিন—যিনি একদা ইউসুপকা নামেই পরিচিত ছিলেন, পিয়টর খুডোলোয়েভের অত্যাচারের শিকার ছিল সে।

প্রথমে বাহিনীর পাহারাদারদের ওপর আর ড্রিলের দেখাশোনার ওপর নজর

রাখার কাজ দেওয়া হয় তার ওপরে। সুখেই ছিল সে একরকম, একটা আরামের কাজ পেয়ে, কিন্তু যেদিন খুভংশায়েভ এলেন তার অধীনস্থ কর্মচারী হয়ে, সেদিন থেকে একটা প্রতিহিংসার মনোভাব জেগে উঠল তার মধ্যে। নিজেকে রক্ষা করার জন্য তাড়াতাড়ি বদলির অর্ডার নিয়ে এই যুদ্ধক্ষেত্রে এল। আন্টিপভ এখন যিনি শত্রু-পক্ষের ব্যূহ ভেদ করার জন্য প্রাণপণে লড়ছেন, যিনি বাহিনীর প্রথম সারির পরিচালক, একদা খ্যাত যিনি কেবলমাত্র পাশা নামে তাকে চিনত ইউসুপকা গালিউলিন। চিনতো ওর সেই রহস্যে ভরা দূরে হারিয়ে যাওয়া গম্ভীর চিন্তামগ্ন দৃষ্টি! তিনি এখন যেন কেমন পাল্টে গেছেন। দেখতে দেখতে চমকে উঠে ইউসুপকা দেখল, প্রথম বাহিনী শত্রুপক্ষের ব্যূহে প্রবেশ করে যখন নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনার মুখে তখনই দ্বিতীয় বাহিনী পিছিয়ে পড়ল। আর সেই অসতর্ক মুহূর্তেই শত্রুপক্ষের কামানের ধোঁয়ায় হারিয়ে গেল আন্টিপভের বাহিনী, সৈন্যসহ অসহায়ের মতো বন্দী হোল বীর, সাহসী বুদ্ধিমান পাশা আন্টিপভ।

মরে গেল ও, এমন ধারণা করে অন্যায় কিছু হোল বলেই মনে হোল ইউসুপকার। ওর হাতে এলো পাশার কাগজপত্র, তার পরিবারের ছবি আর একান্ত ব্যক্তিগত কিছু দরকারী জিনিসপত্র।

লারাকে এতো তাড়াতাড়ি এই মর্মান্তিক খবরের সঙ্গে পরিচিত করতে ইচ্ছা করল না। তাই ও দেরী করতে লাগল খবরটা পাঠাতে। এদিকে ততোক্ষণে লারা এসে গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে নার্সের চাকরি নিয়ে, ওখানে বসে বসেই খবরটা শুনল সে। কিন্তু বুঝতে পারলো না, কোন ঠিকানায় লিখে তারা লারার কাছে চিঠি পাঠিয়ে জানাবে তার স্বামীর এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ।

যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল গর্ডন। কিন্তু বাইরের উত্তপ্ত বিপদসঙ্কুল আবহাওয়ার কথা স্মরণ করে তাকে নিরস্ত করতে লাগল ইউরা।

এই বীভৎস যুদ্ধের ছোঁয়াচ এখনো লাগেনি এই গ্রামটায়। তাই বাড়িগুলো এখনও অক্ষত, নিরাপদ এখনও ইউরা আর তার দাদু মিশা গর্ডনও। এখনও রাত্রে কাঠের আগুনে তাস খেলে ওরা, আলোচনা করে এই বীভৎস যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে—কান পেতে শোনে বেটা অর্থাৎ জার্মানদের কামানের গর্জন, আর আতঙ্কে শিহরিত হয় থেকে থেকে।

জিভাগোর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অনেক পচা-গলা, বীভৎস দৃশ্য দেখছে গর্ডনও। দেখছে আহত ব্যক্তদেরও ভয়ঙ্কর স্বরূপ। "তোমাদের এখানে আসা ঠিক হয়নি

গর্ডন", ইউরা বলল। "এখানে এমন এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আমরা এসে পড়েছি যে গুলি ছুঁড়ে এই মুহূর্তেই আমাদের প্রাণ বিপন্ন হতে পারে।"

রাস্তার চারদিকে চোখ বুলিয়ে শিউরে উঠতে লাগলো গর্ডন। অসংখ্য হত আর আহত মানুষের ভীড় রাস্তার ওপর। আর্ত চীৎকারে সেখানকার আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ। একটা গাড়ি এগিয়ে এলো, ক্ষিপ্রহাতে তোলা হোল আহতদের, সংখ্যায় তারা ভয়াবহ।

আপিসের সামনে একজন লেফটেন্যান্ট ডাক্তারকে কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় বিরক্ত হয়ে গাল পাড়তে পাড়তে দূরে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। লোকটা চলে যেতেই ডাঃ ইন্টরা জিভাগো ডাক্তারের কাছে এগিয়ে এলো।

— করছেন কী? নার্সের গলার ভয়ার্ত চীৎকারে সামনের দিকে তাকালে ইউরা। স্ট্রেচারে নিয়ে যাচ্ছে একজনকে, তার চোয়ালের হাড়ে একটা বোমার টুকরো গেঁথে আছে, চোয়ালের মাংস ঝুলে পড়ে মুখটা বীভৎস আকার ধারণ করেছে। ওদের মধ্যেই একজন খালি হাত দিয়ে বোমার টুকরোটাকে উপড়ে ফেলতে চাইছে, তাই দেখেই নার্সটি আতঙ্কে চীৎকার করে উঠছে।

একটু পরেই মারা গেল লোকটা। লোকটি গিমাজেৎদিন, লেফটেন্যান্ট হলেন গালিউলিন আর নার্সটি হোল লারা। গর্ডন আর জিভাগো সাক্ষী রইলো। কোন এক সুদূর অতীতে সকলে সকলকে দেখলেও আজ আর কেউ কাউকেই চিনতে পারল না অথবা চেষ্টাও করল না।

গাড়ির জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে ছিল ইউরা আর গর্ডন। দৃষ্টি থেমে গেল বৃদ্ধ ইহুদীর প্রতি অকথ্য নির্যাতন দেখে। একটা লোক তাম্রমুদ্রা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলাচ্ছে বৃদ্ধটিকে, ওর চাবুকের আঘাত বৃদ্ধ ইহুদীটির পরিবারের সকলকে লাঞ্ছিত করছে। ওরা কাঁদছে, কিন্তু এই মরণ-খেলা থামাতে সাহস করছে না।

গলা বাড়িয়ে লোকটিকে ধমকালো ইউরা। তারপর বলল আপন মনেই, ঈশ্বর জানেন এই অত্যাচারের শেষ হবে কবে। ওর গলার বিষণ্ণতার সুর মিশে গর্ডনকেও আচ্ছন্ন করল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইউরার চোখে ভেসে উঠল একটি ঘটনার ছবি। সেদিন শীতার্ত সকাল। অফিসে অফিসে জারের আগমনের উষ্ণ বার্তা ছড়াতে লাগলো। অশেষ প্রতীক্ষার পর এলেন জার। মেডেল আর রাজকীয় পোষাকের

মধ্যেও তাঁর মুখটা কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল ইউরার। ওঁর ঠোঁটের মৃদু হাসি কেমন যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিল ইউরাকে ওঁর অস্বস্তির কথা।

তারপর ইউরা চেষ্টা করল সেই সব লেখকদের কথা ভাবতে যারা কোনো বৈচিত্র না রেখেই অনর্গল লিখে চলে। ওদের একঘেয়েমী আর পুনরুক্তিতে বিরক্ত হয় ইউরা।

ঠিক বলেছো ইউরা, বন্ধুকে সমর্থন জানায় গর্ডন। কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই ইউরা। তাতে দুঃখের বোঝাই বাড়ানো হবে। পৃথিবীতে এই পাপ আর হত্যা ছেয়ে গেছে, বিষাদ হয়ে গেছে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস।

বাইবেলে বলে, বাঁচতে হলে, মানুষ হিসাবে সম্মান পেতে হলে জাতিভেদ করলে চলবে না। আবার শুধু জাতিই নয়, মানুষের মূল্যের কথা, ব্যক্তির অহংকে সব থেকে উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। যীশু ঐ কথাই আকারে ইঙ্গিতে বলেছিলেন তাঁর অমূল্য উপদেশ বাণীর মধ্য দিয়ে।

সাধারণ মানুষ নিজেদের কল্পনার সুবিধার জন্য বড়োকেও ছোট বলে ভেবে চলে। তাদের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে তোলে। যে মহাপ্রাণ জন্মেছিলেন একদা ইহুদীদের মধ্যে সমগ্র ইউরোপের মনুষ্যত্বের পুনর্জাগরণ ঘটাতে তাঁকে চিনতে পারলো না ইহুদীরা। পারলো না বলেই আজ তাদের ওপর নেমে এসেছে যতো অভিশাপ, লাঞ্ছনা আর অবজ্ঞা। ইহুদি বুদ্ধিজীবীরা তাই পারে না তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে উদার পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণতলে এসে দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের জয়গান শোনাতে। সকলের সঙ্গে এক হয়ে মিশতে তাই তারা আজও ভীত ও কম্পিত হয়। জাতীয় সমস্যা আর জাতীয় রাষ্ট্রপ্রধানরা এধরনের আলোচনা করার শৌখিনতাতেই তাঁদের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করেন, তাঁরাও তাই এদের জাগাতে ভুলে যান, ভুলে যান নিজেদের ভেতরের অহংকে। মনুষ্যত্বের বিপর্যয়ের তলায় তাঁরা তলিয়ে যান আজ।

——পরদিন সকাল বেলায় খেতে বসেই সেই কথাটা শোনালো জিভাগো, এখানে আসার সময় যে পরিবেশটা তার নোংরা আর কদর্য বলে মনে হয়েছিল, কাল রাতে বদলির অর্ডার শুনে এখানের প্রতি ধূলিকণাকেই অতি আপন বলে মনে হচ্ছে জিভাগোর।

জিনিসপত্র গুছিয়ে যাবার জন্য ওরা যখন প্রস্তুত, তখন দিগন্তের আকাশ

ফাটিয়ে লাল গোলার বীভৎস গর্জন শোনা গেল। চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানল জার্মানরা আক্রমণ করেছে এ গ্রাম, শীঘ্রই তাদের পালাতে হবে।

নিরাপদে অপেক্ষমান গাড়িতে তুলে দিল ইউরা গভর্নকে, তারপর ছুটতে ছুটতে বাড়ীর পথ ধরলো। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ছুটে আসা গোলার টুকরো এসে বিঁধলো ইউরার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারিয়ে ছিন্ন তারের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও।

জ্ঞান ফিরলো যখন তখন ও হাসপাতালের খাটে শুয়ে। এখন ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছেই রেল লাইনের ধারের ছোট ধরণের সরকারি হাসপাতালে আছে। উল্টোদিকে আছে গালিউলিন, হাতে এক বাণ্ডিল কাগজপত্র। সেদিকে একবার তাকিয়ে হাতে ধরা চিঠিগুলোর দিকে তাকাল ইউরা, টোনিয়া লিখেছে তাকে।

• ঘরের মধ্যে ধীর পায়ে ঢুকল যে মেয়েটি, তাকে ইউরা আর গালিউলিন চেনে। কিন্তু ওদের চেনে না নার্স লারা। এগিয়ে এসে রোগীর হাত টিপে ধরে নাড়ি পরীক্ষা করল লারা। আর ঠিক সেই সময়েই ইউসুপকা জানাল ওর স্বামী পাশা আন্টিপভের কথা। অবশ্য সঠিক কথাটা ওকে জানাতে সাহস করলে না ইউসুপকা, একটা মিথ্যে কথাই বললে। "আন্টিপভ বন্দী হয়েছে শত্রুর হাতে, ওর কাগজপত্র এখন আমার হাতে।"

কিন্তু লারা পুরোপুরি বিশ্বাস করল না, আবার না শুনেও থাকতে পারল না। ওর চোখের জল আর উদ্বেগ-ব্যাকুল মনোভাব লক্ষ্য করলে ইউরা। ওর মনে পড়ে গেল ও সেই ছাত্র আর কলেজের পড়ার দিনটির কথা, যেদিন ও মেয়েটির দেখা পেয়েছিল। মনে পড়ে গেল, আনার কফিন আর টোনিয়ার চীৎকার।

রোজ রোজ রোগীদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে পায়চারী করবার সময় চিন্তা করে লারা ইউরি সম্পর্কে, ওর অদ্ভুত চরিত্র ওকে বিস্মিত করে। বিস্মিত আর স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে পাশার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। এখানে থাকার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে তাই এবার সে চলে যাবে মেয়ে কাটিয়ার কাছে। বাকি জীবনটা সন্ন্যাসিনীর মতো ওখানেই কাটিয়ে দেবে লারা। কাটিয়ার কথা স্মরণ করে চোখের জলের ধারা নামে ওর দুগাল বেয়ে। পাশাকে হারিয়ে পৃথিবীর সব কিছুই অর্থহীন বলে মনে হয় তার। কিছু ভালো লাগে না লারার। তবু সে বেঁচে আছে, আর বেঁচে

থাকার চেষ্টাও করে সে কেবল কাটিয়ার জন্য। মনে মনে একটা গভীর শান্তি অনুভব করে ও এই দুঃখের মধ্যেও।

একই সঙ্গে আনন্দ আর বিষাদের মধ্যে পড়ল ইউরা। মস্কো থেকে খবর পাঠিয়েছে গর্ডন, তার বইটা নাকি জুডোরভ—বিনা অনুমতিতিতেই বাজারে ছাপিয়েছে, বইটির লেখক নাকি অশেষ সুনামও অর্জন করেছে। এদিকে মস্কোর অবস্থা আরও ভয়াবহ আর বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। মস্কো এখন যেন বারুদের স্তূপ, যে কোন মুহূর্তেই ভয়ঙ্কর রকমের বিস্ফোরণ ঘটবে।

ঘরের কথা স্মরণ করে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ইউরা।

সংবাদদাতার কাছে তার পরিচয় জানার জন্য এগিয়ে এলো লারা। তারপর ছিটকে পড়লো পুরোনো দিনের স্মৃতিবেষ্টিত সেই বাড়ির সঙ্গে ব্রেস স্ট্রীটের সেই বিশেষ বাড়িটার স্মরণে। এই আগন্তুক লোকটিও নাকি ওখানেই বাস করতেন, কিন্তু এঁকে চেনে না লারা। ওর চোখে ভেসে উঠতে লাগলো সেই মুখ, যা তাকে এখনও আতঙ্ক ধরায়। সেদিনের সেই বাচ্চারাও এখন সকলেই তরুণ, সকলেই তারা এখানে।

ওর চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল। চকিতে দেখল, অসংখ্য আহত রোগীরা বেরিয়ে আসছে, সকলে সমবেত হয়ে আতঙ্কভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করছে, পিটাসবার্গে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। ওখানকার সেনাবাহিনীও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদায় অতীত

হাসপাতাল স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরাও চলে এলেন মেলিউজে-ইয়েভো নামের ছোট্ট শহরে।

এখানে হাজার রকম কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হয় ওদের, তবুও কাজ শেষ করতে পারে না ওরা। এক জায়গায় কাজ শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ে ওদের অন্য জায়গার কাজ সামলানোর জন্য।

আস্তে আস্তে মাঝখানের দূরত্বটাও কমে যেতে থাকে ওদের মধ্যে বিশেষতঃ ইউরা আর লারার মধ্যে।

•

এখানেই এক চিঠিতে জানায় টোনিয়াকে লারার কথা, তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের জীবনে সেই ছোট্ট পার্টির কথা যেখানে একটা মেয়ে গুলি ছুঁড়েছিল। সব শেষে লেখে, যদিও ব্যাপারটা খুব সুবিধের ব্যাপার নয় তবুও সে চেষ্টা করছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে।

পরবর্তী চিঠিতে টোনিয়ার অভিমানভরা উত্তর ইউরাকে তাড়াতাড়ি চিঠি পাঠাতে বাধ্য করলো। ইউরা জানালো, টোনিয়ার আশঙ্কা নিতান্তই ছেলেমানুষী ধরণের। যা হোক, সে ক্ষমা চেয়ে নিলো টোনিয়ার এরকম একটা ধারণার কথা মনে করে, তারপর তাকে নিশ্চিন্ত হবার জন্য যা যা বলার দরকার তাই লিখলো।

মেলিউজেইয়েভো শহরের মধ্য দিয়ে দুটো রাস্তা চলে গেছে—একটা গেছে বহুখ্যাত উর্বরা জমি জাবুলিনের দিকে সেখানে স্থানীয় ময়দা কলের ব্ল্যাজেইকো প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু মাত্র পনের মধ্যেই তার আয়ু শেষ হলো। পলাতক সৈন্যদল ফিরে এলো বিরিউটিতে, সেখানে কাঠের স্তূপ আর পুরোন গাছের গুড়ির পাশে সমুদ্রের সঙ্গে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে বাধ্য হোল।

কাউন্টেসের বিরাট প্রশস্ত বাড়িটায় হাসপাতাল তুলে আনা হোল। সুস্থ হয়ে ইউরাই এখানকার প্রধান ডাক্তার হিসাবে নির্বাচিত হলেন। বাড়ির মালিক

পিটাসবার্গে বন্দী, অবশ্য বাড়িটা সম্পূর্ণ খালি ছিল না। বিস্তর দাসদাসীর মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, একজন প্রধান রাঁধুনী আর অন্যজন মেয়েদের মানুষ করেছেন, সেই সাদা ফুলওয়ালা, ঢিলে ছেঁড়া পোষাকপরা বুড়ী মাদমোইসেল ফ্র্যারি।

এই হুজুগ-আমুদে ভদ্রমহিলার ধারণায় বিরক্ত হতেন ইউরা, অবাক হোত লারা - কিন্তু নিজের ধারণা কিছুতেই পাল্টাতে চাইতেন না তিনি। উইস্টিরিয়ার হৃষ্টপুষ্ট চেহারাটি রীতিমত কৌতুককর। অসংখ্য তুকতাক জানত সে, কারণে-অকারণে তর্ক করে ঘর ভরিয়ে তুলতেও ও'দ। পার্কে সান্ধ্য মিটিং-র একজন প্রধান বক্তা সে এখন, বিপ্লবী পরিষদের বিষয়ে চোখা চোখা বক্তৃতা যখন শুরু করে সে তখন ঘরে থেকেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে ফ্র্যারি, সকলকে অনুরোধ করে সে বক্তৃতা শুনতে। ওদের দুজনের ভাব যেমন, তেমনি ঝগড়ার অন্ত ছিল না।

সেদিন মেয়রের অফিসে যেতে হয়েছিল ইউরাকে, চাকরি ছেড়ে চলে যাবার আগে দরকারী কাগজপত্রে সই করার জন্য। ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়র ইউরাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু একটু অন্যমনস্কভাবে ফিরে বসা ছাড়া ওর আচার ব্যবহারে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। ছেলেমানুষের মতো তিনি সারা ঘর ছুটোছুটি করছিলেন আর ঘরের মধ্যে বসে থাকা তোষামোদকারীদের বোঝাচ্ছিলেন বিরিউটির পলাতক সৈন্যদের সমস্যার কথা।

ভীষণ অস্বস্তি বোধ করা সত্ত্বেও উঠতে সাহস হোল না ইউরার। অথচ ঘরের মধ্যে বসে থেকে এই ভণ্ডামী আর এই প্রগলভতা সহ্য করাও তার মতো লোকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল ইউরার। দ্রুতপায়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর লারার সঙ্গে দেখা করার কথা মনে রেখে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

ফ্র্যারির কৌতুহল মাখা দৃষ্টির সামনে দিয়ে লারার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ইউরি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় উঠে গেল ও, তারপর লণ্ঠনের আলোর রহস্যময় প্যাসেজ পেরিয়ে পরিত্যক্ত আসবাবের গুদোম ঘর ছাড়িয়ে অবশেষে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু এতো রাত্রে ব্যস্ত লারাকে ডাকাটা ঠিক উচিত হবে না মনে করে নিজেকে সংযত করে নিলে তারপর অন্যমনস্ক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

জানালা দিয়ে পাটকেলে রঙের সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছিল, বাতাসে মিশে আছে

ফুলের সুগন্ধ—মাঝে মাঝে বেড়ার ওধার থেকে কোন মাতাল সৈন্যের অসংলগ্ন কথাবার্তার রেশ ভেসে আসছে। বাঁধ ভাঙা একটা অনুভূতির হাত থেকে বাঁচতে পার্কের দিকে ছুটে চলে গেল ইউরা।

পার্কের বেঞ্চিতে বসেছিল অনেকক্ষণ ইউরা। ওর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ল চাঁদের আয়োজন, ধরা পড়ল অদূরে বেঞ্চির ওপর বসে থাকা উত্তেজিত জনতার জটলা। যে লোকটি ওখানে উচ্চৈস্বরে বক্তৃতা দিচ্ছে তাকে ভালোভাবেই চেনে ইউরা। কমিসার গিন্সভন বক্তৃতা করছিলেন, তাঁর বক্তব্য বিষয় হোল বলশেভিকরাই হোল মাচুলিনের বিশৃঙ্খলার হোতা। আবেগের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি, মাঝে মাঝে তিরস্কার করছেন তিনি মেলিউজেইয়েভোবাসীদের, তাদের বিশৃঙ্খলার জন্য।

হঠাৎ গোলমাল শুরু হোল। সেই গোলমালের ভেতর থেকে একজন মহিলা ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠে এলো, আস্তে আস্তে জনতা শান্ত হয়ে গেল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল ইউরা, এই মহিলা হলেন উস্টিনিয়া। তিনি উঠেই গিন্সভনের বিপক্ষে বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। তখনও যুক্তি দেখিয়ে একটার পর একটা বাধা ভেঙে তে লাগলেন।

শেষবার যখন গোলমাল শুরু হোল তখন পার্ক থেকে উঠে এলো ইউরা, তারপর বাড়ি ঢুকে নিঃশব্দে বিছানায় এলিয়ে দিলো নিজেকে।

পরদিন যখন ইউরা লারার ঘরে ঢুকল তখন লারা একরাশ জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে ব্যস্ত। কাঠ কয়লার ওপর পালাক্রমে দুটো ইস্ত্রি বসিয়ে রাখছে বারবার, আর ক্ষিপ্রহস্তে একটার পর একটা পোশাক সুন্দর করে ভাঁজ করে ইস্ত্রি করছে। সেইরকম অবস্থাতেই ইউরাকে বলল, কাল রাতে আপনি আমার ঘরে টোকা না দিয়ে ভালোই করেছেন কেননা আমি তখন শুয়ে পড়েছি। আমি চলে যাব বলে সব ঠিক করেছি, তাই যাবার আগে সব জামাকাপড়গুলো ইস্ত্রি করে গুছিয়ে নিচ্ছি। আমি চলে যাবো উরালে—কেননা, এখন নিশ্চয়ই আর আপনি আমায় খ্যাপাতে পারবেন না। হাসল লারা।

তারপর ওরা অনেকক্ষণ কথা বলে চললো, সেই ফাঁকে একটা ব্লাউজ পুড়ে গেল লারার। কিন্তু তাতে আলোচনাটা বন্ধ হোল না। লারা জানাল, কোন

এক বন্ধুর জন্য তার রূপোর চায়ের সেট আর কাটা কাচের গ্লাশগুলো নিয়ে গেছে। ইউরা জানাল, সে ব্যক্তিটি হলেন কোলিয়া যিনি গালিউলিনের সঙ্গে তর্ক করেন অকারণে, ছেলেমানুষী দৃষ্টি নিয়ে দেখেন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো।

কথা বলতে বলতে লারা অন্য প্রসঙ্গে এসে গেল। বলল, যাবার আগে সমস্ত কিছুর হিসাব মিশিয়ে দিতে চাই আমি। তার জন্য অনেক মিথ্যা অপবাদ দেবারও চেষ্টা করছে অনেকে। বিরক্তিভরা কণ্ঠে ওকে থামিয়ে দিল ইউরা। যেন কৃত্রিমভাবাপন্ন অবস্থা জীবনে মনে হ'ল, জীবনকে যেন কিছু সময়ের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যাবে। ক্ষুব্ধ জীবন সম্পর্কে এমন একটা লম্বা বক্তৃতা দিতে লাগল ইউরা যে আবেগে আর উত্তেজনায় তার গলার স্বর কাঁপতে লাগল। গম্ভীর বিস্মিত দুচোখ তুলে তার দিকে তাকাল লারা আর তাতেই থতমত খেল ইউরা। একটু কাল থেমে ওর অন্তরের জটিল রহস্য ও অস্পষ্ট চিন্তাগুলো ক্রমশঃ ব্যক্ত করতে লাগল।

শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল লারা। তারপর বাইরের দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ইউরা'কে নরম গলায় জানাল, "এই ভয়ই আমি করছিলাম। কিন্তু ইউরি আন্দ্রেইয়েভিচ, আমি চাই আমি আপনাকে যেমন ভাবে জানি ঠিক যেমন ভাবেই দেখতে। আমার কথা শুনে আপনি নিজেকে সংযত করুন বা শান্ত হোন। এমন ভাবে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার মৃত্যু ঘটাতে দেবেন না। আমি জানি আপনি চেষ্টা করলে তা পারবেন।"

সাতদিন বাদে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে লারা চলে গেল অনেক দূর।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল মাদামে জায়েল ফ্ল্যারের। চাপা বিরক্তিতে ফুঁসে উঠলেন তিনি। এই ঝড়জলের রাতে একা নীচে নেমে দরজা খুলতে যেতে তিনি সাহস পেলেন না অথচ এতবড়ো হাসপাতালে তার মতো একজন বৃদ্ধার ওপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সকলের নিশ্চিন্ততা আর ঘুমের কথা স্মরণ করে জেদ করে শুয়ে রইলেন তিনি।

— একবার তাঁর মনে হোল জিভাগো তো উঠে খুলে আসতে পারে দরজাটা তারপর মনে হোল বেচারীর মন ভালো নেই হয়তো সেইজন্যই সে শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু গালিউলিন কি করছে?

ওঃ ভগবান, বাইরের ঝড়জলের তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যরির স্মৃতিও বুঝি ধ্বংস প্রায়। তা না হলে সে কেমন করে ভুলে গেল, মাত্র কিছুদিন আগে সে

আর জিভাগো। গালিউলিনকে নিজের হাতে পোষাক পরিয়ে পালাতে সাহায্য করেছে। কনিসায় গিন্‌ৎজেকে খুন করার জন্যই ওকে সৈন্যদল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দরজাটায় ধাক্কা একবার কানে গেছিল কিন্তু এবার এত জোর বৃষ্টি সুরু হোল যে নীচে নামতে বাধ্য হলেন ফ্র্যুরি। অবশ্য তার চেচাঁমেচিতে ঘুম ভেঙে মোমবাতি জেলে এগিয়ে এলেন স্বয়ং জিভাগো। সাহসভরে দরজার ছিটকিনি খুললেন, দমকা বাতাসের ঠাণ্ডা বাতাসে নিভে গেল মোমবাতিটা।

সেই উন্মাদ প্রকৃতির সামনে দাড়িয়ে গলা উঁচু করে চীৎকার করলেন জিভাগো। —কে ওখানে? কেউ কি দাঁড়িয়ে আছ? কিন্তু সে সজোরে বাইরের দরজায় ধাক্কা শুরু হোল মাদমোজায়েল গিয়ে দেখে এল, বলল, কেউ নেই, বোধহয় বাতাসে শব্দ করছে। তার ওপর ভাঙা খড়খড়ি বাতাসের দাপটে কখনও ধাক্কা দিচ্ছে তাতে এ-ধরনের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে—দরজায় বুঝি কেউ ডাকছে।

দরজা বন্ধ করে দুজনেই বিষণ্ণ মুখে ওপরে উঠে গেল। যে যার ঘরে ঢোকার আগেও পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিল যদি তাদের অনুমান সত্যি হয়, লারাই এসে হাজির হয়, তাহলে ওর মুখ থেকে ওর অভিযানের কথা শুনতে ওরা এখুনি বসে পড়বে।

কিন্তু তা হোল না। কেউ এলো না, শুধু বাতাস শব্দ করে ফিরতে লাগল ওদের চারপাশে ঘিরে।

সামনের দিকে পাগলের মতো ছুটছে গিন্‌ৎজে। ওর এই উন্মাদকর আচরণ আর বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্যে দায়ী কোলিয়া।

কোলিয়া ফ্রেলেঙ্কো, বিরিউচি স্টেশনের তারবাবু। সদা কর্মব্যস্ত এই লোকটি টেলিফোন, টেলিগ্রাম এমনকি কখনো কখনো রেল সিগনালের দায়িত্ব কাঁধে নিত। ওর এড়িয়ে যাওয়া স্বভাবের জন্য গালিউলিনের সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছিল, নিজের অজান্তেই ব্যাপারটাকে তালগোল পাকিয়ে ভয়ঙ্কর রকমের জটিল করে তুলেছিল ও।

সেদিন গালিউলিনের কথামতই গিন্‌ৎজে স্টেশনের বাইরে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে চাইলো না কোলিয়া অকারণেই আর তারপর যখন পল্টনরা এসে পৌছল তখন সে তার বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলো স্পষ্ট এবং প্রবলভাবে।

এখানেই তাদের ঘিরে ফেলা হোল, তারা যুদ্ধ পরিত্যাগীদের শিবিরে যাচ্ছে।

ওদের সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে লাগল গিন্‌ৎজে। কিন্তু তার এই ধরণের উচ্চ আদর্শে ভরা মতবাদ সাধারণ জনসাধারণকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। ওর ওপর যখন তিনি শ্রোতাদের নির্বোধ মূর্খ বলে গালাগালি দিতে শুরু করলেন তখন উত্তেজিত জনতা তাঁকে তাড় করতে শুরু করলো।

তাড়াতাড়ি তাঁকে পালাবার সুযোগ করে দিলেন কসাচ তাকিসায়। কিন্তু স্টেশনের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই আহত পৌরুষ নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। ভাবলেন একবার জনতাকে বুঝিয়ে বলবেন তাঁর উদ্দেশ্যের কথা কিন্তু জনতা যখন খুব কাছে এগিয়ে এলো তখন তিনি ছুটে পালাতে গেলেন। পড়লেন একটা জলের জালার মধ্যে, একটা পা ভেতর ঢুকে গেল আর একটা বিকটভাবে বাইরে ঝুলতে লাগল।

বিস্মিত জনতা একটু থমকে দাঁড়ালো তার এই অচিন্তনীয় পরিণাম দর্শনে, তারপর তাঁদের একজনের বন্দুকের নল থেকে তীব্র আগুনের ফুলকি ছুটে এলো। গলায় বুলেট লেগে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন গিন্‌ৎজে। অন্যান্যরা ছুটে এসে সেই মৃতদেহের সর্বাঙ্গেই ভারী বর্শাটা বিঁধিয়ে দিলো।

মাদমোয়াজেল কোলিয়াকে গোপন কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে ডাঃ জিভাগোর জন্য মস্কোর ট্রেনে একটা ভালো আসন ঠিক করে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন জিভাগো।

একটা আসন্ন ঝড়-জল মাথায় করেই বাড়ি থেকে বার হোল ইউরা। যেতে-যেতেই ও দেখল মাঠের ওপর ছেলেমেয়েদের উড়ন্ত রুকগুলো, ওদের মায়েদের কোলে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে থাকা শিশুগুলির মুখ। আর তার চারপাশেই নিপুণ আর সুদক্ষ হাতে কিশোরেরা ভেড়ার দল চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

স্টেশন ঢুকতে যাবার পথে বাধা পেল ইউরা। সারি সারি লোক প্ল্যাটফর্মের ওপর, সিঁড়ির চাতালে শুয়ে আছে। ওদের দিকে একবার বিরক্তিভরা চোখে তাকালেন স্টেশনমাষ্টার—তারপর জানালেন, এই ট্রেনে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় ডাক্তার, এর পরের ট্রেনে যাবেন আপনি, কেমন?

তাই হোল। মুখিসিটিতে গাড়ি বদল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গাড়িতে উঠলেন ইউরা।

অনেক সৌভাগ্যের অধিকারী ছিল ইউরা, তাই এই ভিড় ঠেলাঠেলির ভেতর দিয়েও কোনরকমে শরীরটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল ও কামরার ভেতর।

যতক্ষণ সুখিনিটিতে না পৌঁছল ততক্ষণ ভীড়ের গাদাগাদিতে ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছিল ইউরা।

লোকজনের চিৎকার ইউরার কাছে মনে হোল যেন সামনের কোন বিক্ষুব্ধ ঢেউ। মাঝে মাঝে আসছে তারপরই আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

জানালা দিয়ে কি একটা ফুলের গন্ধ ভেসে এলো ইউরার নাকে। এগিয়ে যেতে বাধা পেল, ওখান থেকেই ও কল্পনায় দেখে নিল, সেই সুবাসিত ফুলের গুচ্ছ গুচ্ছ স্তবক যারা গাড়ির মাথার ওপর দিয়ে বেড়ে উঠেছে। প্রাণভরে আঘ্রাণ নিলে সে।

গার্ডের অনুমতি নিয়ে যখন শান্ত হয়ে বসলো ইউরা তার ট্রেনের কামরার ভেতর, তখন চোখে পড়ল তার পাশের সোফাটায় শুয়ে ছিল আর একজন দীর্ঘকায় তরুণ, যার ঝোলানো বন্দুকের খাপ, কার্তুজের বেল্ট আর পেট মোটা থলিটা প্রমাণ করে সে একজন শিকারী।

অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে বকবক করতে চেয়েছিল যুবকটি কিন্তু তাকে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে ওপরের বাঙ্কে শুয়ে পড়ল ইউরা। তারপর যুবকটির কথামত কামরায় জ্বলা একমাত্র মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতেই অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল কামরাটায়।

একটু পরেই ইউরা জানালাটা বন্ধ করার প্রস্তাব করলো। কিন্তু পরপর দুবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও যখন কোন উত্তর পেল না, তখন একটু নীচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করল সঙ্গীটি কোথায় গেছে। কিন্তু সঙ্গীটি সেখানেই ছিল। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দিলও না তার কোন অসুবিধা হবে কি-না।

লোকটার চরিত্রের কথা ভেবে রীতিমত বিস্মিত হোল ইউরা।

অন্ধকারের জন্য ঘুমিয়ে থাকা চিন্তাগুলো ওকে একযোগে এসে আক্রমণ করলে। এই দ্বিধা বিভক্ত চিন্তাগুলোর একদিকে বাস করছে ওর হৃদয়ের সেই উষ্ণ পরিবেশের কথা, মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে—অন্যদিকে এক বিক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এক নারী। সে চিরবঞ্চিত হতাশা-দীপ্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থার চাপে পড়ে রিক্তা, ক্লান্তা। বস্তুতঃ ইউরার চোখে লারা অসাধারণা, সে টোনিয়া আর তার দেখা পরিচিত জগৎ থেকে অনেক অনেক আলাদা।

অসহ্য চিন্তার নিপীড়নে ওর মাথাটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো, চোখের পাতা থেকে ঘুম উধাও হোল দূরে। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে লাগল ইউরা।

পরদিন একটা জোর চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলেন পোষা কুকুরটাকে তাবছে তার সঙ্গীটি। ট্রেন এখন যেখানে এসে থেমেছে জায়গাটা ইউরার অতি পরিচিত এলাকা।

লোকটার চরিত্রটি ছিল অদ্ভুত রকমের। ওর চঞ্চল মনোভাব আর অনর্গল কথা বলার ধরণ ভস্তয়ভস্কির আঁকত চরিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয় ইউরাকে। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে বসেই ওর কাছ থেকে অনেক খবর জানা হয়ে গেল। পগরেভশিচ ওর নাম, অবশ্য নামটি ওর বিপ্লবী কাকার নামের গৌরব স্মরণ করেই রাখা। ওর মা বাবা পুরোনো সেকেলে ধরণের এইজন্য ওদের সঙ্গে ওর কাকার মতের মিল হয় না।

সে ভালো শিকার করতে জানে—এই প্রসঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলে যুবকটি। আর তারপর পকেট থেকে তার নজের নামের কার্ড একখানা বার করে ইউরার হাতে দিলে সেটির ওপর চোখ বুলিয়ে ইউরা বিস্মিত হোল রীতিমত।

এর পরের কথাগুলোয় রীতিমত বিরক্তি বোধ করতে লাগলো ইউরা। উঠে চলে গেলো ও।

দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। চলার পথে প্রকৃতির দৃশ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ নামিয়ে রাখতে পারছে না। ট্রেনের জানালা দিয়ে দুচোখ ভরে যেন গোগ্রাসে গিলছে ইউরা—ট্রেনটা ঘন বন ছাড়িয়ে দুপাশের আলুর ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলেছে, তার পেছন দিকটা আকাশের শেষ সীমান্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

সহসা প্রখর সূর্যের আলোয় চকচক করে উঠল যেন কি একটা। তারপর তার ঘনত্ব যেন বৃদ্ধি পেল, ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন নামল বাঁধ-ভাঙা বৃষ্টি।

সেই রুপোলি ঝিকিমিকি পর্দা সরিয়ে সামনের দিকে. চোখ চেয়ে দেখতে লাগল ইউরা। পর্দার ওপাশে পাহাড়ের পাশ থেকে গীর্জার প্রান্তদেশ দেখা গেল

একবার—তারপরই গম্বুজ, চিমনি, ছাদ আর আহারের নানা আকারের বাড়িঘর চকিতে দেখা দিয়েই দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে লাগল।

এই শহরটা চেনা ইউরার, এর নাম মস্কো। তাড়াতাড়ি কামরায় ফিরে এসে ও নামবার জন্য প্রস্তুত হোল।

ফিরে যাবার সময় তার নিয়ে আসা জিনিসপত্রের সঙ্গে আর একটা জিনিস বার করলো।

নামবার সময় জোর করে ভরে দিল পগরেভশিচ, তার স্মৃতিকে স্মরণ করার জন্য একটা হাঁস উপহার দিয়ে। স্টেশনে গাড়ি থামতেই জিনিসগুলো নামাতে ব্যস্ত হোল ইউরা। তাকে সাহায্য করলে মূক বীরত্বে পগরেভশিচ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মস্কোতে রাত্রিবাস

স্মলেনস্কি স্কোয়ারের ভিড় ঠেলে যখন তাদের গাড়ি এগিয়ে চলল তখন সূর্যের আলোর শেষ বিন্দুটাও মুছে গেছে আকাশের পট থেকে।

বিরাট বাজার, প্রচুর হট্টগোল আর ধুলোর ঝাপটা খেয়ে যখন ইউরার বাড়ীর দরজায় এসে গাড়িটা থামল তখন দ্রুতপায়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকল ইউরা। উত্তেজনায় তখন ওর হাত পা কাঁপছে। দরজায় কলিংবেলটা খুব জোরে বাজাল ইউরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা খুলে গেল। একটুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দুজনেই। তারপর দীর্ঘ আলিঙ্গনে দুজনে দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর নানা প্রশ্নের ঝড় বইয়ে দিলো দুজনে।

এদিকে কয়েকজন কৌতুহলী জনতা ভিড় লাগিয়ে দিয়েছে দরজায়, ওরা যেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝছে না। ওদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলো মার্কেল তারপর অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। আর একবার নিবিড় আলিঙ্গন আর উচ্চ অভ্যর্থনার ঝড় বয়ে গেল।

ও চলে যেতেই হাত মুখ ধোবার জন্ম ইউরা প্রস্তুত হোল। বাড়ীর পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে টোনিয়া বলল, এ বাড়ীর একতলার কিছু অংশ কৃষি চালককে ভাড়া দিয়েছি। শুনে খুশী হোল ইউরা। ওর মনে পড়ে গেল এতদিন যে হাসপাতালে ও কাজ করে এসেছে সেটাও কারও বসত-বাড়ীরই একটা অংশ। আবাসের এই বাড়তি উপকরণটা অপরের জন্ম ছেড়ে দেওয়ার উদারতার আনন্দ ও'ক পেয়ে বসল।

হাতের পুঁটুলিতে বাঁধা হাঁসটিকে দেখে বিস্মিত হোল টোনিয়া। তারপর ওটাকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলো যথাযোগ্য ব্যবস্থার জন্ম। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই অবিশ্বাস্য রকমের আনন্দজনক খবরটা পেশ করল টোনিয়া। প্রথমটা ইউরা নিজের কানকেই বিশ্বাস করলে না পরে কোলিয়া মামা অর্থাৎ নিকোলা নিকোলেভিচকে দেখবার জন্ম অস্থির হয়ে উঠল।

কিন্তু টোনিয়া বললে, উনি কেমন যেন পাল্টে গেছেন। পরশু দিন তিনি এখা ন আসবেন বলে কথা দিয়ে গেছেন।

এরপর ওদের সংসারের কথা পাড়লে টোনিয়া। সংক্ষেপে হ্যাঁ, হুঁ জানাতে লাগাল ইউরা কিন্তু ওর মন পড়ে রইল কখন কোলিয়া মামার সঙ্গে তার দেখা হবে। সে টোনিয়ার কাছে প্রস্তাব করলে খুব শীঘ্রই একটা পার্টি দিতে হবে কোলিয়া মামার নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে আর আজকের আনিত হৃষ্টপুষ্ট হাঁসটা সেদিন কাটা হবে, কেমন ?

সানন্দে রাজী হোল টোনিয়া ইউরার প্রস্তাবে। তারপর ইউরা চলে গেল বাথরুমে আর টোনিয়া গেল শাসাকে আনতে।

মস্কো ছেড়ে চলে যাবার আগেই একবার ছেলেকে দেখতে গেছিল ইউরা। হিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাচ্চাদের আকুল করুণ কান্না ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল ইউরা। তার মধ্য থেকেই সে কি করে গলার স্বর শুনেই চিনে ফেলেছিল তার পুত্রটিকে। আদর করে ছেলের নাম দিয়েছিল সে শাসা, ভালো নাম আলেকজাণ্ডার।

তারপর মাত্র আর একবার ছবিতে সে দেখেছে ছেলেকে, মাত্র এক বছরের শিশু তখন।

ভাবতে ভাবতে ওপরে ওঠে এল ইউরা, জানালার ধার ঘেঁষে ওঠা রূপোলি চাঁদ দেখে মনে পড়ে গেলো তার বাল্যকালের হারিয়ে যাওয়া কতো স্মৃতির কথা।

ছেলের সামনে দাঁড়াল ও। চমকে তাকিয়ে দেখল তার ছেলের মুখের আদল হুবহু তারই মায়ের মতো। টোনিয়ার শত অনুরোধেও শিশুটা যেতে চাইলো না ইউরার কাছে। অবশেষে ইউরাই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পরদিন থেকে ইউরার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চারপাশের জগৎ তার থেকে অনেক বেশী পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের জগতের মধ্যে তাই একা একাই ডুব দিলে ইউরা।

পার্টিতেও এই বিমর্ষ ভাবটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। বাইরের মস্কোর সঙ্গে তাল রেখে ভেতরের পার্টিটাও কেমন যেন শান্ত আর খেলো ধরণের বলে মনে হতে লাগল ইউরার।

গর্ডন তার স্বভাব বিরুদ্ধ রসিকতা করে পার্টিটাকে জমকালো করে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। সে শোনালো ষ্টেশনে আকস্মিক সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে নিকি জুভোরভের প্রেমে পড়ে যাওয়ার মজার গল্প। সকলে বলে নাকি নিকি ছোট মেয়েটি প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল, বিবাহের প্রস্তাবও নাকি সে করেছিল কিন্তু —ওর কথা মাঝপথেই থেমে যেতে বাধ্য হোল কেননা ততোক্ষণে নিকি জুভো-রভ চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের উষ্ণ অভ্যর্থনা ঝরে পড়লো তার উদ্দেশ্যে।

ইউরা লক্ষ্য করলে, যুদ্ধ ওর মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পূর্বে বালক অবস্থায় যাকে সে দেখেছিল একজন অস্থির, খেয়ালী আর ভীতু স্বভাবের এখন সে ধীর স্থির রীতিমত একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ। ওর সঙ্গে ইউরার কবিতা নিয়েও অনেকক্ষণ আলোচনা হোল। এলেন শুরা শ্লেজিঙ্গের, তার আগমনে চীৎকার চেঁচামেচি দারুণ বেড়ে গেল।

কিন্তু ইউরার সব আনন্দ ছাপিয়ে গেলো কোলিয়া মামা, তার শিক্ষাগুরুর আগমনে। তিনি যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়, মনের গভীর আর গোপন কথাগুলো যেন ইউরাকে কষ্ট করে তাকে বোঝাতে হয় না। তিনি আপনিই বুঝে নেন। প্রথমে দীর্ঘ অসাক্ষাতের বেদনা আর ব্যাকুলতার অবসান কাটাতে দুজনকেই অনেক চোখের জল আর পরস্পরের বাহুপাশে ধরা দিতে হোল।

তারপর আবেগের প্রথম সোপান পেরিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসল, গম্ভীর গোপন আলোচনায়। সঙ্কোচভরা আত্মীয়তার ব্যবধান ঘুচে গিয়ে দুজনেই দুজনের হৃদয়কে অপকটে উন্মুক্ত করে দিলেন। পরস্পর পরস্পরের এতো কাছে এসে গেছিলেন সেদিন যে দুজনেই চঞ্চল আর অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, আবেগে তির-তির করে কাঁপছিলেন দুজনেই।

আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচের সঙ্গে নিকোলের কথা হয় অনেকক্ষণ। যদিও এই আলোচনার মধ্যেকার বেশীর ভাগ অংশটাই হোল তর্কের, উত্তেজনার, তাহলেও এসব শুনতে ভালো লাগে ইউরার। ভালো লাগে আলেকজাণ্ডারের বিশিষ্ট উচ্চারণ ভঙ্গিমাটি। ওর ছাঁটা গোঁফ জোড়া আর নীচের ঠোঁট দুটি ওর শিশুর মতো সরল আর অভিমানী প্রকৃতিরই ইঙ্গিত দেয়।

সেদিন অনেক রাত্রে এসেছিলেন শুরা শ্লেজিঙ্গের। অন্য আর একটি পার্টি থেকে সোজা এখানে এসেছেন। এসেই তিনি হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন তারপর

একের পর এক অভিযোগ ছুঁড়তে শুরু করে দিলেন। অনর্গল তিনি কথা বলে চললেন, আর সেই ফাঁকেই সকলের কুশল জেনে নিচ্ছিলেন।

অবশেষে ভিড় ঠেলে দ্রুত পায়ে তিনি ইউরার কাছে চলে এলেন তারপর তার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে চিরাচরিত বাজখাঁই স্বরে কানে তালা লাগিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন, ইউরা আমার সঙ্গে চলে এসো। আমি জানি জনসাধারণের সম্বন্ধে একটা উদগ্র কৌতূহল আছে তোমার, আমি তোমার সেই কৌতূহল মোটাতে সাহায্য করব, ইত্যাদি। কানে তালা লেগে যাচ্ছিল ইউরার। পালাবার জন্য সে প্রস্তুত হোল, কিন্তু নিজের অজান্তেই সে টেবিলের কোণায় চলে এলো তারপর একটা অবিশ্বাস্য রকমের ছোটোখাটো বক্তৃতা শুরু করে দিলো।
—'আপনারা দয়া করে চুপ করুন, আমায় বলতে দিন। আমি আপনাদের আজ যে কথা বলতে চাই তা অতি জরুরী এবং অতি প্রয়োজনীয়।

'আমার সঙ্গে সঙ্গে আজ আপনাদেরও অন্তরে যে ধারণা গভীরভাবে দানা বেঁধে উঠছে তা হোল যুদ্ধের শেষ হবার পরও কোন বিপ্লব দেখা দেবে কিনা. আমার মনে হয় তা যদি দেখা দেয় তাহলে আমরা যুদ্ধের মতোই ভয়াবহ আর একটা কিছু সৃষ্টি করবো, যাতে আমাদের মানবতা আমাদের বিবেক আমাদের যশ বিত্ত সব কিছু পদে পদে হবে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত। সমস্ত রাশিয়া তাহলে তার গভীর উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বিপর্যয়ের গভীরে তলিয়ে যাবে।

'কিন্তু যেদিন রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম প্রজাতন্ত্র দেশ বলে ইতিহাসে মর্য্যাদা পাবে সেদিন আকাশের স্বর্গ নেমে আসবে পৃথিবীতে।' এক অব্যক্ত যন্ত্রণাময় মানসিকতা ইউরাকে সর্বক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছিল। ও যে কি বলছিল এ মুহূর্তে ও নিজেই তা বুঝছিল না।

অতিথিরা চলে যাবার আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিল ঘরের জানালাগুলো। সেখান থেকেই আসন্ন ঝড় আর বৃষ্টির পদধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

অতিথিরা রাস্তায় এসে নামল। ওদের উচ্ছ্বসিত গলার আওয়াজ ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিল ইউরা। ধীরে ধীরে ওদের গলার আওয়াজ যখন ক্রমশই আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল তখন ইউরাও শুতে চলে গেল।

এক ছিমেল সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় জানালার ধারে বসে বসে একটা প্রবন্ধ রচনায় সবে মনোনিবেশ করছিল ইউরা। কিছুটা লিখেছে—বাইরের এই স্তব্ধ

রিক্ত উদাস ভরা শান্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু দার্শনিক তত্ত্ব—এমন সময় ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটল।

ইউরা চেনে এই স্থূলকায় ভদ্রলোকটিকে। ইনি কেমিস্ট্রির ডেমনস্টেটর। ওর মুখ থেকেই শুনলো ইউরা মেপল পাতাগুলোর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার কথা। তবুও এখন অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে চাইছে না ইউরা। ভদ্রলোক বার দুই নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ওকে জ্বালাতন করলেন, তারপর জানালার ধারে চলে এলেন। এতো কম আলোয় কাজ করলে আপনার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে, দূর থেকে ভদ্রলোক ইউরাকে সতর্ক করে দিলেন।

সে কথা এড়িয়ে গিয়ে ইউরা জানাল, প্রায় আধ ঘণ্টার মতো কাজ এখনও করতে হবে যে তাকে।

তখনই ও শুনতে পেলো টারাশিউকের নাম, দ্রুত গলায় জানিয়ে দিলে ওর জীবন কাহিনী। ইউরার ব্যগ্রতা লক্ষ্য করে ভদ্রলোক জানাল, টারাশিউকের প্রতিভা হোল সেই ধরণের, যা দেখে তাতেই সে অল্প সময়েই দক্ষতা অর্জন করে। ওর কেমন যেন ধারণা হোল বন্দুক ধরার মধ্যে এক ধরণের শক্তি আর সম্মান আছে। ব্যস! অমনি ধরলে বন্দুক হাতে, উঁচিয়ে ধরলো ওর নল মালিকদের দিকে। এ ভাবেই যুদ্ধে যোগ দেবার একটা নেশা ধরে যায় ওর।

আপনার স্টোভটাও এমন বিশ্রী রকমের ধোঁয়া উদগীরণ করত না, শুধু যদি টারাশিউক থাকত। সত্যিই, ভারী চমৎকার ছেলেটি, বলতে বলতে আবেগে গলা বুঁজে এলো ভদ্রলোকের। একটু পরে ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জ্বালানি কাঠ আছে?

ইউরার ঘাড় নাড়া লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, ইঁদুর ধরা বুড়ি আর ওই গির্জের দারোয়ানটার জন্যই আমাদের এখন এই শাস্তিভোগ করতে হয়েছে। ওদের জন্যই এই শহরটার রাস্তাঘাট আমার কেমন যেন মঝে মাঝে অপরিচিত লাগে। অবশ্য ওরা বেড়া চুরি না করলেও এ শহরের আশে পাশের জঙ্গল আর নোংরা জলজমা এলাকা এটাকে শহর বলে মনে করিয়ে দিয়ে বিদ্রূপ করে।

খুব সাবধানে পা ফেলছিলেন ইউরা। রাস্তার নোংরাগুলোর হাত থেকে পোষাককে বাঁচতে বাঁচাতে ধীর পায়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

রূপোলি পথের রহস্যময় কয়েকটা ঘটনা ইউরার স্বচক্ষে দেখা। একদিন এই পথ দিয়েই হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়েছিল একজন রাজনৈতিক নেতাকে, দুর্বৃত্তের দল টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলে রেখে গেছে রাস্তায়। সেদিন ইউরাই ওকে বাঁচায় স্থানীয় পুলিশকে ফোন করে, ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে ভর্তি করে।

এই উপকারের ঋণ শোধ করেছিলেন ভদ্রলোক। পরবর্তী অনেক আজগুবী কারণে শত্রুপক্ষের নানা গুজব রটনার ফলে বহু বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল ইউরাকে, বহুবারই এই ভদ্রলোকের জন্যই তিনি প্রাণে বাঁচতে পারেন।

টোনিয়ার কথামত সে বছর শীতকালে ওরা তিন তিনটে ঘরই ব্যবহার করলে। তখনই ঘটনাটা ঘটেছিল।

সেদিন ছিল রবিবার, ইউরার ছুটির দিন। সারাটা সকাল যখন টোনিয়া আর নিউশা মিলে স্টোভটা জ্বাল্‌তে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তখন এগিয়ে এলো ইউরা।

ওদের দুজনকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিলে ও। তারপর বাতিটার ওপর কাঠগুলো হাল্কা করে সাজিয়ে শুকনো বটপাতা ছড়িয়ে দিলো ওর ওপর। তারপর জানালা খুলে দিলে। হু হু করে বাইরের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস ঘরে এসে ঢুকতে লাগলো। হাওয়ায় কাঠগুলো ধরে গেল সহজেই, আগুনের শিখা তার হারানো শক্তি ফিরে পেল, দপ করে মশালের মতো সে তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

একমনে এসব দেখতেই ব্যস্ত ছিলো ইউরা। সেখানে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে চমকে পিছনে তাকালো সে। দেখলে, উদ্বিগ্ন মুখে ঘরে ঢুকলো নিকোলে। তিনি এসেই টানতে লাগলেন ইউরাকে রাস্তায় নিয়ে যাবার জন্য। তাঁর মতে, দাঙ্গাহাঙ্গামায় মত্ত মস্কো শহরের জীবন্ত ইতিহাসকে জানার এটাই হোল উৎকৃষ্ট সময়।

যাবার পর যখন ওরা বাধা পেলো, গর্ডন এসে জানাল শহরের সমস্ত যানবাহন বন্ধ, দাঙ্গার মাত্রাটা আর একটু উঁচুতে চড়েছে।

সকাল থেকেই গলা ব্যথায় জ্বর এসে গেল নিউশার। বিরক্ত হোল ইউরা, অতিকষ্টে নিউশার মুখ থেকে একটু কফ সংগ্রহ করলো। তারপর সেটাকে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। অনেকক্ষণ পর সে একটু নিশ্চিন্ত হোল তার অনুমানটা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়াতে।

এই হাঙ্গামার মধ্যেও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো ইউরা। রাস্তায় যাওয়া তার পক্ষে কিছুতেই উচিত ছিল না, কেউ যেতেও বলল না ওকে। তিনদিন অসহ বন্দী জীবন ভোগ করেছিলেন ওদের সঙ্গে গর্ডন আর কোলিয়া মামাও।

তিনদিন বাদে নিউগার জয়ও করে এলো আর রাস্তার হাঙ্গামাও কিছু যেন শান্ত হয়ে গেল। বাড়ী যেতে চাইলেন ওরা, ইউরা বা টোনিয়া কেউই বাধা দিল না তাঁদেরকে। এই কদিনে সত্যই তারা মানসিক আর দৈহিক পরিশ্রমে বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

অক্টোবরের শেষ হতে আর দেরী নেই। ঘরে বসে বসে ইউরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলো। কিন্তু শহরের রাস্তাঘাট এখনও নিরাপদে চলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবুও এক সন্ধ্যায় ইউরা তার এক সহকর্মীর বাড়িতে গেল।

বাইরে তখন বরফ পড়ছে, তার পাতলা আস্তরণ ছড়ানো রয়েছে রাস্তার ওপর। তবুও সামনের দিকে পা ফেলে হাঁটছে ইউরা। সেই তুষার পড়ার মধ্যে থেকে একটা লোকের গলার শব্দ ভেসে এল, ওকে কাছে ডেকে একটা খবরের কাগজ কিনলো ইউরা তারপর তার মধ্য থেকে বিশেষ একটা খবর ভালো করে জানার জন্য একটা বাড়ির প্রশস্ত হলঘরের আলোর নীচে এসে দাঁড়াল সে

কাগজ পড়তে পড়তে সামনের দিকে তাকাতে বাধ্য হোল ইউরা। একটা ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার কৌতূহলী অথচ বিষণ্ণকাতর দৃষ্টিটা ন্যস্ত ইউরার ওপর। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জা পেল ছেলেটি। তারপর আর একটু পেছন ফিরে তাকিয়ে সামনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ও চলে যেতেই ইউরাও বেরিয়ে পড়ল। এখন ওর মন জুড়ে রয়েছে অন্য আর একটা খবর। চলতে চলতে অন্যমনস্ক হবার জন্যই হোঁচট খেয়ে একটা কাঠের স্তূপের ওপর পড়ে গেল ইউরা।

আর তারপরই ল্যাম্পপোস্টের অপর্যাপ্ত আলোর সুযোগে একটা তক্তা পিঠে তুলে নিয়ে দ্রুত হেঁটে বাড়ী ফিরলো সে।

তারপর ঘরে এসে উত্তপ্ত স্টোভের পাশে বসে বসে খবরের কাগজের এই নতুন খবরটা নিয়ে আর একবার আলোচনায় বসলো ইউরা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে।

এবছরেও হাড় কাঁপিয়ে শীতের বাতাস বইতে শুরু করলো। তার হিমেল ঠাণ্ডা স্পর্শ সুতোর মতোই শীতল পরশ বুলোতে লাগল প্রকৃতির বুকে, কিন্তু এতে সকলে বিব্রত হয়ে পড়লেও জব্দ হলেন না কেউ।

নতুন নির্বাচনের হাওয়া লেগেছে মস্কো শহরে। অলিগলিতে এখন তারই পর্ব প্রস্তুতি। মস্কো শহরটাকে যেন ঢেলে সাজানো হচ্ছে নতুন করে।

হোলি এর হাসপাতালটিকেও নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। অনেক পুরোন লোক চলে গেছে, তাদের জায়গায় এসেছে অনেক নতুন লোক।

আসন্ন বিপদ সম্পর্কে একটা আতঙ্ক তবুও যেন মুছে দিতে পারে না ওরা। সেই ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে ওদের দৃষ্টিকেও সম্প্রসারিত করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দেয় অতিরিক্ত ভাবে।

সেদিন রাস্তায় বেরোল ইউরা, উদ্দেশ্য কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা। ভাগ্যক্রমে একটু হাঁটাহাঁটি করার পর ও ওর বস্তুর সন্ধান পেয়ে গেল। চাষীদের মতো পোষাক পরে এক যুবক ওকে সাহায্য করলো বাড়ীতে জিনিসগুলো তুলে আনার ব্যাপারে।

স্লেজ গাড়ির ওপর ফেলে রাখা বড় বড় আর মোটা মোটা বট গাছের কাঠগুলো দেখেই টোনিয়া বলে দিতে পারে জ্বালানি হিসাবে এগুলো মোটেই সুবিধাজনক নয়। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে এই কাঠ মেলাও ভাগ্যের ব্যাপার।

কাঠের বদলে আয়না লাগানো আলমারিটা নিয়ে ছেলেটা যখন পথের বাঁকে অদৃশ্য হোল তখন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব রেখে টোনিয়া বললে, তোমার একটা কল এসেছে। —জানি আমি, ইউরার গলার স্বরও সে রকমই। ওরা জানে এ ব্যাপারে দুঃখ করা রীতিমত অস্বস্তিকর। গরম জলে স্যাকারিন গুলে দিল টোনিয়া। সেটা পান করে রোগী দেখতে চলে গেল ও।

ভাঙাচোরা বিপর্যস্ত দোকানগুলো দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট বাড়ির দরজার কাছে উপস্থিত হোল ইউরা।

নীচে অনেক লোকজন জমায়েত হয়েছে। কমিশনের স্থানীয় নেতা ও সোভিয়েটের প্রতিনিধিও এসেছিলেন সেই ভাড়াটাদের সাধারণ সভায় যোগ দিতে।

ইউরা ভেতরে যাবার অনুমতি পেল। দরজা খুলে গৃহস্বামী ভেতরে ডেকে নিলেন তাঁকে, ইউরা দেখলে ঘরের দামী আসবাবপত্রগুলো কেমন যেন অসংলগ্ন, যেন তাড়াহুড়ো করে কেনা হয়েছে। যুবকটি বললে, আমার স্ত্রীর বহুদিন আগে কেনা এই ঘড়িটার হঠাৎ সেদিন বেশ জোরে বেজে উঠতে দেখেই ভয় পেয়ে যায় ও, কারণ বহুদিন ওটা দমের অভাবে বন্ধই ছিল। সেই থেকে কেমন যেন প্রলাপ বকতে লাগলেন উনি, মাথাটাও কেমন যেন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। করুণ বিষন্ন মুখে সে লোকটি বলল।

—আচ্ছা আমি দেখছি। যুবকটিকে আশ্বস্ত করে ঘরের ভেতর ঢুকল ইউরা। সেখানে পালকের লেপ গায়ে শুয়ে আছেন এক ভদ্রমহিলা, ওর কালো চোখের গভীর থেকে জলের ধারা নেমেছে। ডাক্তারকে দেখেই রোগিনী ভীষণ বিরক্ত প্রকাশ করে পেছনে ফিরলেন।

কিছুক্ষণ ওঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে ইউরা বললেন, আমার মনে হয় ওঁর টাইফাস হয়েছে। ওঁকে এখুনি হাসপাতালে পাঠান দরকার। ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী হলেন না ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে। কেননা, ওঁর ধারণা তাহলে হয়ত ওঁর স্ত্রী বাঁচবেন না। তিনি ইউরাকে বারবার অনুরোধ করলেন স্ত্রীকে রোজ দেখতে আসার জন্য এবং এর জন্য তিনি ডাক্তারকে মোটা ফীও দেবেন। কিন্তু এ ধরণের মারাত্মক রোগীকে ঘরে রাখা কিছুতেই ভালো বলে মনে করলেন না ইউরা, তিনি এঁকে হাসপাতালে এখুনি পাঠাবার জন্য গাড়ি আর অন্যান্য বন্দোবস্তের ব্যবস্থার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

একটা ডিমের গুদোমে বাড়ীর ভাড়াটেরা সকলেই জমায়েত হয়েছে—সে ঘরেই সভা ডাকা হয়েছে। বর্দাল প্যাকিং বাক্সগুলো উল্টে রেখে বসবার জায়গা হয়েছে সবার জন্য।

ভাড়াটে একটা মোটা স্ত্রীলোকের কর্কশ স্বর সিঁড়ি থেকেও শুনতে পাচ্ছে ইউরা। ভদ্রমহিলা ইঁদুরের ভয়ে চীৎকার করছেন আর সকলকে গালাগালি করছেন।

ওকে ধমকে থামিয়ে দিলে স্থানীয় সোভিয়েটের মহিলা প্রতিনিধি ওলিয়া ডেমিনা, যিনি আগে মিসেস গুইসারের দর্জির দোকানে কাজ করতেন।

তিনি একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে সকলকে জানিয়ে দিলেন এই বাড়িটাকে স্থানীয় সোভিয়েটের হোস্টেল করে দেওয়া হবে, নাম দেওয়া হবে টিভেরজিন হোস্টেল। কেননা বর্তমানে নির্বাসিত একদা-খ্যাত কমরেড টিভেরজিন একদা এখানে বাস করতেন। বাড়ির ম্যানেজার হবেন মার্কিক ফতিমা। অন্যরা যে যার চেষ্টায় বাড়ি খুঁজে নেবে অর্থাৎ বাদবাকি সকলকেই চলে যেতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে।

খুপুগিন ভীষণ রেগে গেলও তাকে বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে শুনে। অন্যান্য ভাড়াটেরাও খেপে গেল, একটা তুমুল গণ্ডগোল শুরু হোল।

আর এই গণ্ডগোলের মাঝেই এসে পড়লেন ইউরা। তিনি কোনমতে কাছের একটি লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে হাউস কমিটির কোন

সমস্ত উপস্থিত আছেন কিনা। লোকটির চীৎকারে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন যে কুঁজো রোগা বয়স্ক স্ত্রীলোকটি, তাকে ইউরা চেনেন তাঁর পরিচয় গালিউলিন, লেফটেন্যান্ট ইউসুপকার মা। ভদ্রমহিলা যখন শুনলেন যে তার ছেলে ইউসুপকাকে এই ডাক্তার চেনে এবং এঁর নাম ডাঃ জিভাগো অর্থাৎ সেই বালক ইউরা তখন তার হাত ধরে বাইরের উঠোনে চলে এলেন তিনি। তারপর ফিসফিস করে জানলেন, ইউসুপকা নির্বোধের মতো যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে—কারও কথা ও শোনে নি। ওর বাপও যুদ্ধে বোমা লেগে মারা গেছেন। ভদ্রমহিলার গলার স্বর করুণ হয়ে উঠল। চোখের জল চাপতে চাপতে উনি বলতে লাগলেন, ইউসুপকা এসেছিল কিছুদিন আগে। ওর মুখেই শুনেছি তোমার সঙ্গে লারা গুইসারের খুব গভীর সম্পর্ক। তা ভালো, মেয়েটিকেও জানি। ও আগে আমাদের বাড়ী আসতো, খুব ভালো মেয়ে লারা। ইউসুপকা আর ঠিকপথে ফিরে আসতে পারে না, আমার দুর্ভাগ্য। আবার চোখে জল এসে গেল ওর।

হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, চল তোমার গাড়ির ব্যবস্থা করি। ওলিয়ার গাড়িটাই তোমাকে পাইয়ে দিচ্ছি। এসো আমার সঙ্গে।

গালিউলিনের পেছন পেছন ইউরা রাস্তায় পা বাড়ালো।

পাশাপাশি চলেছে ইউরা আর ওলিয়া ডেমিনা। গাঢ় অন্ধকার রাতের আঁধারে পথ দেখিয়ে চলেছে ওলিয়ার ছোট্ট টর্চটা। কিন্তু ওর ওই ছোট্ট টর্চটায় পথ চলতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছে ইউরার।

ইউরার পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করে ওলিয়া বললে, লারার সঙ্গে ওর এ বছরেই দেখা হয়েছিল। ও লারাকে বলছিল ওখানেই থেকে যেতে, কিন্তু নির্বোধের মতো ও প্রত্যাখ্যান করেছে ওর প্রস্তাব। অবশ্য ওলিয়া মনে করে নিতান্ত নির্বোধ বলেই সেদিন লারা পাশাকে বিয়ে করে তার চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিল।—ওকে কী মনে হয়? কিছুই না, আসলে ও ব্যাপারে চিন্তা করার সময়ই নেই আমার। ওর ভাই রডিয়া যুদ্ধে গিয়ে মারা পড়েছে আর ওর মা আমার তত্ত্বাবধানে আছেন।—আচ্ছা, আমি চলি।

চলে গেল ও। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কাঠের মূর্তির মতো কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইউরা। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরলো।

এতো দেরী দেখে ব্যস্ত হয়ে পায়চারি শুরু করে দিয়েছিল টোনিয়া। ও আসতেই জিজ্ঞাসা করল, এতো দেরী কেন? বিপরীত দিক থেকে কোন

এবার আমার আগেই ও বলতে শুরু করল, গতকাল বাবা আমাদের একমাত্র অ্যালার্ম ঘড়িটাকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, কাল শত চেষ্টাতেও ঘড়িটা কিছুতেই ঠিক করতে পারলেন না তিনি। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল। ঘড়িটা আপনা আপনি খুব জোর সুরেলা সুরে বেজে উঠল।

ইউরা দেখলে, ঘড়িটা আবার ঠিকমত চলছে। টোনিয়াকে খুলে বলল, কিছুক্ষণ আগের দেখা অনুরূপ আর একটা ঘটনার কথা।

প্রায় উপোস করতে শুরু করে দিয়েছে ই রা আর টোনিয়া। কিওাভা ষ্টেশনে কাঠ আনতে গেছিল সেদিন ইউরা কিন্তু ফিরে এলো প্রবল জ্বর নিয়ে— ডাক্তার ইউরা চেতনা হারাবার আগে নিজেই নিজের রোগ নির্ণয় করলে, রোগটা হোল মারাত্মক টাইফাস জ্বর।

অনুমানটা ভুল নয় কিছু। প্রবল জ্বর আর সেই সঙ্গে জ্বরবিকারে পক্ষকাল প্রায় অচেতন হয়ে বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলে সে। স্বপ্ন দেখল ইউরা, সে কবিতা লিখছে।

তার কবিতার বিষয় হোল সেই ভয়ঙ্কর তিন দিনের কথা। যে তিন দিন ভয়ঙ্কর কালো ঝড়ে সমগ্র রাশিয়া উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ফলাফল হোল অবক্ষয় আর মৃত্যু, সেই বিপদের কথা। কিন্তু একটানা সে এই বিপদের কথা চিন্তা করতে পারছে না। মাঝে মাঝে তাকে বাধা দিচ্ছে একটা ছোট্ট ছেলে, তার পরনে হরিণের চামড়ার পোষাক।

অসুস্থ শরীরে পথ্যটা ভালোই, বলতে গেলে যথাযথই। কিছুক্ষণের জন্য আনন্দিত হয়েছিল ইউরা তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এসব কোথা থেকে জোগাড় করলে টোনিয়া? স্বামীর পাশেই বসে ছিল টোনিয়া। উত্তর দিলো, তোমার সৎ ভাই, গ্রানিয়া জিভাগো টনোক থেকে এসেছিল। ওই ওসব জোগাড় করেছে। তোমার লেখার ও একজন মুগ্ধ অনুরাগী। ওর কথামত আমি ভেবে ঠিক করছি, তুমি সুস্থ হলে আবার আমাদের পুরোন জায়গায় চলে যাব, ইউরাটিন শহরের কাছে। কি বল?

ওর সম্মতির জন্য ওর দিকে চাইল টোনিয়া। মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ইউরা।

এপ্রিল মাস পড়তেই ওরা চলে গেল।

সপ্তম অধ্যায়

যাত্রা

বাড়ী ছাড়বার আগে পর্যন্তও ইউরার চলে যাবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কেননা তার মনে হয়েছে যে দেশে যাচ্ছে সেখানে তাদের আশানুরূপ স্বস্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে না পাওয়াও যেতে পারে। তাছাড়া ওখানে পরিচিত লোকজনের খোঁজ খবরও অনেকদিন পাওয়া যায়নি, তাই একধরণের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এভাবে এগিয়ে যেতে একটু যেন দ্বিধার মধ্যে পড়েছিল ও।

কিন্তু টোনিয়া আর তার বাবার পীড়াপীড়িতে ও যাবার মতই করলে।

সমস্ত ষ্টেশনে ভীষণ ভিড়, লোকজন গাদাগাদি করে কোনরকমে সেখানে মাথা গুঁজে আছে। সবিস্ময়ে ইউরা দেখলে হাসপাতাল থেকে সদ্য ছাড় পাওয়া বেশীর ভাগ টাইফাস রোগীই এদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী। প্রাথমিক চিকিৎসার পরই ছেড় দিতে বাধ্য হয়েছেন ডাক্তাররা। স্বয়ং ইউরাকেই কতবার এই অন্যায় কাজ করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে—এদের অবস্থা দেখে ব্যথা পেলেন ইউরা।

ষ্টেশন মাষ্টার জানালেন যে তিনি সুযোগ পেলেই ইউরাকে জানাবেন অবশ্য তার বিনিময়ে ইউরাকে কিছু দিতে হবে, তা সে টাকা অথবা দ্রব্য—যাই হোক।

সৌভাগ্য বলতে হবে ইউরার। সে আর আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ ঠিক সেই সময়েই কতগুলো প্রয়োজনীয় কাজ করার আমন্ত্রণ পেলেন। কাজের পারবর্তে পেলেন কতকগুলো দামী সই করা চিরকুট।

চিরকুট দেখিয়ে প্রচুর জিনিস পেলেন উভয়েই। যখন দুজনে সেই পর্বত-প্রমাণ জিনিসগুলো নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরল তখন দুজনের মনই বেশ হাল্কা, আর খুশীতে ডগমগ।

এই কদিন অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ালো ইউরা আর আলেকজাণ্ডার, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করার জন্য। আর টোনিয়ার ওপর ভার পড়লো, যাত্রার জন্য জিনিসপত্র গোছানোর।

বাইরের বসন্তের হাওয়ায় শীতের পোষাকের ভেতর লুকানো ন্যাপথলিনের গন্ধ ওর নাকে আসছিল ঘন ঘন। ভবিষ্যতের দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি চালিয়ে জামাকাপড়, আসবাব-পত্র সব কিছুর পোঁটলা বাঁধতে ব্যস্ত হোল টোনিয়া।

যাবার আগে আর একবার সব কিছু ঠিকঠাক করে নিতে লাগলো টোনিয়া। বাড়ির মালিক মংস্কার, ইয়াগোরোভনার আত্মীয়—তাকে যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিচ্ছিল টোনিয়া। বারবার দরজার তালা টেনে টেনে দেখছিল আর ভাবছিল খালি ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে আর বুঝি তারা এখানে আসবে না।

শুধু টোনিয়াই নয়, আলেকজাণ্ডার আর ইউরাও ভাবছিল তাদের ফেলে আসা বহু স্মৃতির কথা। তবুও কেউ কাউকেই তাদের সেই মনোভাব জানাতে দিচ্ছিল না।

পরদিন খুব সকালেই তারা উঠে পড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। জেভেরো-টিনের নেতৃত্বে বাড়ির সব লোকই জেগে উঠেছিল। বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ওরা, কোনো রকমে ওদের পাশ কাটিয়ে মার্কেলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাস্তায় নেমে এল ওরা।

তখনও পূর্বদিক ফর্সা হয় নি, জমাট অন্ধকারের বুক ঘন সাদা বরফের চাঁই যেন আটলান্টিক সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ। গোটা আবহাওয়া নিঃশব্দ রাস্তার বুকে একটামাত্র ঘোড়ার খুরের শব্দ এক নাগাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মৃদু মন্দ গতিতে।

বরফের টুকরো আর জঞ্জালে ষ্টেশনের বাইরেটা অব্যবহার্য, তাই ট্রেনগুলো ওখানে না থামার দরুন যাত্রীদের আরো কিছুটা হেঁটে যেতে হয় ট্রেন ধরার জন্য।

যাত্রীদের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে টোনিয়া আর তার বাবা আলেকজাণ্ডার আলেকজাণ্ড্রোভিচ। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে শাসা নিউশার হাত ধরে।

টাইফাস রোগের মারাত্মক আক্রমণের হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ওর ঘাড়ে, কাজতে আর হাঁটুতে পুরু করে কেরোসিন মাখানো হয়েছে।

ভ্রমণের ছাড়পত্রগুলি শীলমোহর করে এনে টোনিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল ইউরা। ওর কিছু বলার আগেই পেছন থেকে একজনের মন্তব্য শোনা গেল, তারপরেই আর একজন মন্তব্য করলেন। যখন তাদের কথাবার্তার মধ্যে একটু তর্ক বিতর্কের আভাস পাওয়া গেল, সোরগোলের একটু নমুনা দেখা গেল ঠিক

তখনই দূর থেকে একটা পাকানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দেল। ধোঁয়াটা ক্রমশঃ সামনের দিকে আসতে লাগল।

নিমেষের মধ্যে ট্রেনটা এসে গেল কাছে। অমনি শুরু হোল যাত্রীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি। অনেক কষ্টে-সৃষ্টে জিভাগোরা জায়গা পেলে সে ট্রেনে।

খুব আস্তে আস্তে চলছে ট্রেনটা, তিন দিন ধরে চলেছে তবুও এখনও মস্কো শহরকে অতিক্রম করতে পারে নি।

ঘটাং ঘটাং করে ক্রমাগতই শব্দ তুলে চলেছে কামরাটা। প্রতিবারই টোনিয়ার মনে হচ্ছে এবার বুঝি তাদের আয়ু শেষ কিন্তু ঐ ঝাকুনিই সার সর্বস্ব। আসলে মাল গাড়িতে চড়ে কখনও যাতায়াত করেনি টোনিয়া, এই তার প্রথম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

ওদের বগিটার নম্বর ছিল চৌদ্দ, সবশুদ্ধ তেইশটা বগি আছে ট্রেনের মধ্যে। সব কটা বগিই ছিলো ঠাসা—তাদের মধ্যে জিভাগোদের কামরাটাও বাদ যায় নি। তবুও সৌভাগ্যবশতঃ ওরা জায়গা পেয়েছিল বাঙ্কের ওপর তাই অন্যান্যদের থেকে নিরাপদই ছিল তারা।

নাবিকেরা সামনের দিকের কামরায়, মাঝখানটায় সাধারণ যাত্রীরা আর শেষ দিকের কামরায় ঠাসা সেই সব হতভাগ্য মানুষেরা যাদের জোর করে ধরে আনা হয়েছে বনটি কেটে রেললাইন তৈরী করার জন্য। ঐ ছোট্ট বগিটায় ঠেসে পোরা হয়েছে প্রায় পাঁচশ জনকে।

সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে আগত তারা। যারা একটু উচ্চবিত্ত সমাজের তারা প্রাণখোলা হাসি গল্প ঠাট্টা তামাশায় নিজেদের ভরে রেখেছে—এ যেন তাদের কাছে কিছুক্ষণের জন্য এক কৌতুকজনক অনুষ্ঠান। কেননা, তারা জানে টাকার জোরে তারা অচিরেই মুক্তি পাবে এই ঘৃণ্য নোংরা বন্দী জীবন থেকে। কিন্তু যারা দরিদ্র, ছেঁড়া জামা আর উন্মুক্ত আকাশ যাদের বস্ত্র আর বাসস্থান—তাদের মুখ হয়ে গেছে ফ্যাকাশে বিবর্ণ। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তারা সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, দরিদ্র হওয়াই মহাপাপ।

বেশ জোরে আওয়াজ তুলে গাড়িটা থেমে যেতেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে জেগে উঠল টোনিয়া। চোখ রগড়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একটা বড়ো স্টেশনে এসে থেমেছে ট্রেনটা।

পুঁটলি খুলে একটা চিকনের কাজ করা সুন্দর তোয়ালে পিঠে ফেলে

ইউরার সঙ্গে ট্রেন থেকে নেমে সামনের খোলা বাজারের দিকে এগিয়ে গেল। ওদের নামবার আগেই দ্রুতপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল নাবিকেরা ও তার পেছনে পেছনে সাধারণ যাত্রীরা।

প্লাটফর্মের ওপর সারি সারি সুস্বাদু খাবার এনে সাজিয়েছে চাষীর মেয়েরা। গোমাংস, পনির, শশা আর প্যানকেকও তার মধ্যে ছিল।

কী সব জিনিষ তারা বেচতে এনেছে তাই দেখবার জন্য টোনিয়া লাইন ধরে ধরে এগোতে লাগল। অনেকেই তার তোয়ালেটা কিনতে চাইল তাদের তৈরী খাবারের বিনিময়ে কিন্তু টোনিয়া রাজী হোল না কিছুতেই।

অবশেষে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা, একজন স্ত্রীলোক একটা ভাজা খরগোশের মাংস বিক্রি করছে। খুব পছন্দ হোল টোনিয়ার—অর্ধেকের বিনিময়ে অক্লেশে তোয়ালেটা দিয়ে দিল।

তারপর যেমন পিছন ফরলো, পেছন থেকে একটা সোরগোল শোনা গেল। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক চীৎকার করছে, ওর আনা দুধ আর মাংস খাবার পরিবর্তে ওর ক্রেতা ওকে ঠকিয়ে দিয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু বুড়িটা বুঝে ফেলেছে ওর মতলবটা আর সেজন্যই জনতাকে চীৎকার করে করুণ মিনতি জানাচ্ছে [illegible] ধরে দিতে।

সবেগে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল জনতা। কিন্তু পি[illegible] হোল তার থেকেও তাড়াতাড়ি। যে লোকটা চলে যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে, যাকে পলাতক আসামী বলে ঠাউরে বেড়াচ্ছে নির্বোধ বুড়িটা, সে আর কেউ নয়—একজন পল্টনের সেপাই—যার শাস্তিপ্রদান করার অধিকার সাধারণ লোকের নেই।

জোর করে ধরে আনা মজুরদের মধ্যে তিনজন দাঁড়িয়েছিল জানালার ধার ঘেঁষে. এদের সমস্ত দলটার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছিল ভোরোনিউক। প্রথম যে বেঁটে মোটা, বীভৎস আকৃতির লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার নাম প্রোখোর প্রিটুলিয়েভ। ওর বাড়ি জিরেটকা প্রদেশের কোন একটা গ্রামে। ওর স্ত্রী ওখানে থাকে, ও থাকে শহরে অন্য একটা মেয়েছেলে টিয়াগুলোভার কাছে। পিটার্সবার্গের সরকারি মদের দোকানে চাকরি করে ও। রেশন কার্ডের গোলমালের জন্য আটক করা হয়েছিল আর ধরে আনা হয়েছে এখানে।

পেলাগিয়াও ওদের হাতে বন্দী হয়েছে। সামনের কামরার বৃদ্ধা স্ত্রীলোক

ওগ্রিস্কোভা। শুধু চোখ দেখেই সন্তুষ্ট ছিল ও--প্রিটুলিয়েভের কাছে আমার কোন প্রয়োজনই মনে করেনি এ পর্যন্ত।

বালক ভাসিয়ার ইতিহাস আরো করুণ। মামার কাছে কাজ শেখার জন্য ও এসেছিল পিটার্সবার্গে। ভুলক্রমে শ্রমিক সংগঠনের নির্বাচনী পরিষদের আফিসে ঢুকে পড়ায় আর বেরোতে পারেনি ওর মামা। দেখা করতে আসা ভাসিয়াকে জামিন রেখে উনি বাইরে দেখা করার নাম করে পালিয়ে যান। সে থেকেই ভাসিয়া এদের হাতে বন্দী।

অনেক কাকুতি মিনতি করে ভেরোনিউকের মন একটু গলিয়েছে ভাসিয়া। ভেরোনিউককে কথা দিয়েছেন সমবায় পন্থী কস্টয়এড তিনি ভাসিয়ার জন্য যথাসাধ্য করবেন। কিন্তু ভাসিয়া মনে করে ততোদিনে বয়সও অনেক বুড়ো হয়ে যাবে। অত্যন্ত সরল ও ভদ্র নম্র স্বভাবের ছেলে ভাসিয়া। ওর চেহারার মতো ওর আচরণও সুন্দর আর সংযত।

ডিনারে কিছুতেই ঠিকমত বসতে পাচ্ছিলেন না কস্টয়এড। তার ভীষণ ভয় খোলা জানালা দিয়ে হিমেল হাওয়া যেভাবে এসে কামরায় ঢুকছে তাতে যে কোন মুহূর্তেই তার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। মুখের মধ্যে একটা খরগোসের ঠ্যাং ঢুকিয়ে জিভ দিয়ে এর স্বাদ নিতে নিতে একটা পরিতৃপ্তির শব্দ করতে লাগল ও।

ওর সঙ্গে বিপ্লবের আদর্শ এবং তার কর্মপদ্ধতির কথা আলোচনা করতে করতে বাঙ্কের ওপর দিয়ে নীচের দিকে তাকালো ইউরা। যেখানে প্রিটুলিয়েভ আর তার বন্ধু পেলাগিয়া—ভাসিয়া আর ভেরোনিউক চারজনের মধ্যে একটা জরুরী বৈঠক বসে গেছে। প্রিটুলিয়েভের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গ্রামের চির পরিচিত পথগুলোর নাম উচ্চারণ করতে লাগলো। আবেগে মাঝে মাঝে ওর গলা বন্ধ হয়ে আসছিল।

"শুকনো খালের পাশ দিয়ে যে গ্রামটি চলে গেছে—যার পাশ দিয়ে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে আকাশটাকে ধরতে—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ওর নীচ দিয়েই ভোলগা নদী বয়ে গেছে, ওই—ওই গ্রামটিই হোল আমার জন্মভূমি। ওরই নাম ভেরোটম্নিকি, আমার স্বপ্নপুরী। ওখানেই আমার দুই দিদি আর মা আমার স্বপ্ন দেখেন কবে তাদের ভাইটি আবার ফিরে আসবে। ভেরোনিউক খুড়ো,

তোমার পায়ে পড়ে মিনতি করছি—ছেড়ে দাও আমায়, আমার মার কাছে আমায় যেতে দাও, আবেগে আর করুণ মিনতিতে ভেঙে পড়ল বালক ভাসিয়া ভেরোনিউকের পায়ে।

ভাসিয়ার লাল চুলে আলতো টোকা মেরে টিয়াগুলোভা ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, বোকামো কোর না ভাসিয়া। একটু ধৈর্য ধরলেই তুমি মুক্তির সন্ধান পাবে।

ট্রেনটা সোজা পূর্বদিকে চলেছে—তার চলার পথে জমে উঠেছে বেশ উত্তেজিত জনতার বিশৃঙ্খলতা আর হামলা।

মাঝপথে ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেল। যাত্রীরা সকলেই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা কী।

লাইনের ওপর চারপাশে এখানে ওখানে জমাট করা তুষারের স্তূপ পড়ে ছিল। ড্রাইভার ব্যাপারটা দেখবার জন্য সেই যে মাটিতে লাফ দিল কিন্তু তাকে মাটিতে পড়তে কেউ দেখল না। সে এবং তার অনুসরণকারী কিছু নাবিকও যেন শূন্যে হারিয়ে গেল।

চুপ করে আর থাকতে পারল না যাত্রীরা। পারল না ইউরাও। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ফার গাছে ভর্তি জায়গাটায়, যেখানে রেললাইনগুলো অজগরের মতো পড়ে আছে। তার পাশেই পড়ে থাকা ড্রাইভারের দেহটা বরফের স্তূপে প্রায় আধখানা ঢুকে গেছে, ঢুকে গেছে কোমর অবধি সেই নাবিকরাও। সেই অবস্থাতেই চীৎকার করছে ড্রাইভার, আমাকে নাবিকেরা বন্দুক দেখাচ্ছে—ওরা চাইছে নালির ওপর এই বরফের জমাট করা স্তূপের ওপর ট্রেন চালানো হোক। কিন্তু আমি জানি এতে গাড়ীর যাত্রীদের প্রাণ বিপন্ন হবে। সকলের স্বার্থে আমি ট্রেনটাকে থামাতে বাধ্য হয়েছি। আপনারা সাক্ষী, আমি ওদের গুলির ভয়ে পালাচ্ছি না। জনতা চীৎকার করে ওকে সমর্থন জানালো। ভয় পেয়ে গেল না বকরা, ওদের আস্ফালন চুপসে গেল।

পরদিন ট্রেনটা যেখানে এসে থামলো, সে জায়গাটা কিরকম যেন থমথমে।

ট্রেন থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল গার্ড। স্টেশনমাষ্টার এগিয়ে এলেন, জানালেন, গ্রামে আগুন লেগেছিল। সিকভের সৈন্যদল বারুদ ছুঁড়েছিল।

কেন? আপনারা কি করেছিলেন।

—আমরা কিছুই করিনি, যা করেছে উত্তর সেনভিন্সেন্ট জেলার লোয়ার কেলমেসের লোকেরা—তারা নানারকমের অপরাধমূলক কাজ করছিল। কিন্তু সে সমস্যা চুকে যাওয়ার পর অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। সাতদিন ধরে একটানা বরফ পড়ার জন্য লাইনের ওপরে নীচে পুরু বরফ জমে আছে। আমার মনে হয়, আমরা শীঘ্রই এ ধরণের উটকো বিপদ কেটে বেরিয়ে যেতে পারব, যদি—। ওর মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে গার্ড সাহেব জানালেন, এই গাড়িতে প্রায় ৫০০ জনকে মজুর হিসাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রনেটে। এছাড়াও আরও যাত্রী আছে। সকলকে লাগিয়ে দেব বরফ তোলার কাজে, কি বলেন?

মৃদু হেসে স্টেশনমাষ্টার সম্মতি জানালেন, তারপর ঠিকমত কোদাল আনা হচ্ছে কিনা তার তদারকে বেরিয়ে পড়লেন।

রেললাইনের ধার ঘেঁষে সারি সারি দলবেঁধে কাজ করছে মজুরেরা। তাদের সঙ্গে মিশেছে জিভাগোরাও।

ট্রেন লাইনের ধার থেকে যতদূর চোখ চলে যায় সুদূর পোড়া ঘাসের জমি আর জমি। এর ওপর নিঃশব্দে ধেয়ে আসা বরফের ঝড় জায়গাটাকে আরও যেন কেমন গা ছমছম্ ধরায়।

কেবলমাত্র ঘুমোবার সময়টাই নিস্তার পেল মজুররা। অবশ্য খুব একটা পরিশ্রম হয়নি, কেননা তখনও যথেষ্ট শাবল এসে পৌছয়নি।

কাজ করতে করতেই প্রকৃতির দৃশ্য উপভোগ করছিল ইঁরা। দূর পাহাড়ের ওপর একটা সুদৃশ্য প্রায় বরফে ঢাকা একটা নির্জন বাড়ির দিকে চোখ চলে গেল ওর। পাহাড়ের চুড়োর অশেষ দাপটের বিরুদ্ধে সে যেন নীরব প্রতিবাদ।

মজুরদের সঙ্গে ইউরারাও নিশ্চিন্ত ছিল এতোদিন, কেননা পরিশ্রমের বদলে আহারের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল প্রচুর। যুদ্ধের দিনে পরিষ্কার রুটি পেয়ে তারা পরিশ্রমের কঠোরতাকে ভুলে গেল।

মাত্র এই তিনদিনেই সকলেই জায়গাটিকে ভালোবেসে ফেলল রীতিমত। এখানে আসবার সময় যে অস্বাচ্ছন্দ্য সকলের মনে একটা বিরক্তি এনে দিয়েছিল তাই এখন সাত গুণ বিপরীতধর্মী আচরণ শুরু করলে। কাজের উৎস হে আর আনন্দে সকলেই এর অস্বাচ্ছন্দ্যকে সহ্য করে নিলে, কর্মের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। প্রাত্যহিক অভিযোগ সইয়ে নিলে।

কিন্তু যেদিন সকলে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোল, তখন সকলেই মনে মনে দুঃখিত হল। সকলে যখন রেল লাইনের ধারে জমায়েত হোল, তখন প্রত্যেকের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। আশ্চর্য! এতদিন যাদের দেখার কারোরই খেয়াল হয়নি, তারা এতো লোক একসঙ্গে কাজ করেছিল।

ট্রেন ছাড়বার আগে জায়গাটায় আর একবার ঘুরে আসার জন্য ইউরা আর টোনিয়া নেমে এল ট্রেন থেকে। তখনও পশ্চিম আকাশে লাল আভাটা একেবারেই মিলিয়ে যায় নি। যখন তারা মাঝখানের বগিটার কাছে এসে পড়লো তখন দুজন স্ত্রীলোক টিয়াগুলোভা আর ওগরিস্কোভার মধ্যে তুমুল ঝগড়ায় নোংরা কটুক্তি শোনা যেতে লাগল লজ্জায় লাল হয়ে দুহাতে কান ঢাকল টোনিয়া। ওদের মধ্যেকার ঝগড়ার কারণ হল, ভাসিয়া! বুড়ি ওগরিস্কোভা নাকি ভাসিয়ার প্রতি নোংরা কটাক্ষ করেছিল তাই ওর ওপর ক্ষেপে উঠেছে টিয়াগুলোভা, হাতে এবং মুখে মারছে ওকে।

তাড়াতাড়ি চলো, ইউরার হাত ধরলো টোনিয়া তারপর দ্রুতপদে নিজেদের কামরার দিকে অগ্রসর হোল।

এতোই আস্তে আস্তে চলছিল ট্রেনটা, যে ইউরা ধীরে সুস্থে চারপাশটা দেখতে পাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে একটু পাতার খসখস, কিংবা ট্রেনের ঘটাং ঘটাং শব্দ অথবা পোষাক খোলার খুশখাশ শব্দ শুনতে শুনতে কখন যেন তন্দ্রা এসেছিল ইউরার। তারপর কয়েকদিনের ঘুমের অভাবটা পূরণ করে দেবার জন্য শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিলো।

বসন্ত এসে গেছে ওর উষ্ণ বাতাস বরফের শুষ্ক আবরণকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে জলে পরিণত করেছিলো। দুরন্ত নদীর কুল ছাপানো জলোচ্ছ্বাসের মতো হু হু করে রেললাইনের দুপাশ দিয়ে প্রবল জলের ধারা এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে চলাফেরা শুরু করলে বরফের স্রোত। বনের মধ্যে যা কিছু তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে তাকে জোর করে ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যেন কোন দৈত্য এগিয়ে চলেছে তার দুহাত বাড়িয়ে সব কিছু গ্রাস করার জন্য। পাইন গাছের পাতার ওপর থেকেও জলের ধারা পড়তে লাগল টপ্ টপ্ করে।

ইউরা যখন ঘুম ভেঙ্গে বাঙ্কের ওপর উঠে বসলো তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে।

ট্রেন যতোই সামনের দিকে এগোতে লাগল, ততোই শুধু মাঠ জুড়ে বসতি আর খনি। অদূরে খনির শ্রমিক এবং আরো অনেক গ্রামবাসীদের অসংখ্য কুটীর দেখা যাচ্ছে। লোকজনের ওঠানামাতে গাড়ীর ভেতর ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

এমনি সময় ইউরার কানে খবর এসে পৌছল, সাদারা ইউরিয়াটিন প্রায় দখল করে ফেলেছে। আর এই সাদাদের দলের নেতৃত্ব করছে গালিউলিন, যাকে সে শেষ দেখেছিল মেলিউজাইয়েভোতে।

মাঝ রাতে ইউরার ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উঠে বসলো। আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়লো সেই মোহমদির দৃশ্য। জ্যোৎস্নায় পৃথবী ভরে গেছে, রূপো গলিয়ে যেন কেউ সারা পৃথিবীকে মুড়ে রেখেছে।

দূর থেকে একটা জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে। সে শব্দে ডুবে যাচ্ছে অন্য গুলো। ইউরা জানে না যে এখানে ঝর্ণা আছে, তাই সে লোকজনদের নিস্তব্ধ পা টিপে টিপে চলাফেরা দেখে শঙ্কিত হোল। আসলে লোকজনদের গোলমালও মিশে গিয়েছিল ঝর্ণার উচ্ছল সুরলহরীতে।

অন্য প্রান্ত দিয়ে আর একটা এক্সপ্রেস ট্রেন এগিয়ে আসতে লাগল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেল লাইন, তারপরই বিরাট দৈত্যের মতো ট্রেনটা ধাতব শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল তারপর বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেলো সামনের দিকে। দূরে যেখানে আকাশটা নেমে এসেছে মাটির বুকে।

একজন বললে, স্ট্রেলনিকভ না? ইউরিয়াটিনের বাইরে চেকসৈন্য নিয়ে হাঙ্গামা বাঁধাতে ব্যস্ত হেটমান গালিইয়েভ। ওকেই তাড়াতে চলেছে বোধ হয়। অন্যজন বললে, উহু, হেটমান নয়, ও নির্ঘাৎ আলি কুরবান। তাই হবে বোধ হয়, আলোচনায় শান্তি নেমে এল।

সকালের দিকে ঘুমটা পাতলা হয়ে গেল ইউরার কিন্তু তবুও এপাশ ওপাশ করতে লাগল। দূর থেকে একটা মৃদু মধুর শব্দ শোনা যেতে লাগল। শুনতে শুনতে কখন যেন সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রচণ্ড একটা চেঁচামেচি আর হট্টগোলে ঘুমটা ভেঙে যেতে ধড়মড় করে উঠে বসল ইউরা। কনভয়ের কর্তার সঙ্গে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা চালাচ্ছে কস্টয়এড। একটা মৃদু সুরেলা পাখি মনোরম গলায় গান ধরলো। ওর গান শুনতে শুনতে

পাখিটা কি জাতের ভাবতে লাগল ইউরা। ওর কালোর সঙ্গে মেলানো সুন্দর পরিষ্কার রঙটা চোখের সামনে ফুটে উঠল। ঘুম জড়ানো গলায় ও আচ্ছন্নের সুরে বললে, চেরি পাখি।

ওঠো ওঠো ইউরা! শুনছ, উঃ কি ঘুমটাই ঘুমোচ্ছ! প্রিটুলিয়েভ আর ভাসিয়া পালিয়ে গেছে। ওগরিস্কোভা আর টিয়াগুনোভাকেও দেখা যাচ্ছে না। ভেরোনিউককেও পালাতে বাধ্য হয়েছে ওদের জন্যই। এই জন্য ট্রেন থেমে গেছে আর তাই নিয়ে ঝগড়া বেধেছে সৈন্যদলের নেতা আর সমবায় সমিতির নেতার সঙ্গে। ওঠো, ইউরা। বাবা, তুমিও ওঠো।

জানালা দিয়ে রুপোর স্রোত ভেসে চলেছে দেখা যাচ্ছে। এর ওপর সূর্যের তেলতেলে সোনালি আলো এসে পড়ে চকচক করছে—দুই রঙের অপূর্ব চোখ ধাঁধানো মিশ্রণ সত্যই দেখবার মতো।

জানালার বাইরে থেকে নদের দৃষ্টিটাকে একটুও না সরিয়ে ইউরা বললে, ওই মেয়েদুটো আর ভাসিয়া আর প্রিটুলিয়েভ যে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছে তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। ওরা যেন এই জলের মতোই বাঁধনছেঁড়া উল্লাসে উধাও হয়েছে কোথায়।

শীত চলে গিয়ে বসন্ত আসছে। প্রকৃতি আর বাতাস তারই মৃদু আমন্ত্রণ বয়ে আনছে। অলক্ষিতে শুরু হয়ে গেছে পরিবর্তন।

একটা পাহাড়ের খাঁজে শুয়ে শুয়ে সামনের দুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসা জলপ্রপাতটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ভাসিয়া। তারপর অল্প একটু শিস্ দিয়ে উঠে পড়ল ও, কি যেন একটা মনে পড়েছে ওর।

পালিয়া মাসি, এতো চুপ করে আছ কেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছ। কিন্তু আমি তো জানি ওগরিস্কোভা আপনা হতেই ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিল। আমি দেখেছি তুমি মোটেই ধাক্কা দাওনি। কিন্তু আর কোন কথা নয়, শীগ্গিরই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। এসো, এসো, শক্ত হাতে টিয়াগুনোভার হিম হয়ে যাওয়া কব্জিটাকে ধরলে, তারপর টানতে টানতে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ভাসিয়া।

একটা বেশ নীচু খাদের পাশ কাটিয়ে খুব আস্তে আস্তে ট্রেনটা সামনের দিকে এগোতে লাগল। পাহাড়টা অসমতল হওয়ার দরুণ বিশ্রী শব্দ হচ্ছিল।

জানালা দিয়ে সামনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে ইউরা। ওর চোখে পড়ল টিলার নীচেকার নোংরা প্রায় মরে যাওয়া বিবর্ণ গুঁড়িগুলো, চোখে পড়লো সৈন্যদের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু উঁচু বার্চগুলো। একটা ঢালু জায়গায় ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়ে পড়তেই কামরা থেকে নেমে এলো যাত্রীরা।

আস্তে আস্তে বরফ চাপা পড়া বনভূমিটা যেন মাথা তুলছে, আর তারই আনন্দে যেন থ্রাশ আর নাইটিঙ্গেল পাখি গেয়ে উঠেছে গান।

কিন্তু মানুষের হাত থেকে বেরিয়ে আসছে কর্কশ শব্দ—গাছ কাটার একঘেয়ে অবিরাম ধ্বনি। শক্ত হাতে কাঠ কাটতে কাটতেই ইউরা বললে, আমার কিন্তু টোনিয়াকে সব কিছু খুলে বলা উচিত। ও বেচারা এখনও ভাবতেও পারছে না, তাই আশা রাখছে এখনও অনেক কিছু ফিরে পাবার।

ঘাড় নাড়লেন আলেকজাণ্ডার। ইউরার প্রস্তাবটা একেবারে অগ্রাহ্য করার মতো মনে হলো না তার। সত্যিই ওর সঙ্গে একেবারেই মেলে না আমাদের এখনকার মনোভাব ওর মতো আমাদের মমতাময় মনোভাব নেই, সে জায়গায় জন্ম নিয়েছে সবকিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবার। সত্যি, টোনিয়াকে আমাদের সবকিছু বলে দিতে হবে, নতুবা—আবেগে বুজে এলো তাঁর।

প্রচণ্ড গরমে নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছিল ইউরার। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসের নীচে দাঁড়াবার আকাঙ্খায় ধীর পায়ে বাঙ্ক থেকে নেমে প্লাটফর্মের ওপর পায়চারি করতে শুরু করে দিলো ইউরা।

সামনের দিকে থেকে একটা গমগম আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারল ইউরা—ফ্রন্ট এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ভালো করে ষ্টেশনটার চারদিক ঘুরে আসার জন্য যেই সে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি বাধা পেল। বাধ্য হয়ে পেছন দিক ধরে এগোতেই অনুসরণকারীরা তাকে গুপ্তচর বলে ধরে নিয়ে গেল সৈনিকদের কাছে। কোন বাধা দিল না ইউরা, নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করল।

অনেকগুলো সাজানো, পরিষ্কার ঘর পিছনে ফেলে সান্ত্রীটা তাকে একটা ঘরের সামনে এনে হাজির করলে। ইউরা দেখল সেখানে ঘরের মধ্যে সেনাবাহিনীর পোষাক পরে একজন গণ্যমাণ্য গোছের ভদ্রলোক বসে আছেন। চারপাশে চেয়ে দেখলে ইউরা, এ ঘরটা আর কিছুই নয়, একটা পুরানো ডাইনিং কার।

ভেতরে সেনাবাহিনীর পোষাক পরে একজন ভদ্রম হিলা টাইপ মেসিনের যান্ত্রিক গোলযোগের কারণ উদ্ধারে ব্যস্ত। তাকে সাহায্যে করছেন একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী।

ইউরা যখন ভাবছে তার আসন্ন ভবিষ্যতের কথা, ভাবছে যে তার কাছে এই ধরণের অক্ষমতা তার ভীষণতম মৃত্যুরই নামান্তর, তখন কর্নেল উঠে দাড়ালেন —তারপর ইউরাকে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে টাইপরাইটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে কিছুক্ষণের জন্যও অব্যাহতি পাবার মানসে জানালার বা রে দৃষ্টিটাকে স্থাপন করলো ইউরা।

প্ল্যাটফর্ম থেকে স্টেশন ঘর পর্যন্ত একটা বিবর্ণ কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে। পুরোন খালি ইঞ্জিনগুলো থেকে খালি করা কয়লা ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছে।

রেল লাইনের এক ধারে ষ্টেশন, তার কিছু দূরেই রাজভিলেইয়েন শহরতলি। ওখানে বিবর্ণ, ভাঙা দেওয়াল জুড়ে ততোধিক বিবর্ণ বড়ো বড়ো সাইনবোর্ড, নোনাধরা দেওয়ালের গায়ে বিপজ্জনক ভাবে তারা ঝুলছে।

সকাল বেলায় সূর্যের আলোয় কুয়াশা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। খানিক দুর পর্যন্ত অন্তত দেখতে পাচ্ছে ইউরা। দেখতে পাচ্ছে অস্পষ্টভাবে তাদের গন্তব্যস্থল ইউরিয়াটিন শহরকে। এতদিনের ইউরিয়াটিনের নামই শুনেছে ইউরা আন্টিপভা আর আনার মুখে। আজ তাকে চোখে দেখার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে পড়লে ইউরা।

কর্নেল জানালা দিয়ে কি একটা দেখছিল। ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে প্রাণ-পণে নিজেকে সংযত করে নিলে ও। ওর মনে হোল, যে বালকটিকে রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় ধরে নিয়ে আসছে সান্ত্রীরা, যার নির্ভীক আচরণ ওকে বিদ্রোহী বলে পরিচয় দিয়ে ওর শাস্তিকে গুরুতর করে তুলেছিল তাকে বলে সংযত হতে। ওই পোষাকটা টেনে খুলে ফেলে দিতে ওর ওই নরম কোমল শরীর থেকে। কিন্তু কি ভেবে চুপ করে রইল ও।

তাড়াতাড়ি জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন কর্নেল, তারপর একেবারে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ইউরার দিকে চাইলেন।

ওর চলার আর কথা বলার ভঙ্গ, ওর পোষাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক সৌন্দর্য ইউরাকে মুগ্ধ করল। নিশ্চয়ই ইনি কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি, যিনি সহজেই

পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজেকে অপরের প্রিয় করে তুলতে পারেন। এঁর স্বচ্ছন্দ্য সাহসিকতার ভাব, পৌরুষদীপ্ত কঠিন আচরণ এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নিদর্শন।

ইউরার দিকে ফিরে তাকালেন উনি। সঙ্গে সঙ্গেই ওর পাসপোর্টটা ডেস্কের ওপর থেকে হাতে তুলে নিলেন। তারপর মন দিয়ে দেখতে লাগলেন সব কিছু। জিভাগো—কি যেন সব মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে, নামটা যেন আমার পরিচিত। মহাশয়, কিছুক্ষণের জন্য সময় ধার নিতে পারি আপনার থেকে! দেবেন? খুব ভালো। চলুন তাহলে পাশের ঘরে, ওখানেই আমাদের আলোচনাটা নির্বিঘ্নে শুরু করা যাক।

মস্কোয় জন্ম স্ট্রেলনিকভের। ওখান থেকে সে সব থেকে উঁচু ডিগ্রিটা নিয়ে মফস্বলে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে যুদ্ধে, তারপর টিভেরজিনের সহায়তায় সে নানা ঘটনাচক্রের আবর্তনে কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েছে।

এর কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকটা ভয়ঙ্কর রকমের বিদ্রোহ দমন করেছিল বেশ সফলতার সঙ্গেই। তার কাজে কর্তৃপক্ষ খুশী হয়ে আরও বিরাট বিরাট কাজের দায়িত্ব তার মাথায় চাপিয়ে দিলেন। যতোই তিনি সাফল্যের মুখ দেখতে লাগলেন, ততোই বিদ্রোহীরা তার নতুন নামকরণ করতে লাগল। স্ট্রেলনিকভের অর্থাৎ গোলন্দাজ থেকে তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'রাজস্ট্রেলনিকভ' অর্থাৎ জল্লাদ।

১৯০৫ সালের বিপ্লবে যোগদান করেছিলেন তার বাবা। সেই অপরাধে তাঁর জেল হয়। তারপর অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েও স্ট্রেলনিকভ একে একে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলাবিদ্যায়, গণিতে আর বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুললে নিজেকে।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে যখন যুদ্ধে যান তখন তিনি পূর্ণ যুবক। তারপর ১৯১৭ সালে, কারাগার থেকে দেশে পালিয়ে এলেন। ছেলেবেলা থেকেও মহৎ সব কল্পনায় নিজেকে পূর্ণ করে তুলেছিলেন স্ট্রেলনিকভ। কিন্তু বড় হয়ে যখন দেখলেন পৃথিবী তার থেকে সম্পূর্ণ উলটো, এর নিয়মের সঙ্গে তার চিন্তাধারার কোন কিছুরই মিল নেই, তখন মনে মনে ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন তিনি —সবাইকে শাস্তি দেবার প্রবল ইচ্ছা জাগল মনে মনে।

যখন এরকম একটা সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি, সেই সময় রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হোল। সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায়।

—মস্কোয় যাচ্ছেন কেন ? ও, বোধহয় ক্র্যাগারের সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু সাদারা আমার ভয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি, আর ওটাও আমাদের আসল কাজ। কিন্তু আপনি, আপনি তো একজন সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের অফিসার, আপনি দল ছাড়লেন কেন ?

—দুবার আহত হবার অপরাধে ওরা আমাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য আপনি আমাকে এখনও যে সন্দেহ করছেন তা আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় আমায় মুক্তি দেওয়াই উচিত, কেননা আমি সত্যই বলছি আমি আপনাকে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সাহায্যই করতে পারবো না।

একটু পরেই জিভাগো ছাড়া পেয়ে গেল। ওকে বিদায় দিয়েই স্ট্রেলনিকভ রিসিভার তুলে কাকে যেন ফোন করলেন, আর বললেন, ওই আহত ছেলেটির যথাযথ বন্দোবস্ত করতে।

ওপাশ থেকে সম্মতির স্বর ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। মনে পড়ে গেল তাঁর স্ত্রী ও কন্যার কথা যাদের সঙ্গে ইউরিয়াটিনে বাস করতেন। একবার ইচ্ছা হোল তাদের কাছে ফিরে যেতে কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানকে উপেক্ষাও করতে পারলেন না। অসহায়ের মতো চেয়ারে বসে পড়লেন।

অষ্টম অধ্যায়

আগমন

ট্রেন এসে থামলো ইউরিয়াটিন শহরতলির একটা স্টেশনে। হুড়োহুড়ি গাদাগাদি করে অসংখ্য লোক নামতে লাগল। ইউরার মনে হোল এখানে পাহারায় কড়া ব্যবস্থা করা হলেও এখানকার জনবসতি খুবই ঘন। অবাক হয়ে ইউরা ভাবতে লাগল, কিসের নেশায় ওরা এখানে এমনভাবে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

যে শান্ত্রীটি রাইফেলের কুঁদোর ওপর ভর দিয়ে চলাফেরা করছিল সেই এগিয়ে এসে ইউরাকে সাহায্য করল—ওর জিনিসপত্র ধরে তুলে দিতে।

সেদিন বাতাস অত্যন্ত ভারি ছিল, শুষ্ক উষ্ণ স্পর্শ চামড়াটাকে প্রায় পুড়িয়ে দিচ্ছিল। ঘামে নেয়ে উঠছিল প্রত্যেকে।

ফিরে আসতেই টোনিয়া চীৎকার করে উঠলো। তুমি শেষ পর্যন্ত এসেছো তাহলে? তোমার জন্য এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

সামডেভিয়াটভ? ইউরা মনে মনে একবার তার স্মৃতিকোঠায় হাত চালিয়ে খুঁজতে লাগল।—"আপনি ভয় পেয়ে গেছিলেন তো? কেন!" ওর কথার ধরণে রীতিমত অবাক হোল ইউরা। স্ট্রেলনিকভকে ভয় পাবার মতো তো কিছু দেখলাম না ওর মধ্যে। জানো ইউরা, ও আমাদের সকলকে চেনে। অন্টিপভাকে আপনি চেনেন?

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ইউরা, "আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে আপনি একজন মার্কসবাদী। আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় একজন শিক্ষক বা ঐ ধরণেরই একটা কিছু।"

উনি কি বলছেন শোনো ইউরা। উঃ, কি আনন্দ আমাদের ট্রেনটা ইউরিয়াটিনের দিকে সোজাসুজি যাবে না ওখানে গোলমাল হবার জন্য টর্ফিয়ানা হয়ে যাবে। ভালোই হবে, মালপত্র নামাবার ঝামেলা সইতে হবে না। অবশ্য, যাতায়াতের ঝামেলা সহ্য করতে হবে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখেছিল ইউরা. ওকে সব কিছু চেনাতে সাহায্য করছিল সামডেভিয়াটভ। হাত তুলে তুলে ওকে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল। অনর্গল বকবক করছিল, অবশ্য মাঝে মাঝে গাড়ির চাকার কর্কশ শব্দে ওর গলার স্বর চাপা পড়ে যাচ্ছিল বিখ্যাত হাইওয়ের ওপর যখন ট্রেনটা এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এর সম্পর্কে বোঝাতে শুরু করল ও। ইউরা বলল, আমরা ভারিকিনোতে যাচ্ছি। —শহরে যেতে হলে আপনার এই জায়গাটা সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

দূরে তেলের ট্যাঙ্কগুলোর মাথা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সঙ্গী বললে, ওই যে দেখছেন মরো অ্যাণ্ড ভেটচিনকিন, ওটা কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি বানানোর কারখানা। আমার বাবার শেয়ার আছে।

—কিন্তু আপনার মার্কসবাদ? ইউরা মন্তব্য করলো কঠোর মুখে।

—ব্যবসার ক্ষেত্রে টাকা বাড়ানোর সময় ওসব আহম্মক কথা ভাবে নির্বোধেরা। আমার বাবা বা আমি কেউ-ই সেরকম বোকা হতে রাজী নই।

একজন স্ত্রীলোককে হাত নাড়তে দেখে সামডেভিয়াটভ রীতিমত ক্ষেপে গেল। ভাবলে, ও বোধহয় ওকেই ট্রেনটা পিছু হটার জন্য দায়ী করছে। রীতিমতো ক্ষেপে গেলেও বুঝলো না, স্ত্রীলোকটি হাত নেড়ে ট্রেনের ড্রাইভারকে বলছে ট্রেনটাকে পিছু হটিয়ে নিতে।

আবার সিগন্যাল পেয়ে সামনের দিকে ট্রেন যখন ছুটে গেলো তখন স্ত্রীলোকটি সামডেভিয়াটভের ওপর তার পূর্বেকার ব্যবহারের প্রতিশোধ নিলে। জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটলে সে। ওর এরকম ব্যবহারে আবার সামডেভিয়াটভ ক্ষেপে গেল কিন্তু কিছু বলতে পারল না—কেননা, তখন মেয়েটিকে ছেড়ে ট্রেনটি অনেক দূরে চলে গেছে।

একটু পরেই ইউরাকে প্রস্তুত হতে বলল, শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিন, আর একটু পরেই আমাদের নামতে হবে। আমি ওকালতি করি বলেই এখানকার পথ-ঘাট সব আমার মুখস্থ।

—এখনো তাহলে এখানকার জীবনযাত্রার গতিপথ বরবাদ হয়ে যায় নি?

—মোটেই নয়। বাইরে ওরকম একটা ভান দেখানো হচ্ছে বটে, কিন্তু কাজ মোটেই হচ্ছে না। বিশেষত: আমার। কেননা, এখানকার বেশীরভাগ লোকই আমার ওপর নির্ভর করে বসে আছে। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, ওখানে আপনার মিকুলিৎসিনের আশ্রয়ের ওপর নির্ভর স্বদেশের মাটির টানে

চলে এসেছেন তো ? কিন্তু চারদিকের বিশৃঙ্খলায় রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে। ও তাই, আপনাকে হয়তো সহজে মাথা গোঁজবার ঠাঁই দিতে চাইবে না। আমি জানি, ওর চেঁচামেচিই সার হবে, যদি আপনি কোন ক্রমে ওর মন গলাতে পারেন। একবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেই আর কোন অসুবিধে দেখা দেবে না।

টেকনিক্যাল স্কুলে পড়তো মিকুলিৎসিন। কি একটা কারণে তার জেল হয়। জেল থেকে ছাড়া পেলে ওর সঙ্গে বিয়ে হয় টুন্টসেভনের বড মেয়ের সঙ্গে। বিয়ের পর ওদের ছেলে হয়—ছেলেটির নাম রাখেন লিবেরিয়ুস। যুদ্ধ যখন বাঁধলো তখন বয়স ভাঁড়িয়ে ছেলেও তাতে যোগ দিলো—এত বড়ো আঘাত সহ্য করতে পারলো না ওর মা, মারা গেল। যুদ্ধের শেষে ছেলে ফিরে এলো, হাতে তিনটি মেডেল নিয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম হেলেন মিকুলিৎসনের বৌ। তিনি বয়সে অনেক ছোট।...কিন্তু আপনি জানালা দিয়ে কি দেখছেন? ওঞ্জো। হোল —পার্টিজান অর্থাৎ দলের লোক। যত সব ছন্নছাড়াদের দিয়ে গঠিত হয়েছে এই দল—এর মধ্যে আবার কিছু কিছু বন্দী এবং চির পরিত্যক্ত বেকারও আছে। আর এই দলের পরিচালনা করেন স্বয়ং লিস্কি, ওর পুরো নাম লিবেরিয়ুস আভের-মিত্রজিন।

মিকুলিৎসিনকে আপনি দেখেছেন? তাহলে নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন ওর মৃতের মতো নির্বিকার দুই চোখ। তিনি আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী—একজন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী কিন্তু আদর্শের দিক দিয়েই এই বিরোধটা দেখা দেয় নতুবা তাদের ব্যক্তিগত কোন ঝগড়াঝাটি নেই।

তিন বোন তিন চরিত্রের। বড়োটি কোন এক পাব্লিক লাইব্রেরীতে কাজ করে, ভীষণ লাজুক স্বভাব তার। মুখ দিয়ে কথা বেরোতেই চায় না। দ্বিতীয়টির আবার ভীষণ আমুদে স্বভাব। লিস্কির সঙ্গে ওঁর এখানে অনেক মিল আছে। ভীষণ চঞ্চল—অথচ কর্মনিপুণ, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান।

ছোট মেয়ে লিনা তার দুই দিদি আভাডাটির আর গ্লাশার মতো নয়। ওর দিদিরা ওকে ঘরে বন্ধ করে কাজে গেলেই জানালা গলিয়ে বেরিয়ে আসত। নানা রকম রাজনৈতিক হামলার সঙ্গে যুক্ত বলে বিস্তর হাঙ্গামা পোয়াতে হয় দুই দিদিকে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সামডেভিয়াটভ। ওর গন্তব্য স্থান

এসে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজের জিনিসপত্র নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর নামবার জন্য প্রস্তুত হোল।

ইউরা বললে, ভাবছি ক্রোগারের উত্তরাধিকারী বলে চিনতে পেরে তোমার ওপর কোন ঝামেলা করবে না তো? সেদিন আমাকে দেখেই ট্রেলনিকভ ভুরু কুঁচকে বলেছিল, আমি ক্রোগারের উত্তরাধিকারী কি-না।

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিল টোনিয়া। এবার হঠাৎ ইউরা তার দিকে ফিরে প্রশ্ন করতে শুরু করল—যথেষ্ট সতর্কতার সুরে। বললে, বেশী লোকের সঙ্গে কথা বলব না, আর প্রাণপণে চেষ্টা করব এবার থেকে লোকের আড়াল হতে কেমন? তাহলে তো আর বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না, কি বল ইউরা? —কিন্তু ট্রেন তো প্ল্যাটফর্মে প্রায় এসে ঢুকলো, এখন তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলো গুছানো যাক। চল, বাবাকে ডেকে তুলি ঘুম থেকে।

ট্রেন এসে নির্দিষ্ট জায়গায় থামতেই হুড়মুড় করে অনেক যাত্রী নেমে এলো, ওদের পেছন পেছন ইউরা আর টোনিয়াও নেমে এলো।

কামরার অন্যান্য যাত্রীরা টোনিয়াকে লক্ষ্য করে হাত নাড়তে লাগল, কিন্তু সেদিকে মন দেবার কোন অবসরই ছিল না ওর। ওরা ওদের জিনিসপত্র মেলানোতেই ব্যস্ত।

সমস্ত স্টেশনটা এমন নস্তব্ধ যে একটা ছুঁচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। এর ওপর চারধারের লম্বা লম্বা ঝুঁকে পড়া ডালপালায় স্টেশনটি প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছিল। একটা রহস্যময়তার আমেজে স্টেশনটা থম্ থম্ করছে। দূর থেকে কোন এক নাম না জানা পাখি ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ মধুর স্বরে।

"কী সুন্দর, এ জায়গাটা", উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল টোনিয়া। ওর চোখে আবেগে জল এসে গেল।

একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, বললেন, আপনারাই কি সেই জিভাগো পরিবার—যাঁর কথা আমায় সামডেভিয়াটভ মস্কো থেকে ফোন করে জানিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে কে মিষ্টার জিভাগো? আপনি কি ডাক্তার? আসুন আমার সঙ্গে, আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন আমায় সামডেভিয়াটভ।

উনি কি আপনার পরিচিত?

নিশ্চয়ই, উনি আমাদের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তা আপনাদের

জন্য কি আমি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করব? ভোনাট, ভোনাট,—তিনি গলাটা একটু উঁচুতে তুলে দিয়ে কাকে যেন ডাকতে লাগলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কিভাবে জিভাগো পরিবারকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়।

আপনাদের সঙ্গে ইভান এর্ণেস্টোভিচ ক্রোগারের কি সম্পর্ক? একটু আ'গ ভদ্রলোকের মুখে ব্যাকাসের নাম উচ্চারিত হয়ে তারা ওর জীবনচিত্র সংরক্ষণেই ব্যস্ত।

একটু পরেই ঘোড়ার গাড়ি এসে গেল। উঠে পড়লো ওরা গাড়িতে, ঘোড়াটা পাথরের এবড়ো খেবড়ো অসমতল জমির ওপর দিয়ে ছুটে চলল।

চলায় ধাক্কায় ঝাঁকুনি লাগছিল এবং কাঁধের সঙ্গে ওর কাঁধের ঠোক্কর লাগছিল। কখনো আলো আর কখনো অন্ধকার ছায়াপথ দিয়ে যেতে লাগলো গাড়িটা।

মাঝে মাঝে গাড়োয়ানটা ধমকে উঠছিল ঘোড়াটাকে, কিন্তু ঘোড়াটা তার বাচ্চার জন্য পিছিয়ে পড়ছিল বাধ্য হয়ে। গাড়িতে বসে বসে ওরা বেশ কৌতুকবোধ করছিল বৃদ্ধ ব্যাকাসের এই অদ্ভুত ধরণের খামখেয়ালী আচরণ দেখে।

হঠাৎ টোনিয়ার দিকে তাকালো বুড়ো—আপনি গ্রিগভ অর্থাৎ ক্রোগারের নাতনি টোনিয়া না? অবাক হচ্ছেন, কিন্তু আমি দীর্ঘদিন ওদের ঘরে কাজ করছি। আপনাকে চিনতে আমার একটুও অসুবিধা হয়নি। আমার নাম হোল সেখনাসি। আমাদের নামটা এক হলেও পদবী ভিন্ন।

ওরা চেপে গেল যে মিকুলিৎসিন অথবা লিবেরিয়ুসের কথা তারা সামডেভিয়াটভের কাছে আগেই শুনেছে। বৃদ্ধ অবাক হল ওদের নির্বিকার মূর্তি দেখে, কি আশ্চর্য!

"পাহাড়ের ওপরকার ওই সাদা বাড়িটায় মিকুলিৎসিন থাকেন।"

ওর কথা শেষ হবার আগেই গুলি ছোঁড়ার শব্দ ভেসে এলো কানে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল শাসা, বললে, "ওর কারা—আমাদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়ছে? পার্টিজান বোধ হয়?

- উঁহু, মিকুলিৎসিন গুলি ছুঁড়ে নিচের খাদের নেকড়েদের ভয় দেখাচ্ছে।

যখন ওরা মিকুলিৎসিনের বাড়ীর সামনে এসে পৌছল, সেইমাত্র হেলেন ও মিকুলিৎসিনও বাড়ী ঢুকছিলেন। মিকুলিৎসিনের হাতের বন্দুক একটু আগে ব্যাকাসের অনুমানের সত্যতাকে প্রমাণ করে।

ওদের দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই। তারপর বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, কি চাই? এখানে আপনাদের কি দরকার?

অপমানে লজ্জায় প্রথমটা কথা বলতে পারলেন না আলেকজাণ্ডার কিংবা দলপতি জিভাগো। তারপর বহুকষ্টে আলেকজাণ্ডার ভিক্ষা চাইলেন ওদের কাছে মাথা গোঁজবার একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য।

যখন আশ্রয়দাতা শুনলেন যে অন্যগাঁয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রেই তারা এই দাবী করতে পারে তখনও তার বিরক্তির মাত্রা কিছুমাত্র কমলো না। ওর স্ত্রীও রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে স্বয়ং মিকুলিৎসিন বললেন, আমার ছেলে কেন বলশেভিক তার কারণ এবং আমি কেন সংবিধান সভায় নির্বাচিত একজন সভ্য তার কারণ জানতে চাওয়ায় ঝালাপালা হয়ে গেছি, তার ওপর আপনাদের এই অত্যাচার মোটেই সহনীয় নয়। বিশেষতঃ, যেখানে আমার বিপদের মাত্রা কমে না গিয়ে বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনাই বেশী।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত ওরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ওঁর বৈঠকখানায় আশ্রয় পেলেন। ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোল তাদের।

সন্ধ্যের দিকে হিমেল বাতাস বইতে শুরু করল। ছোট্ট শাসা কিন্তু এই নতুন আবহাওয়ায় নিজেকে একদণ্ড মানিয়ে নিতে পারল না। মানিয়ে না নেবারও কথা, কেননা তার কোন আশাই এখানে পূরণ হোল না। কালো বাচ্চা ঘোড়াটাকে আনার প্রস্তাব করতেই তার মা ধাক্কা লাগালো, এমন কি তার আধোআধো কথাও কারোও মনে কিছুমাত্র ছাপ ফেলল না। সকলেই কেমন যেন তাকে এড়িয়ে যেতে লাগল। ওকে জোর করে খাইয়ে দিয়ে বিছানায় শোয়ানো হোল তারপর ঘুমিয়ে পড়তেই বড়োরা সেখানে গেল তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য।

কালো আকাশের গায়ে সাদা সাদা উজ্জ্বল তারাগুলো যেন কোন বেনারসী বুট। তার নীচে নিবিড় ঘন ঝোপ, আর বারান্দার নীচে মুগ্ধ হল মন—একজন যুবক ইউরা আর একজন প্রৌঢ় আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডার বললেন, বরফ গলতে শুরু করলেই আমরা আলুর চাষ করতে শুরু করে দেব, কেননা আর অবশিষ্ট জমিটায় পড়ে থাকা ওই ভাঙাচোরা কুটিরটাকে মেরামত করে ওখানেই থাকবার একটা আস্তানা গেড়ে নেব। কেমন?—ইউরা বলল, শুধু আলুর বীজ কেন, ওরা আমাদের জন্য আরও বীজ দেবে বলেছে। আমি জমিটাকে ভালো

করে দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। আমার মনে হয়, জমিটা এখনও চাষের পক্ষে 'অনুপযুক্ত হয় নি।' মিকুলিৎসিন এবং তার স্ত্রী হেলেনও লোক হিসেবে খুব একটা মন্দ নয়। মোট কথা এখানকার জায়গার মতোই এখানকার মালিকও খুব ভালো।

একটা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে ওরা খাবার ঘরে ঢুকলো। অন্যান্য ঘরের মতো এ ঘরটাও ছিল সাজানো গোছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—খুব খুশী হোল ইউরা। একটা বন্দুকের দিকে তাকিয়ে টোনিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা শুরু করতে লাগল ওর নির্মাতার অর্থাৎ মিকুলিৎসিনের ছেলের।

খুব সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছিল চা-টা। পান করে সকলেই বেশ আনন্দিত হয়ে পড়েছিলেন। হেলেন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় প্রশ্ন করতে লাগলেন, অনেকগুলোর উত্তরও দিয়ে গেল। কিন্তু শেষে তিনি যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে ইউরার কান খাড়া হয়ে গেল। হেলেন বললেন, পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক আন্টিপভ আমাদের কলেজে পড়াতেন। ওঁর পড়াবার ধরণ ছিল খুব চমৎকার, দেখতেও তিনি খুব সুন্দর ছিলেন। সকলেই ভালোবাসতো তাঁকে, শ্রদ্ধাও করতো খুব। ওঁর স্ত্রীও একটা স্কুলে পড়ান। বিয়ের কিছুদিন পর আন্টিপভ স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যুদ্ধে যান, কেউ কেউ বলে সেখানেই তিনি মারা যান। কারও ধারণা কমিশার স্ট্রেলনিকভের ছদ্মনামেই তিনি বাস করছেন। আমি অবশ্য এ ধরনের কোন হুজুগে বিশ্বাস করি না—ইউরার কৌতূহলিত মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ সপ্রতিভ মুখে বললেন তিনি।

নবম অধ্যায়

ভারিকিনো

ফেলে আসা এবং চলমান দিনগুলোকে নিয়ে বেশ বড়সড় একটা কড়চা লিখে ফেলল ইউরা। প্রথমে লিখল যে, সে যেন রবিনসন ক্রুশো, তার মতোই অনবরত কাজে তার যেন অফুরন্ত উৎসাহ কমছে না বরং ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

শীতের ঠাণ্ডা বাতাস কিছুতেই আমাদের কাবু করতে পারে না। জীবনের গতিটাকে কিছুতেই বিপর্যস্ত করতে না হয় তার জন্য রীতিমত যুদ্ধ করে চলেছি কোদাল কুড়ুল নিয়ে। আলুর বীজ বপন থেকে চারা বেরিয়েছে, আমার ধারণা এদের সাহায্যেই আমাদের মোট চাহিদার মোটামুটি পূরণ হয়ে যাবে।

অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এভাবে ফসল লাগানোই মোটেই নীতি-সঙ্গত নয়। জ্বালানি কাঠ জোগাড় করার উপায়টাও মোটেই বুক ফুলিয়ে কিছু বলার মতো নয়। আমাদের ভাগ্য ভালো যে এই স্থান লোকালয় থেকে অনেক দূর, তাই সব সময় খবরই ওখানে পৌছায় না। যদিও কিছু লোক রোজ আমার কাছে আসে ওষুধ নিতে, বিনিময়ে অবশ্য আমারও কিছু হয়। ওরা যে কি করে জেনেছে তা আমি নিজেও কখনও জানতে পারিনি।

সামডেভিয়াটভকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের শুধু কেন, এই মিকুলিৎসিন পরিবারকেও প্রাণপণে সাহায্য করেন। গ্রামের প্রতিটি লোকের জন্য তাঁর পরিশ্রমের অন্ত নেই। তিনি একদিকে বিপ্লবের ঐকান্তিক সমর্থক অন্যদিকে সরকার অনুমোদিত এক বৃহৎ ক্ষমতার অধিকারী। এই লোকটিকে আজ পর্যন্তও জেনে উঠতে পারলো না ইউরা, সত্যি। সকলের কাছে সামডেভিয়াটভ এক বিচিত্র বিস্ময়।

খুব তাড়াতাড়ি বাড়িটা বানিয়ে ফেললাম, মেরামতই হয়ে গেলো চিমনিটা, গৃহস্বামী মিকুলিৎসিন অত্যন্ত খুশি হলেন এতে।

তা খুশী হওয়ার আজ কারণও ছিল। সেবারে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হোল, উৎপন্ন হোল শাকশব্জি, আনাজ আর ফলমূল। আলু, বাঁধাকপি, শশা, বীট, গাজর,

শালগম. মটরশুটি আর সীম—সব সমান ভাগে ভাগ হোল। ওরা একভাগ নিলে, আমদের ভাগটা আমরা সারা বছরের জন্য মজুত করলাম উপযুক্ত উপায়ে।

প্রথম দিকটায়, বসন্ত আর গ্রীষ্মের দিনগুলো'তে বেশ কষ্ট করে নেবার পর শীতকাল এলো। একধরণের আলস্যতায় দিনগুলো যেন হুহু করে বয়ে যেতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় সামডেভিয়াটভের দেওয়া প্যারাফিনের আলোয় পড়তাম, পৃথিবীর বিভিন্ন লেখকের বিখ্যাত কবিতাগুলো, আর ও পশমের জামা-কাপড় পরে সেই উষ্ণ তাপে নিজের দেহটাকে গরম করত আর কান খাড়া করে শুনত। ওর হাত নিঃশব্দে বুনে চলত পশমের কাপড়।

পাতায় পাতায় সবুজ রঙ ধরেছে, ফুল ফুটেছে অজস্র, নতুন করে সাজার মতো সেজেছে প্রকৃতি তারই ছোঁয়া লেগেছে টোনিয়ার মনের মধ্যে। ওর চেহারার মধ্যেকার খুব সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। হ্যাঁ, এক নবজাত শিশুর আসন্ন আগমন ধ্বনিত হচ্ছে। ওর কণ্ঠস্বর ইউরার স্বপ্নকে অধিকার করছে ধীরে ধীরে।

আশ্চর্য রকমের চুপ করে থাকে টোনিয়া। ও যেন নীরবে কর্তব্য করে যাচ্ছে আগন্তুকের জন্য। ওর ভারী গর্ব, ও সন্তানের জননী—জিভাগো বংশের ধারাকে ওই পুষ্ট করে চলেছে ওর শরীরের মধ্যে একান্ত গোপনে। ইউরার মনে পড়ে যায় যীশুর সেই মহামূল্যবান বাণীর কথা। মনে মনে নবজাতকের আগমনে পুলকিত হয়ে ওঠে ইউরা। কেননা, এই নবীন আগন্তুক তার ও টোনিয়ার মধ্যেকার মধুর মিলনের স্বীকৃতি।

'ইউজেনে ওনগিন' কবিতা আবৃত্তি করেও আজ আমাদের সময় যেন আরো বেঁচে যেতে লাগলো। কালকে সামডেভিয়াটভের শিল্প সম্বন্ধে মন্তব্যটা শেষে যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হোল না। ও বললে, আর্ট এমন একটা শিল্প যার মধ্য দিয়ে মানুষের বহু বিচিত্র প্রকাশনাই থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় তা নয়। আর্টের অর্থাৎ শিল্পের কোনো পরিবর্তনই হয় না। যদি হত তাহলে সেই শিল্প আর শুধু শিল্প থাকত না তার থেকেও বড়ো হয়ে উঠত।

ঠাণ্ডা লেগে গলাটায় ভীষণ একটা জ্বালা হচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হয়, আমাদের মায়ের বংশের রোগ বুঝি আমাকে আক্রমণ করেছে।

একটা কিসের যেন গন্ধ ভেসে আসছে। অদূরে টোনিয়া কাচা জামা কাপড়-গুলো ইস্ত্রি করতে ব্যস্ত। এধারে শাসা তার নকল স্লেজগাড়ি টানতে ব্যগ্র।

মাঝখানে টেবিলের সামনে বসে ইউরা ভাবছে, তাড়াতাড়ি লাইব্রেরিতে গিয়ে ভালো ভালো বইগুলো নিয়ে পড়ে ফেলব। কেননা, কদিন বাদেই বসন্ত এসে পড়বে আর তখন অকারণ ঝামেলাও বাড়বে। বিশ্রী মাথাধরা থেকে, ভালো ঘুম হচ্ছে না। ঘোলাটে স্বপ্নের মধ্যে এক নারীর কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ভেবে পেলাম না এমন গভীর, ভেজা নরম গলায় আমার পরিচিত কোন মহিলা আছে? আমার স্ত্রী টোনিয়ারও যে নয় তা আমি তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ব্যাপারটা রহস্যময়ই থেকে গেল। আমরা প্রায়ই যে সমস্ত বিষয়ই স্বপ্নে দেখি বাস্তবে ঘটে যাওয়ার সময় যার সম্পর্কে আমরা গুরুত্ব আরোপ করি না কিন্তু সেই অস্পষ্ট ঘটনাই আমাদের স্বপ্নের মধ্যে রক্ত-মাংসের রূপ পরিগ্রহ করে।

শীতকাল এসেছে। তুষার বৃষ্টিতে আকাশ, চাঁদ, তারা নিয়ে প্রকৃতিদেবী অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। আমরা "পুশকিনে"র স্কুলে পড়ার সময়কার লেখা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। দীর্ঘ চরণ লেখাকালীন তাঁর মধ্যে এইভাব ছিলো বন্ধুদের চমক লাগিয়ে দিতে হবে এবং সবার চোখে ধুলো দিতে হবে। কিন্তু ওশন ও পার্ণির অনুকরণ ছেড়ে যখন তিন "ছোট শহর", "আমার বোনের প্রতি—একটি চিঠি" অথবা "ইউডিন-কে" প্রভৃতি লেখা শুরু করলেন তাঁর সম্পূর্ণতাকে সকলে সকাল বেলার স্বচ্ছ আলোর মতই স্পষ্ট করে পেয়ে গেল। সেই বিখ্যাত আট মাত্রার ছন্দ যেন রাশিয়ার জীবনকে মেপে নেবার মাপকাঠি। পরে নেক্রাসভের তিন মাত্রা ও ডাক্টিলিক ছন্দে কথ্য ভাষার স্পন্দন, ঘরোয়া ভাষার ধ্বনিসম্পদ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

"ডাক্তার বা কৃষক" হিসাবে কাজের লোক হয়ে উঠতে চান ইউরা এবং সেই সঙ্গে মৌলিক রচনায়ও আগ্রহী। প্রত্যেক মানুষেরই জগতের মাঝে নিজেকে একজন হিসেবে দেখতে ইচ্ছে হয়—সে চায় জগতের সব কিছুই তার অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে তার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হোক। এ জিনিষটা বিকর্ষণের ফলেই সম্ভব। শিল্পী ফাউস্টেরও অগ্রগতির মূলে ছিল তাঁর আদর্শ পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। ইউরা যে একজন বিখ্যাত কেউ হয়ে উঠতে পারছেন না তার যথার্থ

কারণ আবিষ্কার করেছেন, তা হোল তৎকালীন অলংকৃত ভাষার বা বাঁধা বুলির মোহ—আদৌ যার পিছনে কল্পনা বলে কিছু নেই।

পুশকিন অলৌকিক প্রতিভার মূর্ত প্রতীক। সাদাসিধে খাটুনি, কর্তব্য ও দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতা নিয়েই তার রচনা। সমগ্র রুশ সাহিত্যের মধ্যে পুশকিন ও চেখভের শিশুর মতো রুশীয় মানসিকতা চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে ইউরার কাছে, যার মধ্যে মানবজাতির চরম উদ্দেশ্য বা আপন মোক্ষ লাভের উপায় প্রভৃতি বিরাট দার্শনিকতা নেই। এগুলি সম্বন্ধে অনুভূত হয়েও, গোগোল, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কির মতো জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা না করে তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন তৎকালীন জীবনধারায় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লেখক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থেকেছেন। তাই তো লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের রচনা ধীরে ধীরে অনুভূতি ও মাধুর্যে মধুময়, আদরণীয় হয়ে উঠেছে।

বসন্ত প্রায় এসে গেছে। প্রকৃতিদেবী নতুন সাজে সেজে উঠছে। ইউরা প্রথম বসন্তে ভারিকিনো এসেছিলেন। চতুর্দিকে সবুজের সম্ভারে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিশেষ করে মিকুলিৎসিনের বাসার তলায় টুরমার খাদে সবুজের যেন মেলা বসেছে। তার ওপর একটু পরেই ছায়াশীতল অরণ্যের ক্রোড় থেকে ভেসে এল যাদুকরী নাইটিঙ্গেলের সুমধুর স্বরলহরী। যে গানের সুরের সুরে প্রকৃতিরাজ্যে সাড়া লাগে, মানুষের মনও বিচিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এ অদ্বিতীয় পাখীর গানের সঙ্গে অন্য কোন পাখীর বুঝি কোন তুলনাই হয় না।

বসন্তকালে, সেদিনটা ছিল শ্রোভ পরবের দিন। জল কাদা বরফ গলার ভিতর দিয়ে স্লেজ চালিয়ে এক চাষী হাজির, একই কথা বার বার বলে চললো—"আমাকে বাঁচান, আমার চামড়া খারাপ।" ওষুধপত্র ও জিনিষপত্রের অভাবে ডাক্তারী প্রায় করি না তবুও তার ব্যাকুলতায় জামা খুলতে বললাম তাকে। দেখলাম তার লুপান হয়েছে। তাকের উপর কার্বলিকের বোতলটার দিকে তাকাতে গিয়ে জানালাপথে দেখলাম আর একটা স্লেজ গাড়ী। গিয়ে দেখলাম সে আমার ভাই ইয়েভগ্রাভ। বাসার সকলের প্রশ্নের উত্তর কৌশলে এড়িয়ে গেল সে, কথা বললো হেঁয়ালী করে। কিছুদিন থেকে হঠাৎ সে একেবারে উধাও হয়ে গেল কিন্তু তার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি জানতে পারলাম যদিও সেটা রহস্যময়। আমার

সংসার স্বচ্ছন্দে চলার ব্যবস্থা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিল যার ফলে টোনিয়াও সংসার দেখাশোনা করতে পারবে এবং আমি ডাক্তারী ও লেখার উভয়েরই সময় পাবো। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তরে সে শুধুই হেসেছিল। এবং সে হাসি যে অমূলক নয় তার প্রমাণও দিয়েছিলো। আমার সংসারে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। সে আমার সৎভাই, তবুও তার আকস্মিক আবিভাব আমার জীবনে শুভ ইঙ্গিতের সূচনা করলো, আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান করলো।

ইউরিটাম পাবলিক লাইব্রেরীর রীডিং রুমে বসে অলসভাবে বই নাড়াচাড়া করছিল ইউরা। রীডিংরুমে অনেকগুলি জানালা আছে, লম্বা টেবিলের সারি জানালার কাছ অবধি চলে গেছে। বসন্তকালে শহরে আলোর ব্যবস্থা না থাকায় সন্ধ্যে বেলায় লাইব্রেরী বন্ধ হয়। তাতে ইউরার বিশেষ অসুবিধা হয় না। বিকেল বেলায় সে ঘোড়ায় চেপে ভারিকিনোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ে।

লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করার আগে ইউরা কদাচিৎ ইউরিয়াটিনে আসতো। এই অচেনা শহরের স্থানীয় অধিবাসীরা ধীরে ধীরে যখন লাইব্রেরী ভরিয়ে ফেলে তখন ইউরার মনে হয় তাদের সাথে ঘর বাড়ী রাস্তাঘাটও এখানে এসে পরস্পরের সাথে আলাপ করছে। গোটা ইউরিটাম শহরকে লাইব্রেরী ঘরের বড়ো জানালা দিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

এখানে দু জাতের পাঠক আসে, অধিকাংশই বুদ্ধিজীবী, অন্যেরা একটু নিম্ন শ্রেণীর, বুদ্ধিজীবীদের বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক, একটু অপরিচ্ছন্ন, চিরকাল এরা পড়াশোনার মধ্যেই কাটিয়েছে এবং এখানে বাড়ীর মতো স্বচ্ছন্দ। সাধারণ লোকেরা দেখতে ভালো, স্বাস্থ্যবান, নিয়মকানুন সম্বন্ধে অতিরিক্ত সজাগ বলেই তারা গোলমাল করে বেশী, তাদের প্রাণবন্ত পদক্ষেপও কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে পারে না।

জানালাগুলোর উল্টোদিকে কাউন্টার করে রাখা জায়গায় আছে লাইব্রেরিয়ান ও দুজন মহিলা সহকারী—একজন খিটখিটে, পশমী শাল গায়ে, অপরজন কালো রেশমী জামা গায়ে। মনে হয় তার ফুসফুসের অসুখ আছে।

কর্মচারীটির মুখ লম্বাটে গোছের, থলথলে, কেমন যেটে ধুসর এবং সবুজের ছাপ মারা। তারা নতুন পাঠকদের নিয়মকানুন ফিসফিসিয়ে বলে ও নিঃশব্দে স্লিপ বাছাই করে বই আনে ও ফিরিয়ে নিয়ে যায়, অবসর সময়ে আবার রিপোর্টও লেখে। জানালার বাইরে শহরের বাস্তব দৃশ্য ও ঘরের ভিতরের কাল্পনিক শহরকে

দেখে ইউরার এই শহরে আসার প্রথম দিনে এই শহর সম্পর্কিত সামভেভিয়াটভের মন্তব্যগুলি মনে পড়ে গেল।

লাইব্রেরী ঘরের এক কোণে, স্থানীয় জেলা পরিষদের পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কিছু বিবরণ ও অঞ্চলের জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত কিছু বই নিয়ে বসে ছিল ইউরা। পুগাচেভ বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কিত বইটা নেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পশমী জামা পরা লাইব্রেরীয়ান, অতগুলো বই নিয়ে যাবার আইন নেই সেকথা জানিয়ে দেওয়াতে বাছাই না করা বইয়ের স্তূপেই নতুন উদ্যম নিয়ে আত্মনিয়োগ করলো ইউরা। আশেপাশের পাঠকের ভীড় তাকে এতটুকু অন্যমনস্ক করতে পারে নি। ততক্ষণে সূর্য পূর্ব থেকে দক্ষিণে এসে পড়ায় বারমেসে সর্দিওয়ালা লাইব্রেরীয়ান আলো নরম করে আনার কুঁচকোনো শাদা পর্দা টেনে দিল। শেষ জানালাটার কাছে আসার মুহূর্তেই প্রচণ্ডভাবে হাঁচি শুরু হয়ে গেল তার। দশ-বারো বার হাঁচবার পর ইউরা আন্দাজ করতে পারলো ইনি টুন্টসেভ বোনেদের একজন। ইউরা আবিষ্কার করল ঘরের ভিতর আর একজন নতুন পাঠিকাকে এবং চিনতে পারল সে আন্তিপোভা। সে সর্দিলাগা লাইব্রেরীয়ানটির সাথে কথা বলছে ফিসফিসিয়ে। কথাবার্তার ফলে লাইব্রেরিয়ানের পরিবর্তন দেখা গেল। সব সময় কাছে রাখা রুমালটা নিয়ে সে যখন আবার কাউন্টারে ফিরে গেল তখন আত্মবিশ্বাসের স্পষ্ট চিহ্ন তার মুখে চোখে। এইসব ছোটোখাটো ব্যাপারের মধ্য দিয়ে ইউরা বুঝতে পারলো শহরের প্রায় সকলেই আন্তিপোভাকে শুধু চেনেই না রীতিমত পছন্দও করে। কেননা এই ঘটনার পরে ঘরের প্রায় সকলেই লারার দিকে সমর্থনের ভঙ্গিতে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছিলো।

ইউরার ইচ্ছা হোল তৎক্ষণাৎ ওর সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে কিন্তু সে ইচ্ছেটা চেপে রেখে বরং তার দিকে পিছন ফিরে একটা বই হাতে ও অন্য একটা হাঁটুর উপর রেখে পড়ার মনোযোগ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু মন বই থেকে অনেক দূরে চলে যেতে লাগলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ ভারিকিনোর শীতের রাত্রে স্বপ্নে-দেখা পরীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো। সে স্বর লারার। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে চেয়ারে ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে লারার দিকে তাকিয়ে রইল ইউরা। ফিতে লাগানো পাতলা একটা ডোরা কাটা ব্লাউজ পরা লারা তখন বাচ্চা ছেলের মত বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে তলিয়ে গেছে। তার ডান কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে, মাঝে মাঝে চিন্তা

করার জন্য একবার মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাচ্ছে আবার নোট লিখে চলেছে ঝড়ের বেগে।

অনেকদিন আগে মেলিটজিয়াভোতে ইউরা লক্ষ্য করেছিল, এ মেয়ে অন্যকে খুশী করতে নিজেকে সুন্দর দেখাতে চায় না—এটাই তার সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। তাকে দেখে মনে হয় পড়াশোনা করাটাই যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। যে কেউ এটা করতে পারে।

এরপর ইউরা শান্ত মনে ঘণ্টাখানেক নিজের পড়াশোনা করলে, তার বইগুলো জমা দেবার সময় দেখলে লারা চলে গেছে। তার ফেরৎ দেওয়া মার্কসবাদের বইগুলো তখনও কাউণ্টারে ছিলো। অর্ডার স্লিপের লেখা তার ঠিকানা দেওয়া ছিল "মার্চেণ্ট ষ্ট্রীট, স্তম্ভ ভবনের উল্টো দিকে"। এ অদ্ভুত ঠিকানাটা ইউরা টুকে নিলো, এর কারণ জানতে গিয়ে জানতে পারলো ইউরিটানের বাসিন্দারা স্তম্ভ ভবনের কথা মনে করে বাড়ীর ঠিকানা বলে। এই স্তম্ভভবনটি ধূসর রঙের, সামনের দেওয়াল-শিল্প দেবদেবীর মূর্ত্তিতে অলংকৃত, মুখোশ, বীণা ও করতাল নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে। নাট্যশালা হিসেবে এটা বানানো হয়েছিল, এটা এখন বেচে দেওয় হয়েছে বণিক সংঘের কাছে। সেই জন্য রাস্তার নাম মার্চেণ্ট ষ্ট্রীট। এই বাড়ীর সূত্রেই সারা এলাকাটা পরিচিত।

মে মাসের প্রথম দিকে এক ঠাণ্ডা বিকেলে লাইব্রেরী থেকে ফেরার পথে লারার বাড়ী যাবার মনস্থ করলে ইউরা। পথে ধুলোর ঝড়ের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে সেই পৌরাণিক বিখ্যাত স্তম্ভ ভবনের সামনে পৌছলো যেটা ইউরা প্রথম দেখলো। বাড়ীতে ঢোকার পথ দুটো, একটা মার্চেণ্ট ষ্ট্রীটে ও অন্যটা পিছন দিকের গলিতে। না জেনে পিছন দরজা দিয়ে ঢুকতেই ঘূর্নি হাওয়া উঠলো। ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেলো উঠোন। ঘূর্নি হাওয়া থামতেই লারাকে দেখা গেল দু বালতি জল তুলে কুয়ো থেকে একটা বাঁকে ঝুলিয়ে বাঁ কাঁধে রেখেছে। চুলগুলো ধুলো থেকে রক্ষার জন্য একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা। বাড়ীর দিকে রওনা হতেই ঘূর্নি হাওয়ায় তার মাথার রুমালটা উড়ে বেড়ার ধারে চলে গেল। ইউরা দৌড়ে রুমালটা কুড়িয়ে আনতে রীতিমত অবাক হলেও মনের ভাব প্রকাশ না করে সে একটা কথাই বলল "জিভাগো!"—আপনি এখানে? আমি তার হাতের বালতিগুলো বয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলাম কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে তা এড়িয়ে গিয়ে অভিযোগ জানাল, "আপনি এ জেলায় অনেকদিন এসেছেন কিন্তু আমার সাথে এর আগে দেখা করার সময় পেলেন না?" আরও

জানাল, রীতিংরুমে আমাকে সে দেখেছে কিন্তু যেহেতু আমার দিক দিয়ে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি তাই আমাকে ডাকে নি। "চলুন, আপনাকে ভিতরের পথ দিয়ে আলো প্রবেশ করে যে বড় হলটায় সেখানে নিয়ে যাই। এখানে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, লারা বলল, কেননা বাতি ছুটো উপরে নিয়ে গিয়ে ওপরটা একটু ঠিকঠাক করতে হবে।" তার পুরানো বাড়ীর অনেক অসুবিধার কথাও বললো। ইঁদুরের অত্যাচার ভীষণ এখানে, তাদের থাকার ফাটল গর্ত বুজিয়েও রেহাই নেই। ইঁটের গাঁথুনির ফাঁকের ফাটলের মধ্যে চাবি রেখে মা ও মেয়ে কাটিয়া বেরিয়ে যায়, পরিচিত কেউ এলে ঘর খুলে এখানে বিশ্রাম করতে পারে। "এক মিনিটের মধ্যেই আপনাকে ডাকবো" বলে লারা সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। তার ডাকের জন্য অপেক্ষারত ইউরা ভাবতে লাগলো এই আশ্চর্য মেয়ের কথা। যে পড়াশোনাতে যেমন, তেমন কঠিন শারীরিক পরিশ্রমেও স্বচ্ছন্দে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যা কিছু করে সে সব কিছুর মধ্যেই এমন একটা স্বচ্ছন্দ সুষমা আছে যা শুধু তার মতো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব। "জিভাগো", ওপর থেকে ডাক ভেসে এলো, ইউরা ওপরে উঠে এলো।

অন্ধকারে খুব সাবধানে লারার হাত ধরে এগোতে লাগল ইউরা। পথের জটিলতায় অবাক হয়ে গেল ইউরা। ওকে বিস্মিত দেখে হাসল লারা, বলল, "এটা আমার নিজের বাড়ী নয়। নিজের বাড়ীটা স্থানীয় বসতি বিভাগ যখন নিয়ে নিলে তখনই এই বাড়িটায় উঠি। এই ঘরটার মালিকের সব আসবাব জমা করে রেখে দিয়েছি। কারণ অপরের জিনিস বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করতে আত্মসম্মানে বাধে।"

একটু পরেই ওরা ওদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। ঘরের জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল ইউরা। তারপর আস্তে আস্তে লারার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, বলতে লাগল ও কিভাবে এখানে এসে পৌঁচেছে।

আবেগে আর গোপন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল লারা। যখন শুনল স্ট্রেলনিকভের সঙ্গে ইউরার দেখা হয়েছে। "আপনাকে একদিন সব খুলে বলবো। কিন্তু তার আগে বলুন ওকে আপনার কেমন লেগেছে।"

ওর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে ইউরা বললো, ওঁর সম্বন্ধে এতদিন যা শুনেছি, আর সব কীর্তিকলাপের যা প্রমাণ পেয়েছি, দেখলাম সেটাই মানুষটার আসল পরিচয় নয়। সত্যিই ভাবতেও পারি নি, ভদ্রলোকের ব্যবহার এতো সুন্দর,

আর মিষ্টি।—ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝতে পেরেছি ওর ভিতরে কোথাও যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাবোধ বেঁধে আছে, যার থেকে উনি চেষ্টা করলেও মুক্তি পাচ্ছেন না কিছুতেই। আর একদিন এভাবেই তাকে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে করে পরিত্যক্ত কাপড়ের মতোই ক্ষয়ে যেতে হবে, ভয়ঙ্কর মৃত্যুবরণ করতে হবে।

—"কিন্তু এ থেকে নিস্তার পাবার কি কোন উপায় নেই?" ব্যথিত যন্ত্রণায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠল লারা। এ প্রসঙ্গ পাল্টাল ইউরা তাড়াতাড়ি। জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, সেদিনকার গোলমালের মধ্যে কি আপনি পড়েছিলেন? —উঃ, সেদিনকার কথা ভাবতেও আতঙ্কে আমার শরীর শিউরে ওঠে আবার। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে অনেক লোকের সাহায্যের সুযোগ দিয়েছিলেন। সেদিনই আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম গালিউলিনের যাকে আমি বাল্যকাল থেকেই চিনতাম।...আমি আর গালিউলিন অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছিলাম, তখনই বুঝতে পারলাম মানুষ জীবনের ক্ষেত্রে কাজের মধ্য দিয়ে পৃথক হলেও একটা কোথায় থেকে অদৃশ্য যোগসূত্রে বাঁধা।

কথা বলতে বলতেই লারার আট বছরের মেয়ে কাটিয়া এসে পড়ল। সোনালি চুল দুধারে সুন্দর করে বাঁধা, ঝলমলে দুষ্টু বুদ্ধিতে ভরা চোখ এখন বেশ চিন্তিত। সামনের এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে। লারাই মেয়ের সঙ্গে ইউরার পরিচয় করিয়ে দিল। একটু আশ্বস্ত হল কাটিয়া, এই ভদ্রলোকই তাহলে মায়ের বন্ধু যার আগমনের খবর সে মায়ের কাছে ইতিপূর্বে শুনেছে। "জানো মা, দরজা খুলতেই একটা মস্ত ইঁদুর বেরিয়ে এলো। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ছুটে পালিয়ে এলাম এঘরে।"

লারা ওকে ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ করল কিন্তু অতি নম্রস্বরে সে প্রস্তাব এড়িয়ে গেল ইউরা। অবশ্য লারার অনুরোধে আরও আধঘণ্টা থাকার প্রতিশ্রুতি দিল।

"হ্যাঁ, আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই যে ষ্ট্রেলনিকভই আমার স্বামী পাশা আন্টিপভ। হয়তো তিনি একজন সক্রিয় বিপ্লবী বলেই নিজের নাম গোপন রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু কাটিয়া ও আমি দুজনেই জানি যে এই ষ্ট্রেলনিকভ ওরফে পাশা আন্টিপভই আমার স্বামী।"

ও এখন সাইবেরিয়ায় আছে। ওর দুর্ভাগ্য যে সময় ওকে বাধ্য করেছে ওর ছেলেবেলার বন্ধু গালিউলিনের বিরুদ্ধে ওকে যুদ্ধ করার। গালিউলিনও জানে

ওঁর উদ্দেশ্য, যদিও আমি ওর মুখ থেকে এরকম কোন মন্তব্য করতে শুনিনি কোনদিন। ও যে এখানে গুলি ছুঁড়ছে সে কেবল জনতার সন্দেহের হাত থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য।

ওখানেই আর্মির হেডকোয়ার্টারে থাকত ও। ওখানেই দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে—না, না কোয়ার্টারে নয়, রেলগাড়ির একটা বগিতে।

ইউরা জিজ্ঞাসা করল, তারপর, বলুন থামবেন না।

"ওখানেই একদিন আসবার পথে আমার সঙ্গে গালিউলিনের দেখা হয়। ওখানে আমাদের নানারকম কাজের আলোচনা হয়। বর্তমানে মানুষের ধর্মই কোন আন্দোলন করা—তা সে যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, কিন্তু সত্যি বলছি আমার ভাবতেও অবাক লাগে যখন দেখি এই সব মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের প্রবৃত্তির কাছে বন্দী। এটা এক ধরণের মানসিক রোগ। বুড়োরা এবং অসুস্থ রোগীদের মধ্যে এই ধরণের মানসিক রোগ দেখা দেয়।

কিন্তু আন্টিপভ বহু গুণের অধিকারী হয়েও কি করে এইরকম এক ধরণের প্রবৃত্তির বশীভূত? ওর বাবার কাছেও ও ওর পরিচয় লুকোয়। ওর বাবাও এটা নিশ্চিন্ত মেনে নেয় বা কি করে।

ওই যে সরকারী হেডকোয়ার্টারের সামনে কতোদিন পাহারা দিতুম আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতুম এই সঙ্গে একটিবার দেখা করার জন্য। কিন্তু বেচারা মেয়ের কাছে কিছুতেই নিজের পরিচয় বলতে পারতাম না। আর সেজন্যই তার সঙ্গে দেখা হোত না কোনদিনই। কিন্তু আমি জানি সে আমাদের ভালোবাসে আর তার ভালোবাসার ধরণ সাধারণের চেয়ে একটু আলাদা। কাটিয়া ঘরে এসে ঢুকতেই ওকে বুকে টেনে নিল লারা, ওর ভেতরের আবেগটাকে দমন করার জন্য।

আস্তে আস্তে নিজেদের অজান্তেই ওরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি হয়ে পড়লো। লারার বাড়ির রাস্তা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল ইউরার। ইউরা জানে যে সে যা করছে তা তার পক্ষে মহাপাপ, তবুও সে টোনিয়াকে সব কথা জানাতে পারল না কিছুতেই।

আসলে টোনিয়ার ভালবাসাকে ইউরা পূজা করে, দেবতার মতো সম্মান করে। তাই যতোই টোনিয়া বা তার বাড়ির লোক তাকে কাছে টানতে চায় ততোই

সে অস্বস্তিতে কুঁকড়ে যায়। টোনিয়ার চোখে পড়লে জিজ্ঞাসাকে সযত্নে এড়িয়ে যায়। সব সময়ই কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকে।

সেদিন লারাকে সব কিছু বলে বিদায় চেয়েছিল। ইউরার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার খাতিরে অসহ্য বেদনা বুকে চেপেও শান্ত স্বরে লারা ওকে মুক্তির সম্মান দিয়েছিল।

চলতে চলতে আবার দাঁড়াল ইউরা, ভাবল লারার প্রতি হয়ত তার আচরণটা বড়ো নির্মম ও নিষ্ঠুর হয়ে গেছে—তার জন্য এখুনি তার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত।

না, না, তার জন্য সে আর একজন নিরপরাধ নারীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। এই তো আর কিছু দূর গেলেই উন্মুক্ত আকাশের নীচে তার সেই উষ্ণ আনন্দে ভরা আলিঙ্গন তার সব স্পর্শের মলিনতা মুছিয়ে দেবে। টোনিয়ার সরল সুন্দর, ভালোবাসায় ভরা মুখখানি ছবির মতো ভেসে উঠল।

ঘোড়াটা যাবার পথে বাধা পেয়ে একটু যেন অবাক হোল তারপরে তীব্র গতিতে ছুটে চলল সামনের দিকে পরিচিত রাস্তা ধরে।

একটা গুলির শব্দ কানে আসতেই ইউরার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে একটা ঝোপের পাশে আত্মগোপনের জন্য সচেষ্ট হোল। কিন্তু বাধা পেল, মাথাটা টুপিটা একটু হেলিয়ে বলে উঠল এক যুবক, "বার কয়েক নড়াচড়া করে—আপনার বিপদকে আরো ত্বরান্বিত ও ভয়াবহ করে তুলবেন না আবার।"

—আপনিই কি মিকুলিৎসিনের ছেলে লিবেরিয়ুস?

—মাথা নাড়ল যুবকটি। "না, আমি তার প্রধান যোগাযোগ সচিব। আমার নাম কামেনডভোরস্কি। কিন্তু আপনি ওই ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সঙ্গে চলুন। আমাদের ডাক্তারটির মৃত্যু হয়েছে গুলি লেগে, আপনাকে সেই পদ গ্রহণ করতে হবে। আচ্ছা, চলুন আমাদের সঙ্গে।'

বাধ্য হয়ে ঘোড়া থেকে নামল ইউরা, ওর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। দ্রুত নতুন ঘোড়ায় চড়ল ও। মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে তারা মিলিয়ে গেল।

দশম অধ্যায়

রাজপথ

চারদিকে বহু শাখা বিস্তৃত করে প্রধান রাস্তাটা চলেছে সামনের দিকে। সাইবেরিয়ার সব থেকে পুরোন রাজপথ এটি। অনেক দিন আগের ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহু লোকের পদশব্দে রাজপথ সর্বদা মুখরিত থাকত, তাদের শব্দ প্রতিধ্বনিত হোত দুর্ভেদ্য অরণ্য অন্ধকারে। বন্ধুতা আর বিবাহের সূত্রে শহর আর গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এখন ইঞ্জিন আর লাইন তৈরীর কারখানা আছে, সেখানে বহু কর্মীর সঙ্গে বাস করে সশস্ত্র বিপ্লবের অপরাধে নির্বাসিত আসামীরা।

একটা খাড়াই পর্বতের ওপরে উঠে গেছে রাস্তাটা। মঠের বাগানের কাছ দিয়ে ঘুরে গিয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। মঠের মধ্যে ঢুকেছে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। ঘণ্টা বাজাতে গিয়ে নিচের দিকে তাকালো ওরা—সমস্ত শহর, বাড়ি আর ছোট মানুষগুলো দেখে রীতিমত কৌতুকবোধ করল ওরা। লক্ষ্য করল, নীচের শহরের দেওয়ালগুলোতে ছেলেদের সৈন্যদলে ভর্তি হবার বিজ্ঞাপনে ভরে গেছে কোলচাকের নির্দেশ—চোখমাত্রর মঠের খিলান দেওয়া দরজার ওপরে লেখা যীশুর বাণীর ওপরে চোখ রাখল।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। এক পবিত্র দিন খৃষ্টানদের কাছে। সমস্ত শহরটা কিন্তু নিস্তব্ধ ছিল না। নানারকম গোলমাল আর চেঁচামেচির আওয়াজ রাত্রের নিস্তব্ধতাকে থেকে থেকে করছিল চমকিত।

ধীরে ধীরে মঠের গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হয়ে দূর প্রান্তে মিলিয়ে গেল, গীর্জার লোকেরা প্রভাতী প্রার্থনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হোল।

দ্রুত পা চালাতে গিয়ে টলতে লাগলো মুদি-বৌ গালুজিনার। তার ছেলে টেনিয়শকাও যে পড়ছে, সেনাদলের বয়সের এই নতুন নিয়মের আওতায়। ও চলেছে ঈশ্বরের কাছে তাই ছেলের—মুক্তির প্রার্থনায়। বাড়ীর কাছে এসে পড়লেও

এতো তাড়াতাড়ি ঢুকতে ইচ্ছা করল না ওর, সব কিছু বলতে চাইলেও আজ সে কিছুই বলতে পারছে না—এই চিন্তাটাই তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

মেয়ে অবশ্য ঠিক নিজের নয় সতীনের সন্তান, তার ব্যবহারে সে একেই অতিষ্ঠ, তার ওপর নিজের স্বামী ভলাসও তাকে বঞ্চিত করেছে। একমাত্র ছেলেটার কোন খোঁজই রাখেন না। আর ছেলে সে তো বেচারী ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসে মনমরা হয়ে গ্রামে গেছে ভবিষ্যতের আশঙ্কার হাত থেকে অন্তত ক্ষণেকের জন্যও নিস্তারের জন্য।

প্রায় এসে গেছে, কিন্তু ওদের টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না। কিরকম যেন একা আর নিঃসঙ্গ লাগে ওর। ছোটবেলায় সে আর তার দুই বোন মনের সুখে উল বুনত আর হেসে খেলে ঘুরে বেড়াত। বাবা ছিলেন ঠিকাদার—কিন্তু সংসারে তাদের কোন অভাব ছিল না। ছিল না বাণিগায় ভালো ও ভদ্র সুরুচিসম্পন্ন যুবকেরা। এখন তো ইতর লোকের সংখ্যাই বেশী। হাসি পায় গালুজিনার যখন ভাবে যে ভলাস মিথ্যেই কতকগুলো আড়ম্বর করে পুরনো দিনের আনন্দকে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। গালুজিনা জানে যে আনন্দ আছে মানুষের মধ্যে, তার জন্য চাই মনের শান্তি, যৌবনের উদ্যম।

পার্ক ছাড়িয়ে সামনে যে বাজারটা পড়ে, তারও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সারি সারি দোকান আছে যেখানে, মোমবাতির কারখানা এখন সে সব জায়গা জুড়ে বসেছে ঐখানেই দোকান গালুজিনের, চারধারের লোক অত্যধিক চা-পানের জন্য ভরে থাকত চা-খানায়। ছেলে বয়স থেকে বেগুনি রং ও ভালোবাসত, তাই মাঝে মধ্যে ক্যাশবাক্সে গিয়ে বসত—যেখানে সারি সারি বেগুনি রঙের বয়াম সাজান থাকত, বিভিন্ন দ্রব্য আড়াল করে।

এর পাশেই শমুলেভিচের সেলাইয়ের দোকান। নীচে ওষুধের দোকান আর বাঁ দিকে এ্যাটর্নির অফিস। বাড়িটা দোতলা—কিন্তু ভীষণ ভাঙ্গা চোরা। নানাধরণের ভাড়াটে থাকে ওপরে, এপাশে আবার একটা ফোটোগ্রাফারের ফোটোর দোকান। ছাইরঙা বাড়টার পাশ দিয়ে যেতে নাক কুঁচকালো গালুজিনা; যতো নোংরা ভিখিরিদের ভিড়।

শহরের লোকেদের থেকে গ্রামের লোকেরা অনেক স্বাচ্ছন্দের মধ্যে বাস করে। আহার ও বাসস্থানের জন্য কোন ভাবনাও ভাবতে হয় না তাদের। কোলচাক

এজন্য গ্রামের লোকেদের খুব যোগাযোগ রয়েছে—কমিশারও চায় যে তারা আবশ্যক সৈন্যদলে যোগ দিক। যাই হোক গালুজিনা ভাবলো এবার বাড়ী ফেরা উচিত তার। বাড়ীতে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার আগে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যারা খোভাটস্কে য়েতে কর্তাগিরি ফলাচ্ছে তাদের কথা মনে হল। তাদের চরিত্রের আদ্যোপান্ত তার কাছে জানা। ধূর্ত সব নতুন কিছু গণ্ডগোল পাকানোর জন্য সর্বদা উদগ্রীব। সারাজীবন যন্ত্র নিয়ে কাটাতে গিয়ে নিজেরা যন্ত্রের মতোই ঠাণ্ডা ও নির্দয় হয়ে উঠেছে। তারপর তার নিজের কথা মনে হোল। সাদাসিধে সরল যুবতী স্ত্রীলোক সে। সব মিলিয়ে মানুষ হিসেবে মন্দ নয়। কিন্তু তার সমস্ত গুণই এ সৃষ্টিছাড়া জায়গায় ব্যর্থ হয়ে গেছে। বোকা বুড়ি সেনটেটিউরিয়ার সম্বন্ধে অশ্লীল গানটার কথা মনে পড়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

বাড়ী ফিরে এসে সে কোটটা খুলতে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য বেদনায় চীৎকার করে উঠল তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। পিঠের পাশের ব্যথাটা যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল, জামার হুক আবার পিছলে গিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল।

ছুটে এল কাশিযুশা, ওকে সাহায্য করতে। কিন্তু ক্ষেপে গেল গালুজিনা. যত রাগ গিয়ে পড়ল দর্জির ওপরে। এর পর সেই ব্যথাটা উঠল অমনি ডাক্তারকে একটা গালাগালি দিয়ে উঠল। গালাগাল দিলে হাঙ্গেরিয়ান ডাক্তারকে, ওখানের উপরেই ও আজ ক্ষেপে উঠেছে। সকলেই যেন ওর শত্রু। ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে কাশিযুশা বললে, "তাহলে কি সেই স্ত্রীলোকটিকে ডেকে আনব যে তোমাকে আগের বারে অসুখের সময় সাহায্য করেছিল।" খেঁকিয়ে উঠল গালুজিনা, বলল, সে তো এখানেই নেই। ভলাস, টেনিয়সকা আর তোমার পালিয়া মাসী সকলেই পালিয়েছে। এখন তুমি ও আমি পড়ে আছি। শুনলাম সাইবেরিয়ায় নাকি এক নামজাদা ডাক্তার এসেছে যার বাবা নাকি কোন এক কারণে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু সকলে ইউরিয়াটিনের এই ডাক্তারকে ভালবাসত, আর ঐ ছাত্র রাজিল—উহু, অত লাল হয়ে যেও না, সারা রাত ধরে কি যে চেঁচাচ্ছে—উঃ, কি বিশ্রী, বিশ্রী।

লিভচকা, একটু চুপ কর—স্যর উষ্টিন, সিভেরুস্থি আর তুমি এখানে থাক। আমি দেখে আসি ব্যাপারটা কি ?

লিভ্‌চকা কেন্দ্রীয় সামরিক প্রতিনিধি, শুনতে পায় নি তাকে চুপ করতে বলা হচ্ছে, সে একটানা বকেই যেতে লাগলো। ও চুপ করতেই আর একজন নেতা তাকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

চারধারে আগুন জ্বালিয়ে শেডের মাঝখানে সকলে মিলে এক গোপন আলোচনায় বসেছে। ওপর হাতে সিগারেট, মাথায় কালো টুপি, গায়ের জলপাই রং খাবে ভিজে অন্য রং ধারণ করেছে। সামনে একটা কাগজ দেখে ক্লান্ত গলায় বলছে, "দরিদ্র মানুষেরা চিরকালই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এসেছে। এখনও তাই মদোন্মত্ত ঐ অফিসার ও ভাড়াটে কসাকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ সংগ্রামের আয়ু দীর্ঘ হলেও ভয় পাওয়া চলবে না।' সামনের সারিতে বসে থাকা মানুষদের মধ্যে একজন উঠে ওকে থামিয়ে দিল। ওর উদ্ধত ব্যবহার ওপর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতাই প্রমাণ করে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওরই সমবয়স্ক আরও দুজন কিশোর নীরবে ওকে সমর্থন জানাল।

"মাননীয় অতিথিরা অর্থাৎ ১৯০৫ সালের বিপ্লবীরা"—একজন হলেন, টিভেরজিন অন্যজন বুড়ো আন্টিপভ বসে আছেন চেয়ারে। বিপ্লবের ছোঁয়া তাঁদেরও মনে। রুশীয় নৈরাজ্যবাদের অন্যতম স্তম্ভ ভডোভিচেঙ্কোও এসেছেন। ওর বিশালকায় চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ওর পাশেই বসা মূর্খ সভেরিডের পরণে চাষীর পোষাক। ময়লা শার্টের ফাঁক থেকে ক্রুশটা দেখা যাচ্ছে, বয়সের তুলনায় অত্যধিক বুড়ো মনে হয়। নির্বিকারভাবে বক্তা নিজের কথা বলেই চলল, শ্রোতারাও তদনুরূপ ঔদাসীন্যে ভরপুর। মিকুলিৎসিনের ছেলে লিবেরিয়ুসও এসেছে, মাঝে মাঝে তার বৈপ্লবিক মনোভাব দর্শনে শ্রোতারা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠছে। ভডোভিচেঙ্কো যখন কেন্দ্রীয় সমিতির মতামতকে সমর্থন জানালেন একটা গুন গুন শব্দ উঠল শ্রোতাদের মধ্যে। আস্তে আস্তে সেটা যখন বাতাসে ডুব দিল তখন কষ্টয়এড-এর গলা শোনা গেল। তিনি বললেন, অবিলম্বে প্রাদেশিক সমিতির সীমার ভিতর যতগুলো সক্রিয় সমবায় আছে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত। যদি আমরা পৃথক সমাজের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে দীর্ঘায়ু করতে চাই। সমবায়গুলিকে জানাতে হবে আমাদের বিপ্লবে সাহায্যের মূল উৎস কোথায়, তাদের বিদ্রোহ যাতে বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য চিন্তা করে সব কিছু ব্যবস্থা করা উচিত। —"আমি আপনার মত মানতে পারি না'—প্রতিবাদ করে উঠল লিবেরিয়ুস। ক্ষেপে গেল টিভেরজিন, যদিও কষ্টয়এড মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকাল। আমাকে একটা কথা বলতে দিন, দৃঢ়স্বরে বলে উঠল

টিভেরজিন—আপনার মতও আমি মানতে পারি না, কমরেড, ১৯০৫ সালে বিপ্লবে যে সব শ্রমিকেরা কাজ করছে আমার বিশ্বাস তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে।

—তুমি ঠিক বলেছ, ভডো।ভচস্কো বলে উঠল। এই কারণেই এই ভুল করার জন্যই জ্যাকোবিন ডিক্টেটরশিপ ধ্বংস হয়েছিল। সবার মধ্যে বাদানুবাদ চলতে লাগল কিন্তু কেউ নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না। এদিকে দিনের আলো নিভে এল।

নদী পাজ্জিনস্কা হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে দুরন্ত গতিতে। ওর দুই তীরে অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করে কুটেইনি পোসাড আর মলিইয়ের কোলে। যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছে আজ তাদের বুকেও।

ঈষ্টার সপ্তাহ বড দেরী করে এসেছে এবারে। কুটেইনি গ্রামের লোকেরা ঈষ্টারের পরবের সম্বর্ধনার জন্য সব সঙ্গতি উজাড করেছে। গরম সুস্বাদু খাবার টেবিল জুড়ে আছে। যুবকেরা পরেছে সোনালী আর ফিকে নীল শার্ট প্যান্ট, ঐ রঙে নিজেদের সাজিয়েছে মেয়েরাও।

ভলাস গালুজিন রাজপথের উপর দিয়ে ছুটে এল পাফনুটনির বাডী। এসেই বক্তৃতা শুরু করে দিল। 'বৎসগণ, আজ যেমন আনন্দ আমাদের এক পবিত্র জগতের সন্ধান দিচ্ছে তেমনি ঐ দুর্বৃত্ত বলশেভিকেরা যারা নাকি বৈদেশিক মুদ্রার দাম আমাদের টেনে আনছে পাশবিক জগতে। আত্মার অপমান ঘটাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য আমাদের প্রবল প্রতিরোধ করতে হবে।"

শ্যাম্পেনের অভাবে ভদ্‌কাই খেতে লাগল সবাই। সকলকে বিশেষ করে গস্কারিয়াবিক খুব প্রশংসা করতে লাগল ভলাসের, ওর শেষ কথায় কিন্তু ক্ষেপে গেল টেরিয়স্কা।—"তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত, স্কুল থেকে বিতাড়িত আমাকে সেনাবাহিনী থেকেও ছাড়িয়ে নিয়ে আমার বাবা নির্বোধের কাজ করবেন না। আচ্ছা, সাস্কা পাফনুটকিনের কথা শুনেছো? তুমি কিন্তু ওর থেকে সাবধান হয়ো, বেচারী ভারী কষ্ট পাচ্ছে। চুপ, চুপ গস্কা, আমি বুঝতে পারছি তোমার কথা, এক ঘুষিতে তোমার নাক ফাটিয়ে দেবো"

অত রেগে যাচ্ছ কেন টেরিয়স্কা? ঈষ্টার পরবের সময় এক ভদ্রলোক এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে। লোকটা প্রতিভাধর, ব্যক্তিত্বের মুক্তিলাভ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন—যৌন-ব্যাপার, চরিত্র এসব যেন

মানুষের জান্তব বিদ্যুৎশক্তিরই প্রকাশ। ওদের কথাবার্তা হঠাৎ থেমে গেল, একটা প্রচণ্ড শব্দ এসে ছিটকে পড়লো ঘরের মধ্যে। ঘরের শান্তি বিঘ্নিত হোল। ভীষণ রেগে উঠে আততায়ীর উদ্দেশ্যে খুঁজে দেখতে শুরু করে দিলেন।

ইয়েরমোলে ডিষ্ট্রিক্ট হল থেকে কালো পেঁচানো ধোঁয়া উঠতে লাগলো দ্রুত আরদূর ওপরের আকাশে। ব্যাপারটা জানার জন্য সকলে খাদের দিকে ছুটে গেল। নদীর ওপরদিকে তাকালো সবাই। দূরে গীর্জা থেকে বিপদের ঘণ্টা ঢং ঢং করে একটানা বেজে চলল।

সন্ধ্যাবেলায় কর্নেল যখন কসাকদের নিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলল তখন ছুটে পালাল কয়েকজন ছোকরা। টেরেন্টিও ও গস্কাও বাদ গেল না। তাড়াতাড়ি তারা গোলাবাড়ীটা সামনে পেল। তার উঠোন পেরিয়ে সুড়ঙ্গ পথে নেমে গেল নীচে। ওদের এইরকম লুকোচুরি খেলাতে বিপদ এল আরও ঘনিয়ে, সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হল। নীচের এই ঘরটায় অনেকেই ভয়ে জড়াজড়ি করে কুঁকড়ে বসে আছে। অদূরে মাতালেরা শুয়ে আছে, ইয়ারমোল থেকে কসকাও এসেছে। গস্কা লুকিয়েছে ঠিকই ওর আত্মীয়ের—ঘোড়াটম্মোয়ের রেল ষ্টেশনের কর্মচারী তার জন্য ··উঃ, কি গন্ধ . পাস্কিনস্ক থেকে কারা এসেছে? বুঝতে পেরেছি সাস্কাই আরম্ভ করেছে....সাস্কা, পাফনুটকিন সেদিন যা অফিসে কাণ্ড করেছিল; ওর উদ্ধত আচরণ রীতমত অসম্মানকর ও আইনবিরুদ্ধ। অবশ্য সুবিধা হয়েছিল আমাদেরই, আমরা এই সুযোগে পালিয়েছিলাম কিন্তু বোমাটা কে ছুঁড়ল? তা আমি কেমন করে জানব? মনে হয় কোন রাজনৈতিক দলের কাজ যারা পাস্কিনস্ক থেকে এসেছে ...” চুপ, একটি কথাও নয়। ওখানে কার গল্প শোনা যাচ্ছে না, আমি স্পষ্ট শুনেছি কি বলছ? বলেনি কেউ। তোমাদের কাউকে বিশ্বাস করি না। এই বাড়িটার প্রতিটা অগ্নিসন্ধি তন্ন তন্ন করে খোঁজ। পাফনুটনি, রিয়াবিক আর নেভালেনিখ-কে আমরা চাই-ই সেই সঙ্গে চাই গালুজিনার শয়তান বাচ্চাটাকেও, আমি জানি ওরা এখানে থাকে। সব কটাকে মেরে ফেলব।

ওরা চলে যেতেই খুব ধীর গলায় গালুজিন বললে এখন আমাদের আর শহরে থাকা নিরাপদ নয়, বনের হিংস্র জানোয়ারের কাছে এখন আমাদের বাসা নিতে হবে।

একাদশ অধ্যায়

আরণ্যক ভ্রাতৃত্ব

দেখতে দেখতে দু বছর কেটে গেল। মানুষ হিসেবে সে হয়ত এ পরাধীনতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ভেতরের মনটা থেকে থেকে বিদ্রোহ করে। যখন মিকুলিৎসিন তার নিজের ঘরে জোর করে ইউরার বিছানা পাতে।

চাষীরা যখন দল বেঁধে রাস্তার উপর দিয়ে যায় তখন দু ধারের গ্রামটা কেমন যেন কুঁকড়ে যায়। একদিন পাজিনস্ক শহরে—ইউরাকে যেতে হল এক ডাক্তারখানায় ওষুধপত্র আনার জন্য। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রকৃতির মতই ইউরার মেজাজ ছিল নিস্তব্ধ বিষণ্নতায় মাখানো। সমস্ত রাস্তাটা জলে কাদায় চট্‌চটে হয়ে উঠেছে তবুও ইউরাকে যেতে হবে।

আপন মনে পথ হাঁটছিলো ইউরা, বুঝতেও পারেনি এক স্ত্রীলোক পাশ থেকে তাকে দেখছে। ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠল যাত্রীবোঝাই মালগাড়ীর ছবি। ভেসে উঠল ভাসিয়ার মুখ, ভেরেনিউকের শাসন মাখানো চাউনি। "নমস্কার'—ওধার থেকে চীৎকার করে উঠল, টিয়াগুলোভা। ইউরা জিজ্ঞাসা করলো ভাসিয়ার কথা। পেলাগিয়া বলল, ভাসিয়া ভেরেটেন্নিকি শহরে মায়ের সঙ্গে কিছুদিন কাটালেও গ্রামের লোকেদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্রশ শহরে অন্না গালুজিনের কাছে চলে গেছে। প্রিটুলিয়েভের খোঁজেই টিয়াগুলোভা এসেছে পাজিনস্ক শহরে।

ওষুধগুলো ঠেলাগাড়ীতে তুলে ইউরা যখন বাড়ীর দিকে ফিরলো তখন বেলা আর নেই। অস্তরবির গাঢ় সোনালী আলোয় রাস্তার লোকেরাও সোনালী হয়ে উঠেছে। কদিন ভীষণ কাজ করতে হয়েছে ইউরাকে। একদল সুস্থ হলে দ্বিতীয় দল আসে। টাইফাস রোগ সমস্ত শীতের শহরকে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করেছে। ওর এখন দুজন সহকারী কেরোমিলায়োস অন্য জন আঞ্জেলার, যে কিছুটা ডাক্তারী জানে।

একবার সাদাদের আক্রমণের সামনে পড়তে হয়েছিল ইউরাকে। তার পাশে ছিল টেলিফোন অপারেটার। শত্রুরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক

শ্রেণীর ছাত্র, অতএব বয়স খুবই কম। অমন বিপদের সময়েও ওদের দেখে ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ওদের বড় আপন বলে বোধ হল। এমন ধরণের বেপরোয়া আনন্দের উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলো ওরা। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে তারা সোজা একরোখা ভঙ্গিতে আসছিল। লুকানোর সময় ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওরা দুঃসাহস দেখাচ্ছিল।

পার্টিজানরা গুলি চালাচ্ছিল যদিও গোলা-বারুদ কম ছিল। নিরস্ত্র অবস্থায় মাঠে শুয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল ইউরা। ঈশ্বর তুমি ওদের জয় এনে দাও। এই বালক বীরেরা যেন তার আত্মীয়—যেন তারই মানস মনের প্রতিচ্ছবি। ওদের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়ানোও যাচ্ছিল না। আবার পালিয়ে যাওয়াটা পছন্দ হচ্ছিল না। চতুর্দিকে মরণযুদ্ধ চলছে। ইউরার পাশে টেলিফোন অপারেটরটি গুলি লেগে কাতরে উঠে যখন নিথর হয়ে গেল, গুঁড়ি মেরে তার কাছে গিয়ে, তার কার্তুজ আঁটা কোমরবন্ধ ও রাইফেল নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল সে। ছোকরাদের বীরত্বে মুগ্ধ ইউরা মরাগাছটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। সেই মুহূর্তে যখন মানুষগুলোকে তাকের সামনে দেখা যাচ্ছিল না। কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও তার গুলিতে দুজন আহত হলো ও একজন মড়ার মতো পড়ে গেল। আক্রমণ নিষ্ফল বুঝে সাদাদের কমাণ্ডার পশ্চাদপসরণ করলো। সংখ্যায় অল্প পার্টিজানরাও আর ধাওয়া করলো না।

বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় ইউরা ও সহকর্মী আঞ্জেলার আহতদের সেবায় ব্যস্ত। ইউরা ঝুঁকে পড়েছে টেলিফোন চালকের উপর। পরীক্ষায় জানা গেল সে মৃত। তার গলায় রেশমী সুতো বাঁধা একটা কবচে এক টুকরো কাগজ একফালি কাপড়ের সঙ্গে সেলাই করা ছিল। তাতে নবতিতম স্তোত্র থেকে ধর্মীয় উদ্ধৃত তোলা। শ্লাভ ভাষা থেকে রুশ ভাষায় তা অনুলিখিত। এই শ্লোকের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে লোকের বিশ্বাস। সৈন্যরা এবং কয়েক দশক পরের বন্দীরা এটাকে রক্ষা-কবচ মনে করে। এর পর ইউরা সাদা রক্ষীদলের নিহত যুবকটির দিকে এগুলেন। তার কোটের লাইনিং-এ সুতো দিয়ে লেখা আছে সেরিওজা রান্টসেভিচ্। শার্টের বুক খুলতে দেখা গেল একটা ক্রুশ। তার সঙ্গে একটা লকেট ও ছোট্ট চ্যাপ্টা সোনার বাক্সও পাওয়া গেল। তার ভিতরকার কাগজটা খুলে ইউরা তো হতবাক—সেই এক নবতিতম স্তোত্র! কেবল এখানে অবিকৃত শ্লাভ উদ্ধৃত বজায় রয়েছে। হঠাৎ সেরিওজা নড়ে উঠল। পরীক্ষায়

জানা গেল সে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য মৃত টেলিফোন চালকের পোষাক পরিয়ে শুশ্রূষা করবার পর সুস্থ হলে তাকে ছেড়ে দিল ইউরা। যদিও সে জানিয়েছিল ফিরে গিয়ে কোলচাকের বাহিনীতে যোগ দিয়ে লালদের সঙ্গে লড়বে।

হেমন্তকালে পার্টিজানেরা "শেয়াল ঝোপে" আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গলে ভরা পাহাড়, তিন দিকে ছুটে চলেছে প্রখর জলস্রোত। গত শীতকালটা সাদারা এখানে কাটিয়েছিল। তাদের তৈরী পরিখা আর যোগাযোগের খাত এখন এরা ব্যবহার করছে। একই ট্রেঞ্চে ভাগাভাগি করে রয়েছে লিবেরিয়ুস ও ইউরা। ফলে ইউরা দুরন্ত নিদ্রাহীন। অনবরত বলে চলেছে লিবেরিয়ুস—"আমার বাবা এই মুহূর্তে কি করছেন, তার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?" এসব প্রশ্নের উত্তর এড়াবার জন্য বিফল চেষ্টা করে ইউরা জানাল, রাশিয়ার বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ীদের মধ্যে তার বাবা একজন। কিন্তু আপনি এত কোকেন খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। আপনার—অপ্রিয় প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিল ইউরা। কিন্তু লিবেরিয়ুস উল্টে ইউরার সমাজচেতনাকে নিঃসাড় বলে অভিযুক্ত করল। শিক্ষাচক্রে তারা যে সমস্ত কাজ করেছে তা জানতে উপদেশ দিল ইউরাকে। —শিক্ষাচক্রে আপনাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে সত্যিকার সামাজিক উন্নয়ন কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি। জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কথা মানুষের মুখে শুনলে আমি যেন ধৈর্য হারিয়ে হতাশাদীপ্ত হয়ে পড়ি—ইউরা বলল। লিবেরিয়ুস বলে চলল—"আপনার বিপদের কারণ আমি জানি, আপনি ভাবছেন আমরা হেরে যাচ্ছি, কিন্তু শুনে রাখুন আমরা জিতবোই শেষ পর্যন্ত। অতএব মনে স্ফূর্তি আনুন।" বিরক্ত ইউরা নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালো। "তুমি রেগে যাচ্ছো জুপিটার, স্পষ্ট হচ্ছে তাহলে তোমার ভুল," বলল লিবেরিয়ুস। বিরক্ত ইউরা জবাব দিল, "ঘাট হয়েছে আমার, আমি স্বীকার করছি আপনারাই রাশিয়ার মুক্তিদাতা, তার জ্যোতি, তবুও আপনাদের জন্য আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি ভালবাসি আমার স্ত্রী-পুত্র-বাড়ীঘর"। লিবেরিয়ুস কথা বলল, "ভারিকিনোতে এক অজ্ঞাত রহস্যময় বাহিনী খুন-জখম, লুটপাট চালাচ্ছে, আচ্ছা তাদের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"

আঃ, অসহ্য, আচ্ছা আপনি তো সৈনিকদের কাছে নিজেকে দয়ালু বলে প্রচার করেন, আমাকে ছেড়ে দিন না, আর তার যদি উপায় না থাকে দয়া করে আমাকে

একটু একলা থাকতে দিন"—বিরক্ত ইউরা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু লিবেরিয়ুসের থামার লক্ষণ দেখা গেল না, বালিশে মুখ গুঁজে ইউরা তার কথা যাতে কানে না আসে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। তার মনে পড়ে যেতে লাগলো অভাগী টোনিয়ার কথা, চলে আসার সময় যে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। আজও ইউরা জানে না সে সন্তান পুত্র না কন্যা।

ওঃ অসহ্য! কোকেনখোরটা সমানে বকে চলেছে, আমার মনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আমি হয়তো ওকে খুন করে ফেলব, বিরক্ত ইউরা মনে মনে আওড়াতে লাগলো।

সোনালী হেমন্তের দিন। শেয়াল ঝোপের পশ্চিম প্রান্তে হাঙ্গেরীয় সহকারী লায়োসের জন্য অপেক্ষারত ইউরা, পায়চারী করতে করতে সাদাদের তৈরী নিশান ঘরের চূড়োয় উঠে এল। কামানের নল বসানোর জন্য কাঠের দেওয়ালের গোল গর্তের মধ্য দিয়ে ইউরা স্পষ্ট দেখতে পেল বনভূমির ওপরে, দেবদারু, সরল আর পাতাঝরা গাছগুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট রেখায় হেমন্তঋতুকে কোন দক্ষ শিল্পী যেন এঁকে রেখেছে। চাকার দাগ আঁকা বনভূমির পথের উপরকার, পরিখার ভেতরকার ও ইউরার পায়ের তলার মাটি কঠিন বরফে ঢাকা, বাতাসে মিশে রয়েছে শুকনো উইলো পাত, খড়কুটো ও স্যাঁতসেঁতে মাটির মিষ্টি ঘ্রাণ

লায়োসের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো ইউরার। তারপর তিনটে অত্যন্ত জরুরী কাজের উল্লেখ করলো। (১) ভদকা চোলাইকারীদের কোর্ট মার্শাল হবে (২) নতুন করে সমস্ত ওষুধপত্রের হিসাব নিয়ে ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স গড়ে তুলতে হবে (৩) যুদ্ধক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাবিষয়ক প্রস্তাব আলোচনা, কেননা এই আধুনিক উন্মাদরোগ সংক্রামক।

"কথাগুলো খুবই ভালো, কিন্তু ক্যাম্পে অসন্তোষ জাগার ফলে অবস্থা ভদকা চোলাইকারীদের অনুকূলে, তাছাড়া সাদাদের এলাকা থেকে পলায়নপর নারী, বৃদ্ধা ও শিশুদের একটা কনভয় আসছে তার আগে পার্টিজানদের অনেকেই ক্যাম্প ছাড়তে রাজী হবে না।

"তা জানি। সে জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

"জয়েন্ট কমাণ্ড নির্বাচনে লিবেরিয়ুসই তো সম্ভবপর প্রার্থী। কিন্তু আমাদের মনোভাব বিরোধী কেউ ভ্‌ডোভিচেঙ্কোর নাম তুলেছে—তাদের মধ্যে কেউ

দোকানদারের ছেলে, কেউ কৃষাক পরিবারের, কেউবা আবার কোলচাক বাহিনী-ত্যাগকারী। শাস্ত্রী বিচারে এদের কি হবে মনে হয়?"

"প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে মনে হয়, কিন্তু পরে সেটা স্থগিত রাখা হবে।"

"আপনার উল্লিখিত মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, পাম্‌ফিল পালিখ বলে একজন সৈন্য আছে ক্যাম্পে। তার বৈপ্লবিক চেতনা চরমসুরে বাঁধা হলেও শ্রেণীচেতনা আছে তার। পরিবারের জন্য উদ্বেগ ও নিজস্ব কার্যকলাপের জন্য সাদাদের শাস্তির ভয়ই তার রোগের কারণ, তাকে পরীক্ষা করা দরকার।"

"বাহিনীর মন্ত্রণাসভায় পালিখকে আমি দেখেছি। কালো নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষটাতো অপরকে শাস্তি দিতে বা গুলি করতে অত্যুৎসাহী। ওকে আমার ভালো লাগে না। তাহলেও তোমার কথায় ওকে আমি পরীক্ষা করব।

যাবার সময় হলো। সবাই গোছগাছে ব্যস্ত। একা ইউরা দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে আত্মমগ্ন, তাঁর কান ভরে আছে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম শব্দের সুরতান। তাঁর মন চলে গেছে বহুদূরের স্মৃতির পরপারে। মাঠটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কিছুদিন পূর্বের একটি সভার কথা। বনের শেষপ্রান্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। প্রধান জনসংযোগ অধিকর্তা কামেনোড্‌ভাস্কি যাবার আগে তাঁর অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। দিনশেষের রাঙা আলোয় ইউরার টুকরো অনুভূতিগুলো লারার কথা মনে পড়িয়ে দিলো, কামেনোড্‌ভস্কি ডাক্তারী বিভাগের যাত্রার নির্দেশলিখিত পত্রটি ইওয়াকে দিলেন। সেটা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, লোকজনের তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা খুবই কম। অধিকর্তা কামেনোড্‌ভস্কি জানালেন এক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়। তারপর পালিখকে একটু দেখার জন্য অনুরোধ করলেন। যোদ্ধদলের একাংশের নেতা পামফিল পালিখকে বার্চগাছের ঝাড়ের কাছে কমাণ্ডারদের তাঁবুতে পাওয়া যাবে একথাও জানালেন। দু'রাত অনিদ্র ইউরার শরীর ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন। অস্তরবির রঙিণ আলোকের বনভূমির সৌন্দর্যে মুগ্ধ শান্ত ইউরা একটা গাছের তলায় শোয়ামাত্রই ঘুমে দুচোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল। আধো ঘুম, আধো জাগরণের আলো-আঁধারিতে ইউরার চেতনায় লিবেরিয়ুসের চিন্তা ঘুরপাক খেল কিছুক্ষণ। পাইনের বাদামী বাকলে বাদামী ছিটওয়ালা ছোট্ট প্রজাপতির লুকিয়ে পড়া দেখে, শিল্পচেতনা সৌন্দর্যবোধ, অভিযোজন প্রভৃতি নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমের গভীরতায় ডুবে গেল সে।

চাপা গলার ফিস্‌ফিসানিতে ঘুম ভেঙে গেল ইউরার। কারো কারো কণ্ঠ-

স্বর চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এ তো গঙ্কা, সাক্বা, কসকা ও সাকরেদ গালুজিন। কিসের যেন ষড়যন্ত্র চলছে মনে হচ্ছে। এ কি! আবার সিভোর্‌স্থিও আছে, সে তো দলপতির গুপ্তচর!" কেউ দেখতে পায়নি ইউরাকে। কিছুক্ষণ পর ওরা চলে গেল। ইউরা বুঝতে পারলে লিবেরিয়ুসের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। মনস্থ করলে এক্ষুনি কামেনোডভস্কিকে সব জানাবে. লিবেরিয়ুসকেও সাবধান করতে হবে। লিবেরিয়ুসের ওপর এখন বিরক্তিভাবটা উবে গেছে।

ফিরে গিয়ে ইউরা শুধু কামেনোডভস্কির সহকারীকে আগুনের ধারে বসে থাকতে দেখলো। ভুক্রিয়াটা শেষ পর্যন্ত ঘটেনি। ব্যাপারটা জানাজানির ফলে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সহকারী গুপ্তচর ছিল সিভোর্‌স্থি। সীমাহীন বিরক্তিতে ইউরার মন ভরে উঠল।

যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। পালিখ অনেকগুলি কাঁচ বার্চগাছ কেটে এনেছে তাঁবুর ছাদের বর্গা বানানোর জন্য। তার বৌ আসবে ছেলেমেয়ে নিয়ে। ইউরা জানাল ক্যাম্পে পালিখের পরিবারবর্গ থাকার অনুমতি পাবে না মনে হয়। তারপর তার শারীরিক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল তাঁবুর ভিতর না গিয়ে বাইরে কথাবার্তা চলছিল। পামফিল তার জীবন কাহিনী শোনাচ্ছে। পামফিল মাঠে খাটত তার বৌ থাকত ঘরে। ছেলেমেয়ে হল। কিছুদিন বাদে যুদ্ধের সময় তাকে পল্টনের সেপাই হিসেবে নিয়ে গেল। ওভাবে তার নির্দোষ ছেলেমেয়ে, বৌকে শত্রুরা হয় তো অত্যাচার করবে। তাইতে ও রাত্রে ঘুমোতে পারে না, এ ছাড়াও আর একটা ঘটনা জানাল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময়, একটা ছেলেকে, যাতে সৈন্যরা জয় অবধি লড়াই চালিয়ে যায় তাই বক্তৃতার জন্য পাঠানো হয়েছিল। পালিখের তাকে দেখে মজা লেগেছিল, তার কীর্তিকলাপেও। তারপর সে নাকি বুঝতেই পারেনি রাইফেলের গুলি ছুটে গিয়ে বিঁধেছিল ছেলেটার বুকে। এখন সেজন্য মন খারাপ হয় পালিখের। ব্যাপারটা ঘটেছিল মেলিউজেইয়েভের কাছে বিরিউচি ষ্টেশনে। "জি বুসিনো বিক্ষোভের সময় তুমি কোন ফ্রন্টে ছিলে?"—ইউরার এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারল না পামফিল পালিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

এ্যানবেরিসের পথে যাত্রা

শিবিরে সৈন্যদের পরিবারেরা এসে পৌচেছে। কুবেরিখা নামে এক অদ্ভুত চরিত্রের নারী এসেছে—সে পশুর ব্যামো সারায়। আবার তুকতাকও করতে পারে। "শেয়াল বন" থেকে একটু দূরে নূতন জায়গায় ছাউনি ফেলা হয়েছে। শীতকালটা ওখানেই কাটল। এখানে একটু সময় পেয়েই ইউরা বনের নানা জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল। দুটো জায়গা ইউরার স্মৃতিতে থেকে গেল।

প্রথমটা শিবিরের ঠিক বাইরে। হেমন্তকাল, গাছ থেকে পাতা ঝরে যাওয়া বনের ভিতরকার সম্পূর্ণটুকুই পরিষ্কার দেখা যায়। কেবল একটা গুল্মগাছে তখনও কিছু কিছু পাতা ছিল। ছোট্ট পাখীগুলোর তাই খুব মিতালী গাছটির সাথে।

অন্য জায়গাটা একটু উঁচু—এক দিক খাড়া হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে, খাদের ধার ঘেঁসে গ্রানাইট পাথরের বিরাট বিরাট চাঁই পড়ে আছে। ইউরার মনে হলো এখানটায় কোন মন্দির ছিল, অর্ঘ্য সাজানো হত এই পাথরের উপর। চক্রান্তকারীদের ও ভদকা চোলাইকারীদের রক্ষীদের পাহারায় এখানে আনা হল। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ওদের। রুগ্ন প্রেতের মত লাগছিলো ওদের। গ্রেপ্তারের আগে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু খানাতল্লাসী করা হয়নি ওদের। হঠাৎ রজানিটস্কি নামে একজন সিভোব্লুয়িকে লক্ষ্য করে পর পর তিনটি গুলি ছুড়ল। অব্যর্থ টিপের জন্য খ্যাতি থাকলেও উত্তেজনার বশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তার। প্রথম আক্রমণে ব্যর্থ রজানিটস্কি রিভলবারটা পাথরের ওপর আছড়ে ফেলাতে চতুর্থ গুলিটি ছুটে গিয়ে পাচকোলিয়া আর্দালীর পায়ে লাগল। যন্ত্রণাকাতর পাচকোলিয়া পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষা ও কসকা তাকে টেনে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে চলল টিলার দিকে। তার তীব্র চীৎকারে সকলের আত্মসংযম নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। টেরেন্টি গালুজিন চীৎকার করে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলো। কেউবা তিরস্কার করতে লাগলো, কেউবা সিভোব্লুয়িকে লক্ষ্য করে অশ্লীল মন্তব্য শুরু করলে। গুংডাভিচেস্কো টিলার উপর দাঁড়িয়ে সকলকে ছোটো

হতে নিষেধ করছিল—সে বলছিল আমাদের আত্মা শহীদের। ইতিহাস আমাদের অবশ্যই মর্যাদা দেবে।

"গুড়ুম, গুড়ুম" এক সঙ্গে গর্জে উঠলো কুড়িটা বন্দুক। বন্দীদের অর্ধেক ভূপতিত হয়ে তৎক্ষণাৎ নিহত হলো। অনেকক্ষণ দাপাদাপি করছিল গালুজিন। অবশেষে তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে তার দেহটাও নিঃস্পন্দ হয়ে গেল। বাকী অর্ধেক দ্বিতীয়বার গুলির ঝাঁকের সম্মুখে পড়ে মৃত্যু বরণ করল।

শীতের জন্য আরো উত্তর গিয়ে আশ্রয় নেবার পরিকল্পনাটা কার্যকরী করার পিছনে অনেক বিপত্তি দেখা গেল। আরণ্যকদের চারপাশ ঘিরে সাদারা শেষ আঘাত হানছিল। বেষ্টনীর পরিধির জন্য লালরা বেঁচে গেল। অনেক কথা কাটাকাটি ও আলোচনার পর স্থির হলো টাইগার ভিতর বর্তমান আশ্রয়কে সুরক্ষিত করতে হবে। ক্যাম্পে ময়দা ও আলুর অভাব থাকলেও পালিত পশুর সংখ্যা বেশী থাকাতে খাবারের ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ক্যাম্পের সমস্ত কুকুরকে মেরে তাদের চামড়ায় গরম জামার ঘাটতি পূরণ করার ব্যবস্থা হল। ইউরার হাতে কেবলমাত্র কুইনিন, গ্লাবার লবণ ও আইওডিন এই ওষুধ ছিল। আইওডিন গুলে নেবার জন্য স্পিরিট তৈরীর ভার পড়ল ক্ষমাপ্রাপ্ত ভদকাচোলাই-কারীদের একজনের ওপর। শীতকালে টাইফাস রোগের জন্য এটা বিশেষ কার্যকরী হলো।

পামফিলের বৌ ও তিন ছেলে মেয়ে এসেছে। ছোটদের মুখে বেশী না থাকলেও পালিখের বৌ-এর মুখে দুর্দশার চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেল ইউরা। পামফিল, ছেলে-মেয়েদের জন্য সুন্দর সব খেলনা তৈরী করে রেখেছিল, এখন তাকে হাসিখুশী মনে হচ্ছে। কিন্তু বিশৃঙ্খলার ভয়ে কর্তৃপক্ষ পামফিলের পরিজনদের দূরে পাঠাতে মনস্থ করলেন। আলাপ আলোচনা হল অনেক। পামফিলের মানসিক রোগ বেড়ে গেল এতে।

শীত ভাল করে আসার আগেই সাদারা লালদের সম্পূর্ণ ঘেরাও করে ফেলল। আক্রমণের প্রধান কুখ্যাত ভিটাসন, কুয়াদ্রি ও বাসালিগোর নামে মনের শান্তি নষ্ট হল সকলের। পার্টিজানদের অন্তত পক্ষে সৈন্যপ্রদর্শনের জন্যও অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে পড়া দরকার তাই তারা অবরোধের পশ্চিম প্রান্তে তাদের শক্তি সংহত করলে। কয়েকদিন তুমুল যুদ্ধের পর অবরোধ ভেঙে গেল। কিন্তু এই

ফাঁকে, ফাটল দিয়ে পার্টিজানদের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক একদল উদ্বাস্তু ঢুকে পড়ল। কিন্তু শিবিরের পক্ষে নতুনদের দায়ত্ব নেবার মত সামর্থ নেই তাই উদ্বাস্তুদের ভভোরি গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো।

এদিকে শত্রুরা আবার ফাটল বন্ধ করে ফেলল, অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া সালদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল টাম্বিগায় ফেরা। এদিকে উদ্বাস্তুদের মধ্যে-কার কিছু মেয়ে গাছ কেটে ফেলে রাস্তা ও সাঁকো তৈরী করে ফেলেছে। সব দেখে শুনে লিবেরিয়ুস অসুস্থ হয়ে পড়ছে, মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেছে।

রাজপথে দাঁড়িয়ে কোচোয়ান সভিরিডের সঙ্গে কথা বলছে লিবেরিয়ুস অস্থির-ভাবে—কেননা রাস্তায় পাশের টেলিগ্রাফের তার কাটা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে। সভিরিড, ভভোভিচেঙ্কের সাফাই গাইছিল, লিবেরিয়ুস অবশ্য ভ্রাতৃত্বের ভাঙন ধরানোর শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করে দিল তাকে।

আকাশের বিষণ্ণ অবস্থা। ধোঁয়ার মতো পাইনবনের উপর বৃষ্টি অনবরত পড়ে যাচ্ছে, বাতাসে স্যাঁতসেঁতে ভাব। পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীলোকদের কাছে গেছিল সভিরিড। দেখেছে হতাশা ক্লিষ্ট, সন্তানহারা ভারাক্রান্ত দুর্বল মহিলারা নিজস্ব চেতনা কিভাবে বিসর্জন দিয়েছে। তাদের মতে বনের পশুর হাতে পড়ার থেকে শত্রুর হাতে পড়া অনেক ভালো। অপরদিকে শক্ত মেয়েরা ছেলেদের আত্ম-সংযমকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। লিবেরিয়ুস অতিরিক্ত তাড়া করার ফলে সভিরিড সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারছিলো না। সভিরিড পরামর্শ দিল মেয়েদের শিবিরে আজে-বাজে ব্যাপার না করার জন্য হুকুম দিন। আর তাছাড়া কুবারিখা পশুদের ডাক্তারণী—মেয়েটা এক নম্বরের শয়তান নাকি! সে উদ্বাস্তুদের উত্তেজিত করছে। লিবেরিয়ুস অবাক, "ওদের তো ভভোরিতে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।"—হ্যাঁ, সভিরিড বলল, সেখানে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে তা দেখে অর্ধেকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, কেউ সাদাদের কাছে গেছে, আর বাকী কজন এখানে চলে এসেছে। টায়িগার জলা পেরিয়ে আসতে পাহারা দেবার জন্য ছোকরারা ওদের আসতে সাহায্য করেছে। এছাড়া মেয়েগুলো ইতিমধ্যে সাঁকো সমেত মোট কুড়ি মাইল রাস্তা তৈরী করেছে টায়িগার ভিতর দিয়ে। ঠিক যেটা সাদারা চাইছিল। অতএব আপনি দেরী না করে একটি শক্তিশালী ফৌজ পাঠান যাতে শত্রুরা অন্যদিকে ব্যস্ত থাকে। ধন্যবাদ জানাল লিবেরিয়ুস।

তখন প্রায় পাঁচটা, ইতিমধ্যেই মাটির বুকে অন্ধকার নেমে আসছে। ক্যাম্পে ফেরার পথে ইউরা চড়া ও কর্কশ গলায় গান শুনতে পেলো। বুঝলো গায়িকা কুবারিখা, পরিহাস করে তাকে "প্রতিদ্বন্দ্বী" বলে ইউরা। অনেক মেয়ে-পুরুষ তার গান শুনছে। সবাই চলে গেলে একাকিনী কুবারিখা অন্য গান ধরলো, এবারে তার কণ্ঠস্বর কোমল। গানটা লোকসংগীতের মতো কিন্তু চেনা নয় ইউরার। সেই গানের মধ্য দিয়ে একজন দুঃখী, নিঃসঙ্গ, আত্মসংবৃত হৃদয় প্রকাশ পাচ্ছে, মুক্তির চিন্তায়, প্রিয়জনের কাছে পৌঁছবার এক আকুল আর্তি ধ্বনিত হচ্ছে গানের কথায় ও সুরে।

পামফিলের স্ত্রী আগাথা তার অসুস্থ গোরুটিকে নিয়ে কুবারিখার কাছে এসেছে। পালের অসংখ্য গরুরা একপাশে ঠাসাঠাসি করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এদের বেশীরভাগই সাদা আর কালো—বিশেষ জনপ্রিয় এরা। কিন্তু মালিকদের মতো, অনাহার ও অনিয়মিত ভ্রমণের ফলে, তারাও অবসাদগ্রস্ত। ঠাসাঠাসিতে তলায় পড়ে যাওয়া বাছুরগুলো ছিটকে বেরিয়ে বনের দিকে ছুটে যাচ্ছে, সামলানোর জন্য রাখালদেরও দৌড়তে হচ্ছে।

আগাথাদের ঘিরে একটা ছোট-খাটো ভিড় হয়ে গেছে, অনেকে কুবারিখাকে বিরক্ত করছে কিন্তু সে নির্বিকারভাব ধারণ করেছে। ইউরা দেখলো পরণে তার সবুজ গলাবন্ধওয়ালা ঢোলা কোট ও মাথায় পদাতিক বাহিনীর ঢোলাটুপি।

আগাথাকে তো প্রথমেই চিনতে পারেনি। আগাথা বলল কুবারিখাকে, প্রথমে গোরুটা দুধ বন্ধ করতে সে ভেবেছিল গাভীন, কিন্তু তাহলেও তার এতদিনে স্বাভাবিকভাবে দুধ দেওয়ার কথা। ওষুধ দিয়ে মন্ত্র পড়ে তার এ সমস্যার সমাধান করবে—একথা কুবারিখা জানাল। আগাথার দ্বিতীয় অশান্তি স্বামীকে নিয়ে, সেনে তাকেও বশ করার কথা বলেছিল। কিন্তু বাধা দিয়েছিল আগাথা, সাদাদের হাতে নির্যাতিত হতে হবে তার স্ত্রী পুত্রকে এই ভেবে তার স্বামী লিবেরিয়ুসের অধীন থেকে মস্তিষ্ক বিকৃত হতে চলেছে। এটাই হল আগাথার দ্বিতীয় অশান্তি কুবারিখা পরিহাস করে তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে একটা পাঁউরুটি ও তার স্বামীকে দাবী করেছিল। তারপর মন্ত্র পড়তে লাগল গোরুটার উদ্দেশ্যে। এরপর নিজের অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপের ক্ষমতার কথা বলতে লাগল আগাথাকে। তার কথাবার্তা শুনে ইউরা বুঝতে পারলো নভগোরড বা ইপাটিয়েভোর প্রাচীন বিবরণী এগুলো, বর্তমানে এর মূল অর্থ অনেক বিকৃত হয়ে গেছে। কারো মনের কথা পরিষ্কারভাবে পড়ে ফেলা যায় এই ধরণের চিন্তাধারা হঠাৎ ইউরাকে

লারার কথা মনে পড়িয়ে দিল। তার ওপর নিজের ভালবাসার কথা ইউরা অনুভব করতে পারলো। কিন্তু ইউরা, লারার থেকে এখন অনেক দূরে সাইবেরিয়ার জঙ্গলে—যেখানে মৃত্যু প্রতি পদক্ষেপে। ভাইনি কুবারিখা, আগাথাকে চলে যেতে বলল, আর এখন যাবার সময় ঠাকুরের মায়ের পায়ে প্রণাম করে যেতে।

"টায়িগার" পশ্চিম দিকে লড়াই চলছে। এই ক্যাম্পটির অবস্থান এমন জায়গায় যেন ওর মধ্যে যুদ্ধ করতে যাওয়া সৈন্যরা ছাড়াও বহু সৈন্য এখানে আছে। যুদ্ধের গোলমাল এখানে পৌছয় না। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শোনা গেল, তারপর ক্রমাগত চলতে লাগল। সকলে সর্তকত হয়ে হাতিয়ার সংগ্রহের চেষ্টা করতে গিয়ে অবস্থাটা বিশৃঙ্খলা পূর্ণ করে তুলল।

পরে এই বিপদ সংকেতটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। যেদিক থেকে গুলির শব্দ আসছিলো সেখানে ছুটে গেল পার্টিজানরা—সেখানে হাত পা কাটা রক্তাক্ত একটি মানুষকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে কোনমতে ক্যাম্পের কাছে এসেছে। তার পিঠে একটি কাঠের তক্তাতে লেখা ছিল—লাল ফৌজদের সম্পর্কে অশ্রাব্য গালাগাল, ও লাল ফৌজের কোন কোন বাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে ঐ লোকটার ওপর। যন্ত্রণাকাতর লোকটা জানাচ্ছিল, ভিটমিনের লোক বেকেশিন ছিলেন কাপ্তান স্ট্রেড়ো কর্ণেল। তারা ওর পরিচয় জানতে চেয়ে বিফল হওয়াতে ওর ঐ অবস্থা। নৃশংস লোকগুলো একটা ছোট খাঁচায় চল্লিশজন লোককে শুধু মাত্র নেংটি পরিয়ে ঢুকিয়ে দেয় ঠেসে। তারপর অত্যাচারের জন্য বের করে নিয়ে যায়। ফালি ফালি করে কাটে, গরম জল ঢেলে দেয় গায়ে। বাচ্চা ও মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যোচারের বীভৎস বর্ণনা দিতে পারল না লোকটা। নাভিশ্বাস উঠল, তার মৃত্যু তাকে গ্রাস করলো।

ভিড়ের মধ্যে পামফিলও ছিল, অসহ্য উৎকণ্ঠার চাপে ব্যধিগ্রস্ত স যে কুড়ুল দিয়ে ছেলে মেয়েদের জন্য খেলনা তৈরী করেছিল তা দিয়ে বৌ ও ছেলে মেয়েদের এই হাল করলো নিজের হাতে, সব ভাবী যন্ত্রণা তার শেষ। বদ্ধ উন্মাদ পামফিল আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘোলাটে তার চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি। কেউ কেউ ওকে মেরে ফেলার প্রস্তাব করলে, কিন্তু তা সমর্থিত হলো না, সকাল হল। উন্মাদ পামফিলকে কোথাও আর দেখা গেল না।

শীত এসেছে তার বরফের সাদা কোট গায়ে। সূর্যের রং গেছে বদলে। পায়ে চলা পথে চলাকালীন লিবেরিয়ুসের সঙ্গে দেখা হল ইউরার। লিবেরিয়ুস তার শিবিরে এসে রাত্রিযাপন করবার অনুরোধ জানালে। কতকগুলো নতুন খবর দিতে পারবে সে জানাল। সন্ধ্যে বেলায় উদ্বিগ্ন ইউরা এল। প্রথমেই তার স্ত্রী-পুত্রের খবর জানতে চাইলে। লিবেরিয়ুস জানালে তারা নিরাপদেই আছে। কিন্তু এছাড়া আরও ভাল খবর হলো সাদারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কোলচাক নিশ্চিহ্ন। লাল ফৌজ সমুদ্রাভিমুখে সাদাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাকী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সাদাদের সহজেই কোণঠাসা করতে পারবে লালফৌজ। বিষন্ন ইউরা এবার ইউরিয়াটিনের খবর জানতে চাইলে।। লিবেরিয়ুস ম্যাপ খুলে ফেলে দেখাতে লাগল যে সে জায়গা থেকে সাদাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণিমার আলোতে বনভূমি আলোকিত। পলায়নপর ইউরা টহলদার সাস্ত্রীর চোখে পড়ল। তাকে বাধা দিতে এগিয়ে এল সে, পরে ডাক্তার হিসেবে চিনতে পেরে তার আজগুবি কথায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলে বিরক্ত ভরে ছেড়ে দিল তাকে। ইউরা পৌছাল নির্দিষ্ট গাছটার কাছে। জামগাছের ডাল টোনিয়ার শুভ্র বাহুর কথা মনে পড়িয়ে দিল, খুঁড়ে বার করল সব জিনিষপত্র তারপর ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেল ইউরা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্যারিয়াটিভস—গৃহের বিপরীত দিক

ইউরিয়াটিনের মার্চেন্ট স্ট্রীটের ভারবাহী নারীমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাই-রঙের বাড়ীটার দেয়ালে একটি ইস্তাহার আঁটা আছে। সেখানে ছোটখাটো ভিড় জমেছে একটা। ঘোষণা করা হয়েছে ইউরিয়াটিন সোভিয়েটের খাদ্যদপ্তরে শ্রমিক পত্র ৫০ রুবলের বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে। ঠিকানা ৫নং অক্টোবর স্ট্রীট ২৩৭ নং কামরা। যোগ্য ব্যক্তিদের এগুলো দেওয়া হচ্ছে।

আরেকটি ইস্তেহারে খাদ্য মজুতকারীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে হত্যার উল্লেখ করে। তৃতীয় ঘোষণা পত্রে শোষক শ্রেণীর বহির্ভূত ব্যক্তিদের ক্রোক সমিতির সদস্যাধিকার দেওয়া হয়েছে। শেষ ইস্তাহার, সেনাবিভাগের জন্য। তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে ও অনুমতি পত্র ব্যতীত সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

মার্চেণ্ট স্ট্রীটে এই বাড়িটার কাছের ভিড়ে ধুলোবালি মাখা, খোঁচা খোঁচা কাল দাড়িওয়ালা, ছেঁড়া পাতলা জামাওয়ালা একজন লোক এসে যোগ দিল। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সে ইউরা, দুর্বলতার জন্য মার্চেণ্ট স্ট্রিটে ইউরিয়াটিন থেকে আসতে দেরী হয়েছে।

সাইবেরিয়া থেকে আসার সময় বেশী তুষার উচ্ছ্বালিত রেলপথই ব্যবহার করেছে ইউরা। সাদাদের পরিত্যক্ত ট্রেনগুলো পলাতক সৈন্য, গুণ্ডা প্রভৃতিদের আশ্রয় দান করছে। ইউরা মাঝে অনেক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখেছে যারা পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে যেতে চায়। একদিন নিহত বলে জ্ঞাত গালুজিনকে দেখেছিল সে, আসলে গালুজিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, জ্ঞান ফেরার পরে গুঁড়ি মেরে পালিয়ে গেছিল বধ্যভূমি থেকে। আসার পথের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় ইউরার ঝুলি পূর্ণ।

স্তম্ভ ভবনের গায়ে আঁটা বিজ্ঞপ্তিগুলো পড়তে এসে বারবার তার চোখ পড়ে যাচ্ছিল লারার ঘরের দিকে। সেখানে লারাদের অবস্থান সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ইউরা

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। আগের মতো জিনিষপত্র ঠিক জায়গাতেই আছে কিন্তু দেশের অবস্থার অবনতি হয়েছে যা স্পষ্ট। লারার দরজায় একটা তালা ঝুলছে, হঠাৎ ইউরা চাবি রাখার ফোকরের কথা মনে হওয়াতে ইট সরিয়ে ফোকরে হাত ঢুকিয়ে পেল একটা চাবি ও একটি দীর্ঘ চিঠি, তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। চিঠিটা এরকম, লারা খবর পেয়েছে ইউরা ইউরিয়াটিনে এসেছে। ভারিকিনোতে যাবে নিশ্চয়। এইভেবে লারা কাটিয়াকে নিয়ে ওখানে গেছে। তার জন্য কিছু আলুসেদ্ধ সসপ্যানে করা আছে।

চিঠিটা ইউরাকে আনন্দ দিলো। কিন্তু নতুন আইন কানুনগুলো ইউরাকে জানতে হবে। নীচে নেমে এলো সে।

সম্পত্তির যাচাই, করধার্য, দাবিঘোষণা, কারখানা ও কর্মসমিতির প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক-সংসদ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পর্কীয় নতুন নিয়মকানুন ছিল। ইউরা বুঝতে পারলো বর্তমান শাসকেরা অন্যের পক্ষ সমর্থন করছে না। একটু করে খবর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার। কারখানা ও কর্ম সমিতির অকর্মন্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কীয় ব্যাপার সেটা। মাথা ঘুরছিল ইউরার, ক্লান্ত ইউরা পথের উপরই অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে রাস্তাটা শুধু পার করে দিতে বললে, তাদের জানালে রাস্তার উল্টোদিকে ছাইরঙা বাড়ীটাতে সে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে লারার ফ্ল্যাটের দরজা খোলার জন্য তালাতে চাবি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ইদুরের ছুটোছুটিতে টিনের বাসনপত্র শব্দ করে পড়তে লাগলো, বিরক্ত বোধ করল ইউরা, নোংরা জায়গাটা এড়িয়ে বাঁদিকে ঘুরে লারার ঘরে এল। রাস্তায় তখনও অনেকে ঘোষণা পড়তে ব্যস্ত। আসার পথে ইউরা নিজেকে অসুস্থ মনে করছিলো কিন্তু ঘরের ভিতর ও রাস্তায় একই রকই আলোকে ইউরা বাইরের জনজীবনের আত্মার সাথে নিজের আত্মার ঘনিঠ যোগাযোগ আবিষ্কার করল। অসুস্থতার আশঙ্কা তখন আর নেই। সে ভাবছে তার প্রিয়-জন সকলকে এবার ধীরে ধীরে একত্র করবে। কিন্তু প্রথমেই চুল ও দাড়ি কাটা দরকার। স্পোসফি স্ট্রীটের এক দোকান থেকে খাবার আনবার জন্য বেরিয়ে পড়ল ইউরা যদিও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ নয় সে।

দোকানটা আছে। সেলাইরত স্ত্রীলোক ভর্তি ঘরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দরজির এই দোকানটা আর্মির পোশাক ছাড়া অন্য কিছু বানায় না। ইউরা টোকা দিয়ে ভেতরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কিন্তু তারা ব্যাপারটা সঠিক না বুঝে ইউরাকে চলে যাবার জন্য হাত নাড়ল। নিরুপায় ইউরা আঙুল নেড়ে কাঁচি-কাটার ভঙ্গি করে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করল। ছিন্ন পোষাক পরা, উস্কো-খুস্কো চুল ইউরাকে পাগল স্থির করে মেয়েরা নিজেদের কাজ করে চলল। ইউরা স্থির করল পিছনের দরজায় গিয়ে টোকা দেবে সেজন্য বাড়িটা ঘুরে যেতে হবে তাকে।

পিছনের দরজায় টোকা পড়ল। কালো কঠিন চেহারার এক স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে বিরক্তিভাবে তার আগমনের কারণ জানতে চাইলো। ইউরা জানালো সে অনেক দূর থেকে এসেছে। নাপিত না পাওয়াতে একটা কাঁচি ধার চাইতে এসেছে সে। মহিলাটি জানালে "এ কথাটা মিথ্যা হলে আমরা নালিশ করে আপনাকে বিপন্ন করতে পারি।" পরে তাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। মহিলাটি বলে চলল; যুদ্ধের সময় নার্স থাকালীন চুল ছাঁটতে ও দাড়ি কাটতে আমি শিখেছিলাম। আপনাকে দেখে শিক্ষিত মনে হয়, আপনি কি জানেন না আজ নাপিতদের ছুটির দিন? ইউরা সত্যিই এইসব নতুন নিয়মের কথা জানে না। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানালে ঋণ সমবায় সমিতির ইন্সপেক্টর হয়ে ট্যুর করতে গিয়ে পূর্ব সাইবেরিয়ায় বিপদে পড়েছিল; হাইওয়ে ওয়েল লাইন দিয়ে এখানে আসবার পথে অনেক অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাও জানাল। মহিলাটি, সে সম্পর্কে কোন কথা উচ্চবাচ্য না করে নীরব হয়ে থেকে নিজেকে ডাক্তার বা শিক্ষক হিসাবে পরিচয় দিতে উপদেশ দিল ইউরাকে। তারপর সাদাদের বীভৎস কীর্তি-কলাপের কথা শোনাতে লাগলো। একজন অসাধারণ দয়াবতী নারীর কথা উল্লেখ করলো। ইউরা বুঝলো মহিলাটি লারার কথা বলছে। আরও বুঝতে পারলো এই দণ্ডায়মান মহিলা লিবেরিয়ুসের মাসী। এরপর তারকিনোর কথা জিজ্ঞাসা করলো ইউরা। মহিলাটি জানাল, তার ভগ্নিপতি ও স্ত্রী ভাগ্যবশতঃ তার আগেই চলে এসেছিল। নতুন লোকদের মধ্যে একজন ডাক্তারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সকলের ধারণা সে মরে গেছে, অন্যজন কৃষিবিদ, তারা সকলে মস্কোতে ফিরে গেছে। পথে ইউরিয়াটিনে তাঁরা থেমেছিলেন।

আনন্দে উল্লসিত ইউরা ফিরে এল লারার শূন্য ফ্ল্যাটে। ঘরের ভিতরকার

ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ না করলে ঘুমোনো অসম্ভব, যদিও অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে উৎপাত কিছুটা কম, তার উদ্যোগে লাগল ইউরা। অনেকক্ষণ সময় লাগলো এতে। ঘরের কোণে ওলন্দাজ ষ্টোভটা ধরানোর জন্য কাঠ বেছে নিয়ে ধীরে সুস্থে তা ত আঁচ ধরালো। কাঠের চেরা অংশে "কু-উ," মানে "কুলাবিশ উপত্যকা" লেখা দেখে বিষণ্ণ হলো ইউরা। সে বুঝতে পারলো সামডেভিটিয়াটভ এটা সরবরাহ করেছে। লারার প্রতি ঈর্ষা ও সন্দেহ জেগে উঠলো তার মনে, পরক্ষণেই নিজ পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর চিন্তায় তা ডুবে গেল। লারাও তো তাদের বিষয় কিছু লেখেনি! অথচ বাইরের লোক তাদের খবর জানে। বিস্ময়ান্বিত ইউরা এই বাড়ীটাকে মনে রাখার জন্য কষ্ট অনুভব করলো।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গোধূলি আলোকে ইউরার, জীবনকে বড় সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। লারার প্রতি বিতৃষ্ণা এখন আর নেই। আগুনের তাপে ও আলোকে অনেকটা সুস্থ লাগছে ইউরার, লারাকে বুঝতে পেরেছে ইউরা. পরিপূর্ণ নারী সে। অকস্মাৎ তার সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল ইউরা পকেট থেকে দুমড়োনো চিঠিটা বার করে ফেলল। চিঠির উল্টো দিকটাতে যেটা পূর্বে তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছিল, সেখানে লেখা আছে. ইউরার বাড়ীর সবাই মস্কোতে, টোনিয়ার একটা ছোট্ট মেয়ে হয়েছে। কাটিয়াকে নিয়ে মুর্শলিলের কথাটা জলে মুছে গেছে। ইউরা বুঝলো তাদের ঘোড়াটা সামডেভইয়াটভের কাছ থেকে পেয়েছে লারা।

আগুন নিবে গেছে চুল্লীর। নল বন্ধ করে কিছু খেয়ে নিয়ে শোওয়া মাত্র গভীর ঘুমে ইউরার চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠলো। জামা কাপড় ছাড়া হয়নি তার। স্বপ্ন দেখলো—সে যেন মস্কোতে। কাঠের দরজাওয়ালা ঘরে চাবি লাগানো থাকা সত্বেও নিরাপত্তার জন্য হাতলটা টেনে রেখেছে নিজের দিকে। দরজার বাইরে সে, লারা ও চুপ করা ছোট্ট সাশার পিছনে প্রচণ্ড জল-প্রপাত তেড়ে আসছে ছোট্ট সাশা ভয়ে চীৎকার করছে 'বাবা" বলে ডাকছে তৎসত্বেও ইউরা কিছুতেই দরজা খুলছে না তাতে যদিও খুব কষ্ট হচ্ছে তার। ঘাম ও চোখের জলে ভিজে জেগে উঠলো ইউরা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা, টাইফাস হলো নাকি? এলোমেলো চিন্তার মধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়ল ইউরা। এবার স্বপ্ন দেখলে এক শীতের সকালে মস্কোর ভিড় ভরা রাস্তায় সে। বিপ্লবের আগেকার সময় যেন সেটা। লারার বাড়ীতে অনেক গৃহহীন আশ্রয় নিয়েছে। অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কর্ত্রী লারা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত

প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে নিচ্ছে আর ইউরা অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি কৈফিয়ৎ নেবার জন্য লারার পিছনে ঘুরছে, লারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না শুধু মাঝে মাঝে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে ইউরা।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে মরছে ইউরা, তার টাইফাসই হলো বুঝি-বা, ভোরবেলার অথবা সূর্যোস্তের নীল আভা দেখতে পাচ্ছে ইউরা—হঠাৎ সে অনুভব করল এটা স্বপ্ন বা বিকার কিছুই নয়। পরিষ্কার জামা গায়ে সদ্যপাতা বিছানায় সে শুয়ে। নিজের চোখের জলের সঙ্গে ইউরার জল মিশিয়ে লারা কাঁদছে।

গভীর আনন্দে পূর্ণ হলো ইউরার মন, সারা জীবনভরা খাটুনি আর—এত আনন্দ জীবনে সে কখনো পায়নি। লারার যত্নে পরিচর্যায় শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল সে। দুজনের মধ্যে অনেক মিল আছে। তাই তারা পরস্পরের কাছে ভালাবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। জীবনকে তারা নিজস্ব আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। এখানেই ওদের অসাধারণত্ব।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও বেশী ইউরাকে আটকাতে চায় না লারা, কিন্তু এত দুর্বল ইউরাকে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতেও মন চায় না। আর সেখানে যে সমস্ত খাদ্য পাঠানো হচ্ছে তা জনসংখ্যার তুলনায় অত্যল্প। তাই লারা ইউরাকে একটা চাকরী নিতে বলল ইউরিয়াটিনেই। তার নিজের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। ইউরা স্ট্রেলনিকভের খবর জানতে চাইলে লারা জানাল কি ভীষণ বিপদের মুখে পড়েছে সে। চতুর্দিকে তাকে খোঁজাখুঁজি চলছে। ওর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে লারা ওকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু লারার মতে স্ট্রেলনিকভের অনন্য সাধারণত্ব তাদের উভয়কার বিবাহকে ব্যর্থ করেছে। "কি সুন্দর তোমার টোনিয়া"—প্রসঙ্গ পালটাল লারা। "ওর সাথে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। ওর প্রসবের সময় আমি ছিলাম।" এক ট্রেন বোঝাই লাল নীল নোট এসেছে লারা জানাল। লাল ও নীল নোটের মূল্য যথাক্রমে এক লাখ রুবল ও পঞ্চাশ হাজার। "হ্যাঁ ওরকম টাকা আমি দেখেছি"—বলল ইউরা।

ভারিকিনোতে গিয়ে লারা ও কাটিয়া ইউরার অগোছালো বাড়ীটা পরিষ্কার করে রেখেছিলো। ইউরা তার দ্বিতীয় সন্তানের নাম জানতে পারলো—মেয়েটির নাম মাশা—ইউরার মায়ের নাম। এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সামদেভইয়াটভের

কথা জানতে চাইলো। লারা জানাল, তার মতো চমৎকার মানুষ হয় না লারাকে অনেক সাহায্য করেছিল সে। কিন্তু ইউরা সামভেভইয়াটভের সঙ্গে লারার বন্ধুত্ব সরল মনে মেনে নিতে পারছিলো না। বুদ্ধিমতী লারা তা বুঝতে পেরে ইউরাকে জানাল—তাকে লারা কেবলমাত্র বন্ধু হিসেবেই মেনে নিতে পারে কোন কিছুর বিনিময়েই লারা তার বেশী মর্যাদা দিতে পারবে না তাকে। জীবন ও প্রেম সম্পর্কিত তার ধারণা অন্য রকম। লারার জীবনের প্রারম্ভেই তার বাবার বন্ধু কমারোভস্কি—ধনী স্বার্থপর, লম্পট লোকটা ঢুকে পড়েছিল, জীবন সম্বন্ধে কুৎসিৎ দিকটাকে ভালো করে আবিষ্কার করেছিল লারা। বীতস্পৃহ লারা তাই পরে ষ্ট্রেলনিকভকে বিয়ে করে - যদিও ভাগ্যদোষে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই কমারোভস্কিকে লারা প্রচণ্ড ঘৃণা করে, কেননা তার পিতার আত্মহত্যার মূলে ছিল এই লোকটা। ইউরাও এই কমারোভস্কিকে ঘৃণা করে। একজন রুচি সম্পন্ন মহিলার কাছে কমারোভস্কির সঙ্গ যে কিরূপ মর্মস্পর্শী তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারলে ইউরা লারাকে দেখে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে দেখার কোন দৃষ্টিই নেই তার। এমন লোককে ঘৃণা করতেও প্রবৃত্তি হয় না ইউরার। হ্যাঁ, ইউরা ভালবাসে লারাকে কিন্তু সে ভালবাসার মধ্য দিয়ে অপার্থিব লোকের সন্ধান মেলে।

ইউরার অনুরোধে লারা বলে যাচ্ছিল। মেলউজেইয়েভোতে পাশাকে লারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন পাশার চরেরা ইউরাকে গ্রেপ্তার করে। তখনই লারা পাশার মধ্যে একটা পরিবর্তনের ভাব লক্ষ্য করে। সুন্দর উন্নত দীর্ঘকান্তি চেহারার লোকটার মুখ দেখে মনে হয় একটা মূর্তিমান নীতির প্রতিরূপ। তা মহৎ হয়েও করুণাহীন। লারা আরও জানাল, পাশা ও গালিউলিনের সঙ্গে ছোটবেলাতেই মানুষ হয়েছে সে। ছোটবেলাকার পাশার মুখ লারা দেখলে একটা পরিবর্তন হতো। তা বুঝতে পারলে মনে মনে পাশার বাক্‌দত্তা ছিলো সে। সাধারণ গার্ড অথবা সিগন্যালম্যানের ছেলে এই পাশা নিজ বুদ্ধির জোরে গণিতে ও প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে একেবারে শীর্ষস্থলে উঠে গেছে। এটা মুগ্ধ করেছিল লারাকে। তারপর এল রাশিয়ার জীবনে ঝড়, অনেক তুচ্ছ বিষয় দূরে পড়ে রইল, সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলা হতে লাগল—হারিয়ে গেল লারা পাশার কাছ থেকে। অনেক দূরে থেকে এখনও চোখের জলে পাশার স্মৃতিকেই আঁকড়ে থাকতে চায়। উন্মত্ত আবেগে থরথর করে কাঁপছিলো লারা। বলছিলো, ষ্ট্রেলনিকভ যদি এখনও পাশা আন্টিপভ হয় তাহলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই সে থাকুক না কেন, যা

কিছুর বিনিময়েই হোক না কেন, সে ছুটে যাবে পাশার কাছে। এমনকি ইউরার ভালবাসাও তুচ্ছ করে. না, না—একি নিষ্ঠুর কথা বলছে লারা। কঁদতে কাঁদতে ইউরার বুকে মাথা রাখলো লারা, "ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমাদের সকলেরই কর্তব্যের তাগিদ আছে যার জন্য তুমিও টোনিয়ার কাছে ফিরে যেতে চাও।' একটু শান্ত হয়ে আবার বলতে শুরু করলে, যুদ্ধের দুবছর আগে বিয়ে হয়েছিলো ওদের, ঠিক গুছিয়ে বসার সময়ই যুদ্ধ লাগলো। শান্ত, সুখময় নিশ্চিন্ত জীবন টুকরো হয়ে ভেঙে সেখানে দেখা যেতে লাগলো খুনোখুনি। মিথ্যা, কৃত্রিমতা, বিশ্রী লোকদেখানো মনোভাব এসে বাসা বাঁধলো সকলের মনে—আপন নীতিবোধকে মেনে চলা পাপ বলে গণ্য হতে লাগলো। আশ্চর্যের বিষয়, বুদ্ধিমান পাশাও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ল। কেউ তাকে যুদ্ধে যেতে বলেনি। ইদানীং তার মনে হতো নিজেকে ভার বলে তাই লারাকে মুক্তি দিতে চাইলো সে। তার অতিরিক্ত উচ্চাশাই মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। তাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারছে না লারা, আক্ষেপে ভেঙে পড়লো লারা।

ইউরা মুগ্ধ চোখে পবিত্র লারাকে দেখছে। মনে মনে বলল আরো ভালবাসো তুমি পাশাকে, নিঃশব্দে আমি তোমার পাশ থেকে সরে যাব।

গ্রীষ্ম এসে গেছে। সুস্থ ইউরা এখন তিন জায়গায় কাজ নিয়েছে। খুব ভোরে উঠে ইউরা হাসপাতালে তার আসল কর্মস্থলে পৌছে যায়। ইউরিয়াটিনে নতুন আইনমুসারে দশদিনে সপ্তাহ হয়, মিয়াস্কি স্ট্রীটে স্বাস্থ্য দপ্তরের বোর্ডের সভায় তিন চারবার হাজিরা দিতে হয় তাকে। শহরের অন্য প্রান্তে—রোজা লুক্সেমবুর্গ ইনটিটিউট স্ত্রীরোগ বিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠান, যেটা সামদেভইয়াটভের বাবা তার মাতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইউরা এখানে রোগ নির্ণয়ের সাধারণ লক্ষণ ও ঐচ্ছিক বিষয়ে বক্তৃতা দেয়।

ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ইউরা বাড়ী ফিরে দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত লারাকে দেখতে পায়, এখানে তাকে বাড়ীর মতোই মনে হয়। এছাড়া কখনো লারা কাটিয়াকে পড়ায়, কখনো চাকরির জন্য রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পর্কিত বইয়ে ডুবে থাকে। নিজ স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্তব্যের কথা ভেবে আত্মসংবৃত্ত ইউরার লারা বা কাটিয়ার প্রতি অমর্যাদাসূচক কিছু ছিল না, বরং একটা মমতা মিশেছিলো। আত্মবিরোধের বেদনা ও যন্ত্রনাকে অভ্যস্ত ক্ষতের মতোই মেনে নিয়েছিল ইউরা।

অক্টোবর মাস এসে গেল। একদিন ইউরা লারাকে বলল সে ভাবছে ইনস্টিটিউট ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজ ছেড়ে দেবে। সরকারের চিন্তাভাবনার সাথে ইউরার মিল হয় না। হয়তো এদিক দিয়ে ইউরা ভাবলো ভুল. কিন্তু ওদের সব কিছুই ঠিক, ইউরা যে একজন কুসংস্কারের পক্ষপাতী একথা মানতে রাজী নয় ইউরা।

ইউরা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, রোগনির্ণয়ের ব্যাপারে ইউরাকে ধন্বন্তরী মনে করে ওরা অথচ তারা সততাকে ঘৃণা করে। অন্য ব্যাপারটা যেটা ইউরা ভাবছে তা হলো মাইমেসিস। কি আশ্চর্যভাবে পারিপার্শ্বিকের বর্ণের সঙ্গে প্রাণীরা তাদের বহিরাবয়বকে মিলিয়ে ফেলে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় ইউরা। বক্তৃতা দেওয়াকালীন এসব কথার উত্থাপনের ফলে আদর্শবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ প্রভৃতির কথা এসে পড়েছিল। ইউরার মনে গ্রেপ্তারের ভয় বাসা বেঁধে ছিল।

লারা প্রত্যেক নতুন সরকারের ত্রুটির কথা উল্লেখ করলে—প্রথমে যুক্তির জয় হয় কুসংস্কারকে উচ্ছেদ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সন্দেহ, ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ দেখা যায়। কিছুদিনের মধ্যেই এ সমস্ত আলোচনার সমাপ্তি হোলো। হাসপাতালের পাশে বিধবা গোরেগ্লিয়াজেভার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে অস্ত্রশস্ত্রের এক চোরাই মালখানা ধরা পড়লো। অনেককে গ্রেপ্তার করা হলো, বাকীরা নদী সাঁতরে পালিয়েছে—এই রকম গুজব উঠল। হাওয়া জোরালো হয়ে উঠেছে। কাটিয়াকে নিয়ে লারার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সে ভাবছে শীতকালটা ভারিকিনোতে গিয়ে কাটাবে, সামডেভইয়াটভ সেখানে তাকে সাহায্যও করতে পারবে। ইউরার মতে, তিনজনেই মস্কোতে চলে যাওয়া। কিন্তু যেখানে পাশার ভাগ্য নির্ধারিত হবে সেই ইউরিয়াটিন ছেড়ে যেতে চাইলে না লারা। কাটিয়াকে সিমা টুন্টসেভার কাছে রাখার ঠিক হলো।

ষ্টেশন থেকে শূন্য হাতে ফিরে এলো ইউরা। প্রকৃতির মতোই ওর ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট অনিশ্চয়তায় ভরা।

ঘরে এসেই সোফায় সটান হয়ে শুয়ে পড়ল ও। তারপর ওঘর থেকে ভেসে আসা লারা আর সিমার কথোপকথনের মধ্যে কান রাখল। "সত্যিই, কাটিয়ার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি পাচ্ছি না। অথচ সব কিছু মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিবেচনা করে চলতে হবে আমাদের। কিন্তু আমি খালি নিজের কথাই বলে চলেছি, তোমার কথা বল এবার। লারার জবাব কর্ণগোচর হলো না ইউরার। সিমা বলে চলল, মানুষের দুটো অংশ আছে—একটা কাজ ও অপরটা

ভগবান, উভয়ে মিলে একটি মানুষ তৈরী হয়। মানবাত্মার বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় সবশেষে আগত খ্রীষ্টধর্ম তার সতেজ উদারতা ও নতুনত্ব নিয়ে জগতে নূতন দিগন্তের সূচনা করেছে। অনেকগুলো মন্ত্র আছে যেগুলো সমস্ত ধর্মেই আছে। এগুলির দ্বারা সর্বধর্মসমন্বয় সম্ভব হয়েছে। শাস্ত্রের বহু অংশে মারিয়ার মধুর মাতৃত্বের সঙ্গে ইহুদিদের লোহিত সাগর উত্তরণের তুলনা করা হয়। দুটি ঘটনাই অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, কিন্তু দুটি ঘটনাতে দুটি যুগের ভাবনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একদিন আমরা এক জাতীয় নেতাকে পাচ্ছি মুশার দণ্ডাঘাতে সমুদ্র সরে গিয়ে পথ করে দিয়েছে তাদের। অপরদিকে আর একজন সাধারণ রমণী একটি শিশুকে জন্মদান করছেন নিঃশব্দে গোপনে। যে সমগ্র "পৃথিবীর প্রাণ" হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। নতুন শাস্ত্র উপহার দিলো সাধারণের বদলে অসাধারণের, বাধ্যতার বিনিময়ে প্রেরণার, জাতির সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে ব্যক্তিবাদের।

ঈষ্টারের আগে, যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সন্ধিক্ষণে মারিয়া মাঙ্গলীনাকে স্মরণ করা হয়। তাকে প্রতি রাত্রে পাপের ব্যবসায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিপ্ত হতে হোত। তাই প্রভু যীশুর কাছে মিনতি করত তাকে ক্ষমা করতে। অনুতাপের অশ্রুজলে ভেজা মারিয়ার আন্তরিকতা ভগবানের কাছে পৌঁছেছিল, এই ভাবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের।

সোফায় শুয়ে ছিল ইউরা। তন্দ্রালু অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে ওঘরের কথা শুনতে পাচ্ছিল সে। এখন ইউরা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো ম্যাগপাই পাখীকে দেখতে পেলো উঠোনের উপর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে যে যার জায়গা খুঁজছে। এর পাখী দেখার অর্থ "বরফ" মনে হোল তার কিন্তু পাশের ঘরে সিমা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল ম্যাগপাই মানে "খবর"। ঠিকই বলেছিল সে, কেননা তার একটু পরেই গ্নাফিরা—সিমার বোন একটা দীর্ঘ চিঠি নিয়ে এলো। এর মালিককে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। চুল কাটতে গেছিল যখন ইউরা তখন তাকে চিনেছিল গ্লাফিরা—তাই সে চিঠিটা মালিক ইউরাকে দিতে এসেছে। চিঠিটা টোনিয়ার। ইউরা চিঠিটা পড়তে পড়তে পারিপার্শ্বিককে ভুলে যেতে লাগলো। টোনিয়া জানিয়েছে মেয়ের নাম মাশা দেওয়া হয়েছে। ক্যাডেট-দলভুক্ত ও দক্ষিণপন্থীদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে রাশিয়া থেকে। সে দলের মধ্যে কোলিয়া মামা, টোনিয়ার বাবা ও টোনিয়ারাও আছে। চিঠিগুলো টোনিয়া আন্টিপভার কাছে পাঠাচ্ছে—দেখা হলে সে ইউরার হাতে চিঠিটা দেবে এই

আশায়। টোনিয়া আশা রাখে রাশিয়া শান্ত হয়ে গেলে নিশ্চয় তার স্বামীর সাথে দেখা হবে। অভিমান জানিয়েছে, ইউরা তাকে ভালবাসে না। কিন্তু স্বামী ইউরার সাধারণ-অসাধারণ সংকিছুকেই ভালবাসে সে। প্যারিসে যাওয়ার ঠিক হয়েছে তাদের। মাশা বড় হয়ে গেছে কিন্তু যাবার কথা উঠলে কেঁদে ফেলে সে। লারার সাথে টোনিয়ার প্রসবের সময় আলাপ হয়েছে। কিন্তু ওর মনে হয়েছে লারা অকারণ জীবনকে জটিল করে তুলতে চায়। আর সময় নেই—বাঁধা-ছাদা করতে হবে তাকে। তাদের মধ্যকার অনন্ত বাধা অতিক্রম করে টোনিয়া এই মুহূর্তে তার স্বামীর সাথে দেখা করতে চায়—সেটা অকল্পনীয়। এ বিরহ অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে।

চিঠিটা পড়া শেষ হয়ে গেছে ইউরার। শুষ্ক উদাসীন চোখে শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সবকিছু ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে তার কাছে। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হতে শুরু করলো। আর পারছে না ইউরা ক্লান্ত দেহটাকে নিয়ে কোনরকমে সেটাকে সোফার উপর ফেলে অচেতন হয়ে পড়লো।

চতুর্দশ অধ্যায়

আবার ভারিকিনো

শীতের দিন। ঝরে পড়া বরফের উপর দিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল ইউরা। হল ঘরে লারার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে জানালো—কমারোভস্কি এসেছে এই ফ্লাটে। সে জানিয়েছে ইউরা, লারা ও পাশা ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে এবং তা থেকে একমাত্র সেই বাঁচাতে পারে। ইউরা চাইছিল না ওর সাথে দেখা হোক তার, তাই বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু লারার ব্যাকুল অনুরোধে থাকতেই হোল তাকে।

রাত নামলো পৃথিবীর বুকে। কমারোভস্কির জন্য অপেক্ষারত লারা র‍্যাশনের কালো রুটিকে কয়েক টুকরো করে রাখলো ও একটা রেকাবিতে সেদ্ধ করা কয়েকটা আলু রাখলো। তারা ঠিক করলো কমারোভস্কিকে খাবার ঘরে বসানো হবে। কিছুক্ষণ বাদে কমারোভস্কি হাজির হোলো, তার সর্বাঙ্গে বরফের কুচি লেগেছিল। ঢুকেই কোন শিষ্ট সম্ভাষণ না করেই নিজের চুল আঁচড়ে নিলে, রুমাল দিয়ে ভুরু ও গোঁফ মুছে নিলো, তার ডান হাত ইউরার দিকে ও বামহাত লারার দিকে বাড়িয়ে দিল। ইউরাকে জানাল তার বাবার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল সে। ইউরা সব কিছুর উপর ছেদ টানবার জন্য তাকে আসল কথায় আসতে বললো। সে জানালো লারা, পাশা ও ইউরা সত্যিই বিপজ্জনক অবস্থায় আছে যার সম্পর্কে তারা নিজেরা জানে না, লোকদের ধারণা তারা কমিউনিষ্ট রীতিকে প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করছে, তুমি তো পুরুষ নিজেকে ওভাবে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলো না—আমার কথায় লারা কানে তুলছে না কিন্তু সন্তানকে বাঁচাতে হলে আমার কথা শোনা ওর উচিত, তুমি একটু ওকে অনুরোধ কর।

না, আমি কখনোই কারোর উপর নিজের মত জোর করে চাপাই না, কিন্তু আপনার যুক্তিতর্কগুলো আমার জানা হয়নি।

কমারোভস্কি বললো পার্টির কর্মকর্তারা বিরাট পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে। তাহলে পিটুনি পুলিশের চাকরি যাবে সেইজন্য ছেড়ে যাবার আগে বীভৎসতা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। ওদের হত্যার তালিকায় ইউরার নামও আছে। অস্থায়ী

সরকারকে মেনে নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলি ও ভূতপূর্ব সংবিধানের সদস্যরা মিলে দূর প্রাচ্যে প্রজাতন্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সব কিছু দেখেও সোভিয়েত সরকার নির্বিকার। সাইবেরিয়া ও লালফৌজের মাঝে ফালতু রাষ্ট্র থাকলে তাদেরই সুবিধা, কমারোভস্কিকে বিচার মন্ত্রীর পদ দিতে চাচ্ছে তারা, সোভিয়েত সরকারের মৌন সম্মতি আছে এতে। যদি চায় ইউরাও লারিসাকে জাহাজে করে নিয়ে বিদেশে চলে যেতে পারে কেননা ইউরার পরিবার মস্কোতে আছে একথা সকলে জানে। স্ট্রেলনিকভের খোজ নিতে সাইবেরিয়ায় লোক পাঠিয়েছে সে, ওখান থেকে স্বাধীন রাজ্যে আসতে পারে। স্ট্রেলনিকভকে ছেড়ে দেবার জন্য মস্কো সরকারের কাছে প্রস্তাব করবে যে এরা তার বদলে একজনকে ধরিয়ে দেবে যাকে মস্কো সরকার খুঁজছে। ভাল লাগছিলো না লারার, কিন্তু এই অর্ধসমাপ্ত পরিকল্পনাকে মেনে নিতে পারল না। লারাও ইউরাকে ফেলে যেতে রাজী নয়। কমারোভস্কি আলু সেদ্ধ চিবোতে চিবোতে কোহল খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল।

রাত বেড়ে চলল। ইউরা ও লারার বড় ঘুম আসছে কিন্তু কমারোভস্কির উপর কোন তাগিদ দেখা যাচ্ছিল না। বকবক করেই যাচ্ছিল—সাইবেরিয়াতে অনেক আশ্চর্য কিছু ঘটতে পারে। বিরাট সম্ভাবনা আছে বহির্মঙ্গোলিয়ার। তার উর্বর জমিগুলোর দিকে সব লোকের লোভ, খনিজ সম্পর্কে সমৃদ্ধ জায়গাটা। মঙ্গোলিয়া সামন্ততন্ত্রে রয়ে গেছে। চীন সুযোগ পেয়ে শোষণ করছে তাকে। জাপান হোশুন নামক স্থানীয় যুবরাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। রাশিয়া হামাজিলদের বন্ধুত্ব পেয়েছে, স্বাধীন নির্বাচনে "হরুল টায়িরা" জিতলে সত্যিকার উন্নত হবে মঙ্গোলিয়ার। আর, ইউরা লারা যদি একবার সেখানে গিয়ে পড়তে পারে বাতাসের মতো স্বাধীন হয়ে উঠবে।

বিরক্ত লারা তাকে বাড়ী ফেরার কথা মনে পড়িয়ে দিল। কিন্তু কমারোভস্কির যাবার মতো অবস্থা ছিল না, নেশাখোর হয়ে উঠেছে সে, রাত কাটানোর জন্য তাকে বাধ্য হয়ে একটা ঘর ছেড়ে দিতে হল, যদিও সেখানে ইঁদুরের উৎপাত তখনও ছিল।

লারা বিষণ্ন, অনেক চিন্তা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। ইউরা তার শারীরিক কুশলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। লারা জানাল হাসপাতালের দারোয়ান ইজট একতলার ধোপানীকে ভালবাসে, সে এখানে আসে রোজ। তারা জানিয়েছে ইউরার ভীষণ সঙ্কটজনক অবস্থা। ইউরা স্থির করলে লারাকে নিয়ে ভারিকিনোতে

গিয়ে গা ঢাকা দেবে। লারার খুব একটা অনিচ্ছা ছিল না কিন্তু ঘরগুলো ইউরার বাসযোগ্য নয় বলে সে মিকুলিৎসিনের বাড়ীর কথা ভাবছিলো। এরই মধ্যে ইউরা কমারোভস্কি চলে গেছে কিনা তার খবর নিলো। ইউরা আফশোষ করছিল তাদের দুজনেরই কমারোভস্কির প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করার জন্য। লারকে কাটিয়ার কথা তো ভাবতে হবে। আবার ভারিকিনোতে পাঠানো খাবার ওখানকার জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। সামদেভইয়াটভের কাছ থেকে একটা ঘোড়া চেয়ে নিতে হবে ও চোরাই চালানকারীদের কাছ থেকে কিছু আলু ও ময়দা। বিচ্ছেদ হবেই তার। লারার সাথে যে কটা দিন পাওয়া যায় তা লারার সান্নিধ্যেই কাটাতে চায় ইউরা। লারার প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে ইউরা।

নাইট ড্রেস না পরে লারা বিছানায় শাল জড়িয়ে কুঁকড়ে শুয়ে ছিল। ইউরা তার বিছানার পাশে বসে কথা বলছিল। উদ্বেলিত আবেগে লারা কখনো কাঁদছিল, কখনো কনুইতে ভর করে ইউরার দিকে হাঁ করে দেখছিলো। ইউরা তার আশ্রয়দাতা, ইউরাকেও কম ভালবাসে না লারা, তার ধারণা হয়েছিলো সে অন্তঃসত্বা কিন্তু ইউরার মতে লারার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কুয়াশায় মোড়া ইউরিয়াটিনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ওরা। সেদিন ছুটির দিন না থাকাতে অনেকের সাথে দেখা হলেও তাদের এড়িয়ে যাচ্ছিল ওরা। সামদেভইয়াটভ উল্টোদিক থেকে হেঁটে আসছিলো, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল তারপর কমরোভস্কিকেও পাশ কাটিয়ে চলে গেল। গ্লাশা টুন্টসেভা রাস্তার অপর পার থেকে চিনতে পেরে ডাকছিলো ওদের, ওর ধারণা আলুর খুঁজে চলেছে ওরা। হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ইউরারা এগিয়ে চলল। শুধু সিমার জন্য অশ্বের গতি একটু কমাতে হল। আপাদমস্তকে শাল জড়ানো সিমা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে শুভকামনা জানাল। অবশেষে শহরের শেষ সীমা পেরিয়ে গেল ওরা। স্লেজ চালাচ্ছিল ইউরা, তাদের খাবারের থলে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ একসঙ্গে বাঁধা আছে। ইউরার হাতের চাবুক খেয়ে ঘোড়াটা দ্রুতবেগে ছুটে চলল, অসমতল রাস্তায় মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটছিল স্লেজগাড়িটা। ঝাঁকুনিতে খড়ের গাদার ওপর গড়িয়ে পড়ছিল লারা ও কাটিয়া। ইউরা ছেলেমানুষের মত এক মজা অনুভব করলো এসব দেখে। ইচ্ছে করে ঝাঁকুনি দিয়ে ওদের ফেলে আবার গাড়ীতে তুলে ছুটে চলছিল সে। ইউরা বলল এবার সেই জায়গাটা দেখাবে, যেখান থেকে পার্টিজানরা তাকে নিয়ে গেছিল। কিন্তু শীতের বন তার পাতা ঝরিয়ে রিক্ত হয়ে শুধু কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠিকমতো চিনতে না পেরে মাঠের

মধ্যকার বোর্ডটার কাছটা দেখিয়ে দিলে সে। এখান থেকেই তাকে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

ভাম্বিকিনোতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। প্রথমের বাড়ীটাই জিভাগোর, হুড়মুড় করে তারা ঢুকে পড়লো বাড়ীতে। অন্ধকার হবার আগেই লারা চটপট সব কাজ করে নিতে চেষ্টা করছিল। ঘোড়াটাকে গোলাঘরে নিয়ে গিয়ে রাখলে। ঘরের ভেতরটা পর্যবেক্ষণ করতে লারা দেখল ইউরার ছেলের খাট – যেটা তার কাটিয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত। ইউরার চুল্লীর খুব প্রশংসা করলে লারা। কিন্তু নির্বাক ইউরাকে দেখে বুদ্ধিমতী লারা মিকুলিৎসিনের বাড়ীতে যাবার কথা বললো। আবার স্লেজে উঠল ওরা।

সেখানে পৌঁছে ওরা দেখলো দরজায় তালা দেওয়া, মুচড়ে মুচড়ে তালা খুলে হুড়মুড় করতে করতে ঢুকে পড়ল ওরা। বাড়ীর ভিতরকার কোন কোন ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন বিশেষতঃ মিকুলিৎসিনের পড়ার ঘরটা ভালো লেগেছিল ইউরার। ইউরা ভেবে পেল না এখানে কে এসে বাস করে মাঝে মাঝে। মিকুলিৎসিন নয় এটা নিঃসন্দেহে, সে হলে সমস্ত বাড়ীটাই পরিচ্ছন্ন থাকতো। লারা ও কাটিয়ার এ ব্যাপারে কোন আকুলতা দেখা গেল না। যদি পলাতক সাদাদের কেউ হয় তাহলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে ইউরাকে, সমস্ত ঘরের মধ্যে পড়ার ঘরটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে ইউরার, উঠানে অনেকগুলো ঘর তালাবন্ধ হয়ে আছে। ঘোড়াটাকে গোলা ঘরে রাখল ওরা, তাকে জল ও খড় খেতে দিল। ফার কোটগুলি কম্বলের মতো মুড়িয়ে নিয়ে, জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই পরিশ্রান্ত ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

জেগে ওঠার মুহূর্ত থেকেই টেবিলটা দেখে কিছু লেখবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। পুরানো কতকগুলি ভাবনাকে এক করে একটা কিছু লিখবেই সে। শুধু সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা—কেননা তার আগে অন্য কাজ করতে হবে, লারাকে তার কাজে সাহায্য করতে হবে।

লারা চুল্লীতে কাঠ দিতে ব্যস্ত। ইউরার একটা টবের প্রয়োজন জামাকাপড় কাচার জন্য। লারা জানাল আগের দিনে একটা টব দেখেছিল কিন্তু ঠিক কোথায় মনে পড়ছে না। লারা এবার জামাকাপড় কাচবে। একসঙ্গে সাবান গুলে নেবে, অর্ধেকটা মেঝে পরিষ্কারের জন্য রাখবে। টব পাওয়া না গেলে বেসিনে কেচে

নেবার মনস্থ করলো, যদিও সেটা একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। জল গরম হয়ে গেছে, ইউরা ও লারা ছুটে ছুটে কাজ শেষ করছে। কাটিয়ার বড় শীত করছে সে আর বেশী ছুটতে পারছে না। ঠাণ্ডা ভাঁড়ার ঘর থেকে মিকুলিৎসিনদের পুরোন খেলনাগুলো এনে দিল ইউরা। প্রথমে বড় বড় ভাব দেখালেও শেষকালে খেলনাগুলো নিয়ে একটা ঘর সংসার সাজিয়ে ফেলল কাটিয়া, লারা দেখতে দেখতে ভাবছিল সব মেয়েই ঘর বাঁধতে চায়। শিশুরা সত্যকে ভয় পায় না, তারা সরল কিন্তু বড়দের অনেক কিছু মানতে হয়, তার ফলে আসল সত্তা অনেক দূরে সরে যায়।

"এই যে একটা টব পেয়েছি, সিলিঙের ফাটলের তলায় ছিল এটা"—পোর্টিকো থেকে আসতে আসতে বলছিল ইউরা।

সঙ্গে আনা রসদ নিয়ে, আলুর স্যুপ, রোস্ট মটনের সঙ্গে আলু দিয়ে খুব ভালো করে রান্না করেছিল লারা। খেয়ে উঠেই শাল, গায়ে দিয়ে কাটিয়া শুয়ে পড়ল। উনুনের আগুনের তাপে স্থস্থ হয়ে উঠেছে লারা, বাসনগুলো না মেজে খাটে শরীরটাকে এলিয়ে বসেছিল সে। ঘরকন্নার খাটুনি ভাল লাগে লারার কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এসবের কোন মূল্যই সে দেখতে পাচ্ছে না। বাড়ীটা ইউরার এটা টোনিয়া ও ইউরার ঘর-সংসার, সেখানে খুব বেশী মর্যাদা কোথায় লারার? ইউরা জানালে কমারোভস্কির প্রস্তাবটা ভেবে দেখার সময় আছে এখনও, সামডেভইয়াটভের কাছে ঘোড়াও পাওয়া যাবে, লারা ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। লারা বুঝতে পারলে ইউরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। যে অপরিচিত লোকটার উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে সে গুণ্ডাও হতে পারে আর ইউরার কাছে একটা বন্দুকও নেই, আর ভাবতে পারছে না লারা। তার সমস্ত চিন্তা ভাবনার ভার ইউরাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় সে। হয়তো কাটিয়ারও কষ্ট হচ্ছে—তার প্রতি স্নেহ অনুভব করল লারা।

ধীরে ধীরে দেশ শান্ত হয়ে আসছে। ইউরা ভাবছে এখানে আরও ছমাস থাকার মত রসদ যদি সামডেভইয়াটভ যোগান দেয় তাহলে কিন্তু বই লিখেও ইউরা কিছু অর্থোপার্জন করতে পারবে। লারাও ঐরকম একটা কিছু চিন্তা করেছিলো। তাই ইউরাকে, তাকে শোনানো স্বরচিত কবিতাগুলোকে গুছিয়ে লিখে ফেলতে বলছিল।

দিন শেষ হয়ে এসেছে। ওরা তিনজনে গরম জলে স্নান করে নিল। লারার অনুগ্রহে ঘরটা পরিচ্ছন্ন সুন্দর লাগছে। এখন রাত একটা। লারা ও কাটিয়া

পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়ে ধবধবে বিছানায় ঘুমোচ্ছে। শান্ত মন নিয়ে সে "ক্রিসমাসের তারা", "শীতের রাত্রি" প্রভৃতি এধরণের কবিতার প্রতিলিপির পর প্রতিলিপি করছে। প্রথমটার থেকে পরেরটা আরও সুন্দর হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে তা মূল বিষয় থেকে সরে অন্য বিষয়ের অবতারণা করছে। এসব ছেড়ে নতুন কবিতা লিখতে আরম্ভ করলো ইউরা। তার চিত্রকল্প রচনায় নিজেই মুগ্ধ, ইউরার মনে হয় এটা তার নিজের রচনা নয়, কোন এক অদৃশ্য শক্তি ভর করে তাকে দিয়ে এগুলো লিখিয়ে নেয়।

কাগজের ওপর থেকে মুখ তুললো ইউরা। লারা ও কাটিয়া গভীর ঘুমে ডুবে আছে। তখন তিনটে বাজে। হঠাৎ দূর থেকে শোকার্ত চীৎকার শুনতে পাওয়া গেলো। ইউরা কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আবছা অন্ধকারে চারটে নেকড়ের মূর্তি দেখা গেল। কিন্তু ইউরাকে দেখামাত্রই তারা কোথায় ছুটে পালালো। ভালো বুঝল না ইউরা, সে ফিরে এলো মনস্থ করলো এই নেকড়ের সম্পর্কে লারাকে কিছু বলবে না। "তুমি এখনো লিখছো"—লারার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইউরাকে কাছে আসতে বললো। আলো নিভিয়ে দিল ইউরা।

পরদিনও সেইরকমই নিরুদ্বিগ্নে কাটাল তারা। আকাশে রোদ আর জলের লুকোচুরি। নীচের উঠোন থেকে কাটিয়ার উৎফুল্ল গলার স্বর ভেসে আসছে। ইউরা ও লারা দুজনে ঘরবাড়ী পরিষ্কারে ব্যস্ত। চলন্তি পথে মাঝে মাঝে দুজনের দেখা হচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য থামে, তারপরেই সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচকিত হয়ে দ্রুত নেমে যায় নীচে অপচয়িত সময়ের অব্যবহারের পরিপূরণে। সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখে ইউরা। নোংরা জায়গাগুলি পরিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিছানার ওপরে ক্লান্ত দেহটিকে ছুঁড়ে ফেলে ইউরা। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে টেবিলের দিকে তাকায়। ও যেন বুঝতে পারলো এই সুখ চিরকাল তার জন্য অপেক্ষা করবে না, তার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। তার প্রেমিকা লারা চলে যাবে অনেক দূরে ···· না, না সেকথা ভাবতে পারছে না ইউরা, যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে ওঠে ওর শরীরটা।

খাদের পাশের নেকড়েগুলো যেন ঐ বিরুদ্ধ শক্তি—ওদের হাত থেকে বাঁচতে হবে নিজেকে, বাঁচাতে হবে কাটিয়াকে ও লারাকে। ঐ জন্তুগুলো যেন তাদের নখ ও দাঁতকে শানাচ্ছে ইউরা ও লারার নরম মাংসকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খাবার জন্য।

ঘরের ভেতর অন্ধকারে উঁকি দিল। লারা বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল কাটিয়ার পাশে। আস্তে আস্তে উঠলো ইউরা, টেবিলে গিয়ে লিখতে শুরু করলো। পুরানো লেখাগুলো দেখতে লাগলো, ওরা যেন তার আগেকার চিন্তা-ভাবনার স্বরূপকে প্রকাশ করছে। লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে গেল ইউরার চোখ, এর আপাত দুর্বোধ্য জটিল রহস্যময় চিহ্নগুলো যেটা কালকের বোধগম্য ছিল আজ তা কষ্ট-কল্পনার উগ্রতার ফল।

এই কবিতার মতই প্রচ্ছন্ন মৌলিকতা ধ্যান করেছে সে সারাজীবন। এমনি এক সরল সহজ পরিচ্ছন্ন মার্জিত ভাষারই স্বপ্ন দেখেছে সে। তারই জন্য সে কঠোর পরিশ্রমের সাধনা করেছে। কাল চেয়েছিল সে এমনভাবে লিখতে যেগুলো একই সঙ্গে যন্ত্রণা ও প্রেম, আশঙ্কা আর নির্ভর—এই ভাবটাকে পরিস্ফুট করে। যার সুর ভাষা হতে ভাবের অন্তঃলোকে মনকে নিয়ে যায়।

বিরক্ত হয়ে খস খস করে সব লেখা কেটে দিল ইউরা। নতুন করে লেখবার জন্য পেন্সিল তুললো। এই অসংলগ্ন ভাবসূত্রকে ছেঁটে ফেলে ছোট ছোট পঙক্তির মধ্যে লেখাকে এবং ভাবকে সংহত করল ইউরা। যখন কলম চলতে লাগল অপ্রতিহত গতিতে তখন উৎসাহ ও উত্তেজনায় ইউরাও দুরন্ত গতিতে ছুটে চললো ছন্দের তালে তালে পা রেখে। অবশেষে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে, মূর্ত কথার স্রোতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে তখনই পিঠে একটা নরম হাতের স্পর্শ অনুভব করলো।

দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে লারার দিকে চেয়ে চমকে উঠলো। শুকনো ফ্যাকাশে মুখে ফিস ফিস করে লারা বললো, নীচের রাস্তায় কুকুরের ডাক শুনছো? আমার মনে ওরা অশুভ অমঙ্গলের দূত। আজ রাতটা কোনরকমে কেটে গেলে কাল সকালে ভারিকিনো ছেড়ে আমাদের চলে যেতেই হবে।

ও বিছানার ধারে চলে যেতেই জানালা দিয়ে ইউরা দেখলো দূরের নেকড়েগুলোর ছায়া আরও স্পষ্ট। ওদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে।

ভারিকিনোর প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর, কিন্তু একঘেয়েমির ফলে লারা বা ইউরার চোখে তারা মরে গিয়েছিল। সকাল বেলা উঠেই লারা ইউরাকে গত রাত্রের কথা মনে করিয়ে দিলো। আবহাওয়া প্রমাণ করে যে কোন মুহূর্তে বরফ পড়া শুরু হতে পারে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, উত্তেজনায় আর অবসন্নতায় শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই ইউরা বড় ক্লান্ত। চিন্তা করার কোন ক্ষমতা নেই এখন তার।

ওরই মতো এক নীরব অস্বস্তিতে লারাও ভুগছে। নিয়ম-নির্দিষ্ট কাজের জন্য ওরা প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছে। আজ সকালে অবশ্য সে প্রতিদিনের কোন কাজের মধ্যে শিথিলতা আনেনি। ইউরা জানে লারার কথায় সায় দেওয়া বোকামি। নতুন জায়গায় যাবার বিপদ ও অনিশ্চয়তা তাদের এখানের থেকেও তখনকার জীবনকে আরো বিপদগ্রস্ত করে তুলবে। অথচ ইউরার কাছে আত্মরক্ষার একটা অস্ত্রও নেই।

কয়েকবার ব্যর্থ হয়ে ঘোড়ায় জিন পরালো। ঘোড়াটা চিঁহি করে ডেকে উঠলো, ইউরা তখন ভাবল ও খুশীতে চীৎকার করে উঠেছে। জিনিষপত্র গুছোতে কিছু সময় কেটে গেল। বড় বড় কাঠের সঙ্গে ছোট কাঠগুলোও নিল। তারপর স্লেজটাকে টেনে এনে গোলাঘরে রেখে খড় চাপা দিল। বাড়ীতে ঢুকতেই যেন চাবুক খেল ইউরা। দূর থেকে লোকটার গলা আসছে, যার সঙ্গে প্রতিবাদ করতে করতে লারা কেঁদে ফেলছে, সেই লোকটি হল কমারোভাস্কি। ও ইউরার বিরুদ্ধে লারাকে উত্তেজিত করে তুলছে। দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো ইউরা, সে ঢুকতেই ওরা দুজনে তার দিকে ছুটে এলো। "আবার আমি এলাম"—কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে লারা বলল, "তুমি কোথায় গিয়েছিল? উনি কি বলতে চাচ্ছেন শুনে নিয়ে শীঘ্র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত তৈরী কর।"

সবাইকে বসতে বলে পাশের চেয়ারটায় ইউরাও বসলো। তারপর ভিক্টর ইপ্পোলিটোভিচ্-কে বলল, বলুন কি বলছেন? —শুনুন, ইউরা আন্দ্রেইয়েভিচ, ইউরিয়াটিন রেলস্টেশনের সাইডিং-এ এক দূর প্রাচ্য রাষ্ট্রের সরকারী এক ট্রেন গতকাল মস্কো থেকে এসে পৌচেছে। আগামীকাল পূর্বের দিকে যাত্রা করবে। ট্রেনটা আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রীদপ্তরের। তোমার বুদ্ধির ওপর আস্থা আছে আমার। তাই বলছি লারিসার কথা মনে করে তুমি আমাদের সঙ্গে ভাডিভস্টক পর্যন্ত—অন্তত ইউরিয়াটিন পর্যন্ত এসো, তাড়াতাড়ি কর, আমার গাড়ী নীচে অপেক্ষা করছে। তোমার ঘোড়াটা নিচে আছে না? ওর সাজ পরিয়ে নাও তাড়াতাড়ি,—থাকগে, আমাদের সঙ্গেই চলে যেতে পারবে। "আমি দুঃখিত ভিক্টর, আমার মনস্থির, সিদ্ধান্ত বদল করতে পরেলাম না, আপনি বরং ······ খালি লারা যেতে চায় তাকে নিয়ে যান। আমার জন্য ব্যস্ততার প্রয়োজন নেই।"

"চুপ কর ইউরা, তুমি ভালো করে জান যে তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও যাবো না, তোমার বিপদের জন্য কাউকে চিন্তা করতে হবে না? বাঃ খুব সুন্দর!"

বেশ, তোমরা যদি না যেতে চাও—নিজের ভঙ্গীতে ভিক্টর বলল, ইউরা তোমার সাথে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

বেশ চলুন আমরা রান্নাঘরে যাই, লারার সামনে ওরা বেরিয়ে গেল।

"আপনি সত্যি কথা বলছেন, পাশাকে বিচারের পর গুলি করে মারা হয়েছে? কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, লারাকে একথা জানাবেন না।

"পাগল একথা ওকে কখনো বলা যায়। কিন্তু লারা ও কাটিয়াকে বাঁচানো দরকার। এদিকে ওরা তোমাকে ফেলে যাবেও না কোথাও। তাই বলছি তোমায়, তুমি ওকে ইউরিয়াটিন স্টেশনে পাঠাও ও ভান কর যেন তুমিও ওখানে পরে যাবে, আমি কথা দিচ্ছি তোমায় যে তোমাকে সেখানে যাবার সুবিধে করে দেব। এর জন্য তোমাকে ভানও করতে হবে। তুমি ওকে বলবে যে স্লেজগাড়ী করে ওদের আগে বেরিয়ে পড়তে, পরে তুমি যাবে। ওর শঠতার ও ষড়যন্ত্রের জালে নির্বোধের মত ধরা দিল ইউরা। "বেশ, তাই হোক! আমাদের দুজনের সাময়িক-বিচ্ছেদ যদি ওকে বাইরে নিয়ে যেতে পারে তবে আমি খুশীই হবো। কিন্তু... আপনার প্রস্তাবে রাজী হওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়। ওকে আমি ভালোবাসি, ওর অভাব আমাকে বিমর্ষ করে তুলবে। কিন্তু সে যাক। আপনারা সাবধানে যাবেন। —ওর জন্য কিছু ভাববেন না। সব রকম ব্যবস্থা নিয়েই আমি আসছি।

চলে গেল ওরা, কমারোভস্কি যা বলেছিল তার একটুও ব্যতিক্রম ঘটায়নি ইউরা। কিন্তু ও চলে যেতেই বিভিন্ন প্রকৃতি এসে এক যোগে আক্রমণ করলো নিঃসঙ্গ ইউরাকে। একজন বললে ছুটে গিয়ে লারাকে ফিরিয়ে আনতে। ওর প্রতি ইউরার নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করবে। আর একজন বললে—না, না, ইউরা ভুল করেনি। ইউরা ওকে ভালবাসে তাই তার নিরাপত্তার জন্য কমারোভস্কির হাতে ওকে সমর্পণ করেছে। কমারোভস্কির ওপর তার অযথা সন্দেহ জাগছে, ও ঠিক গাড়ী পাঠাবে। যাবার সময় পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে লারাকে মিথ্যে আশ্বস্ত করছিলো। ওর সঙ্গে একটা ভান করছিলো।

ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো ইউরা। তারপর খাদের ধার ধরে দূরের দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টিকে প্রসারিত করে বনের শেষ প্রান্তে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো একটু আগে হারিয়ে যাওয়া স্লেজগাড়িটাকে।

ওরা আসছে, ওরা আসছে, কি নির্বোধ ইউরা, এতক্ষণ সে শুধু কমায়োভস্কিকে সন্দেহ করে আসছে। ঐ যেখানে সূর্য খাদের নীচে অস্ত যাচ্ছে সেইখান থেকে লারা উঠে আসছে।

কিন্তু আস্তে আস্তে চারিদিকে যেন অন্ধকার নেমে এলে যা কিছু স্পষ্ট ছিল সবকিছু আবছা অস্পষ্টতায় ঢেকে গেল। গাঢ় ধোঁয়াটে কুয়াসা সব কিছুকে গ্রাস করলো। তবুও ইউরা আশা করতে লাগলো—এবার বুঝি লারা আসবে। কিন্তু সূর্যের সোনালী আলোয় ঘন লাল আভা দেখা গেল, আস্তে আস্তে সেটা ব্রোঞ্জের মত লাল হয়ে উঠল, তারপর সেটা লাইল্যাক রঙের হলো ধীরে ধীরে, অবশেষে সেটা গোলাপী হতে ছাই রঙের—তারপর ঘন গাঢ় নিঃসীম নিস্তব্ধ অন্ধকারে ডুবে গেল।

ব্যর্থ নিরানন্দ ইউরা ঘরে ফিরে এল। ঐ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শক্তি অস্ত গেছে। বিছানায় শুয়ে লারার শরীরের গন্ধ ওকে নিবিড় স্বপ্নে আচ্ছন্ন করলো। ওর ভবিষ্যৎকে মধুর করে তুললো নানা রঙিন কল্পনা ও বেদনা, ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা—সব কিছু থেকে ওকে দূরে রাখলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এবার আমি মস্কো যাব ও সাগরের বুক থেকে তুলে আনা মুক্তোর মত লারার প্রেমকে সযত্নে বুকের কৌটায় তুলে রাখব। এমনি করে আর কোন শয়তানের হাতে তুলে দেব না। চোখ দিয়ে কখন যে জল পড়ছে বুঝতেও পারেনি—ওর একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ গায়ে লাগতেই উঠে পড়ল ইউরা। পাঁজর কাটিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল সেই শূন্য ঘরের দেওয়ালে।

ক্রমাগত এই মানসিক অস্বস্তি ইউরাকে যেন পাগল করে তুলল। এই কদিনে আর বাড়ির বাইরেও যায়নি ইউরা। শুধুই লারাকে নিয়ে কবিতা লিখে চলেছে অনর্গল, পেটের নাড়ি ক্ষুধায় জ্বলে যাচ্ছে, সেখানের সেই খাদ্যাভাব পূরণ করছে ভদকা।

যতই লিখছে ইউরা, কিছুতেই বাস্তবে লারাকে সেখানে রাখতে পারছে না। তার কল্পনায় যে লারার প্রতিমূর্তি জাগছে সে বর্তমানের স্ত্রী ও লারা নয়। সে যেন তার মানসসুন্দরী, তার কল্পনার নায়িকা।

তার অজান্তে কখন লারার কবিতার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতি। দৈনন্দিন জীবন ও অন্য নানা বিষয়। শীতের হিমেল হাওয়ায় পাতাগুলো তার বিবর্ণ হয়ে যায়। বসন্ত এলে সে যেন জীবন ফিরে পায়। কঠিন রোগগ্রস্ত শিশুর মুখের হাসির মত নরম কোমল প্রাণস্পন্দনের উল্লাস জেগে উঠে। এ দৃষ্টি

জেগেছিল টলস্টয়ের চোখে। তিনি ইতিহাসের স্রষ্টা হিসাবে নেপোলিয়নকে মানতে পারেননি। তাঁর মতে ইতিহাসের স্রষ্টা কেউ নেই। যুদ্ধ, বিপ্লব, রাজা রবসপিয়রের দল হল ইতিহাসের সৃষ্টি। তার জৈব ঘটক। একবার যদি বিপ্লব শুরু হয় প্রাকৃতিক কিংবা জৈব জগতের কোণে তাহলে সেটা দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে বছর, বছর থেকে যুগ, যুগ থেকে শতাব্দী, শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে চলে অব্যাহত গতিতে। কাঁদতে কাঁদতে ইউরার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। তবু লারার দেখা পেল না। যে বেদনায় একদিন সৃষ্টির প্রথম দিনে ধরিত্রীর বুকে জেগেছিল সেই বেদনা, সেই বেদনা জাগল আজ ইউরার বুকে। সাহিত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের যোগ বড় গভীর। মানুষের দেহের সঙ্গে প্রাণের যে সম্পর্ক শিল্পকলার সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক তেমন।

এই নিঃসঙ্গ দীর্ঘ জীবনে ইতিহাসে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। সামডেভইয়াটভ একদিন এসেছিল, বলেছিল ইউরাকে সে ভারিকিনো থেকে নিয়ে যাবে। কাজ করতে করতে লারার অভ্যস্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ইউরা। অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একদিন রাত্রে ইউরা যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে ছিল তার বিছানায় তখন দূর থেকে একটা রাইফেলের গুলির শব্দ ও প্রতিধ্বনি তার কানে এল। ওটা কোন স্বপ্ন ভেবে ইউরা আমলই দিল না।

সকাল থেকেই অধীর আগ্রহে সামডেভইয়াটভের প্রতীক্ষা করছিল ইউরা। বাইরের অন্ধকার নেমে আসার আগেই কার পদধ্বনি যেন তার কানে এসে লাগল। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল ও। যখন ঘরের দরজায় আগন্তুকের হাতের স্পর্শ শোনা গেল তখন মিকুলিৎসিন ভেবে ইউরা আগন্তুককে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঘুরে দাঁড়াল। সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সে মিকুলিৎসিন নয়। ওর শক্তিশালী উন্নত দেহ ইউরাকে কিছু চিন্তায় ফেলল।

পুরানো স্মৃতি কোঠায় হাতড়ে হাতড়ে ইউরা খুঁজে পেল এই আগন্তুকের পরিচয়—ষ্ট্রেলনিকভ।

পাগলের মতো দুজনে ক্রমাগত কথা বলে চলল। বিপ্লবীর অপ্রকৃতস্থতায় ভুগছে ষ্ট্রেলনিকভ। তার ফেলে আসা যন্ত্রণাময় স্মৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে মনে মনে আকুলি বিকুলি করছে। সব কিছু বলে নিজেকে হালকা করতে চাইছে।

জীবনে অনেক সম্মান সে পেয়েছে, কুড়িয়েছে অনেক অসম্মানও। খ্যাতি

আর অপবাদের যুক্ত রথচক্রের তলায় সে ক্রমাগত পিষ্ট হতে হতে আজ বড় ক্লান্ত রিক্ত, অবসন্ন। 'দেরাজ আলমারির এই কাগজগুলি দেখছেন ওগুলো সাইবেরিয়া দখল করার সময় আমার হাতে এসেছে। এই সঙ্গে এসেছে যুদ্ধের কালের সেই সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস, মোমবাতি দেশলাই, কফি, চা, কেক সব। আমার স্ত্রী ও মেয়েকে দেখবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল। ওরা যে এখানে এসেছে এবং ডাক্তার জিভাগোর তত্ত্বাবধানে আছে লোকের মুখে শুনে ওদের সাথে দেখা করার জন্য এসেছি। এখন আমি মিথ্যা অভিযোগে আসামী, একবার ভেবেছিলাম বাড়ী ফিরব না, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করব। কিন্তু সেদিন একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হল সে বাঁচবার জন্য পালাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সেদিনই পালানো ঠিক করলাম।'

স্ট্রেলনিকভের মুখে ছেলেটির বর্ণনা শুনে ইউরা চিনতে পারল—সে, টেরেন্টি গালুজিন।

স্ট্রেলনিকভ বলে চলল, যার বাবাকে গুলি করে মারা হয়েছে, যার মাকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সেই ছেলেটি ওর মাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই, আমি লুকোবার জন্য পার্টিজানদের বলে দিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আমি পালাতে পেরেছিলাম, অনেক দিন পর্যন্ত ওরা চিতার আশে পাশে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু পায়নি, এই কদিন আমি ঘুমোতে পারিনি, খেতে পারিনি। কাল রাত্রি হবার আগেই আমি বোধ হয় গ্রেপ্তার হয়ে যাব। আপনি থামবেন না, কথা বলুন, আমার অনুরোধ—আর এই ক্ষণিক সময়টুকু নীরবতায় পূর্ণ করে আমাকে দগ্ধ করবেন না। আমি আপনাকে বিপ্লবের কথা বলছি।

আমি জানি আপনি অন্যভাবে মানুষ হয়েছেন। আপনার পাশাপাশি বাস করেছে ধনী ও নিধর্নের—মূর্খ আর পণ্ডিতের উদ্ধত নির্লজ্জ জগৎ, তবুও আপনারা কিছু বুঝতে পারেন নি অথবা বুঝতে চান নি।

কিন্তু আমি জানি জীবন মানে অভিযান। তাই বলছি আমাদের জীবনে পদে পদে বিপদ—আপনি ওরা আসার আগেই চলে যান কোথাও। মানুষের থেকেও নেকড়ে কিছু এমন ভয়ঙ্কর নয়। তাই রাতে গুলি ছুঁড়েই ওদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছিলাম। কিন্তু কি বলছিলাম যেন?

আপনি সেই বিপ্লবের কথা বলছিলেন, ইউরা বলল।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে মস্কো আর রাশিয়ার মতই এইসব বিলাস। কেন্দ্রস্থল

শহরে রাস্তার লাম্পট্য আর সৌখিনতার নোংরা রুচিতে ভরে গেছে। সব বীরত্ব, কদর্য্যতা আর বস্তীর পাপাচার কত মানুষের মর্যাদা ছিড়ে টেনে এনে রাস্তায় টেনে ফেলে দিয়েছে। আবার কত অহংকারী নির্বোধ স্বার্থপর মানুষের প্রাণাধিক দম্ভকে দমন করে উনিশ শতকীয় সোস্যালিজমের জন্ম দিয়েছে।

আমার বাবা ষ্টেশনের ফোরম্যান। ওর মুখে সেই যুগের সব কথা যেন পড়া যেত। সেই যুগের ত্রস্ততা, সাবধানতা, অশান্তি সেই ছোট্টবেলায় আমাকে বিস্মিত করে তুলত। উনিশ শতকের প্যারীর বিপ্লব, পৃথিবী জুড়ে শ্রমিকদের আন্দোলন—যাদের প্রাণ সত্তার ইউরোপের পার্লামেণ্ট আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মার্কসবাদের প্রসার চিন্তায়. এই নতুন গতি তার অভিনবত্ব, তার দ্রুত সমাধান, তার ব্যঙ্গ সবকিছুই আত্মস্থ করেছিলেন লেলিন। তাঁরই মধ্যে দিয়ে এই নতুন চিন্তা পুরনো পৃথিবীর দুষ্কৃতির ওপর প্রতিশোধ নিল।

সেই ভস্ম থেকে জন্ম নিল রাশিয়ার বিশাল মূর্তি। মানব জাতির সমস্ত দুঃখ দুর্দশার পরিত্রাণের মতো অগ্নিশিখায় প্রজ্জলিত হল রাশিয়া।

যাকগে এক মেয়ের জন্যই ইউরিয়াটিনের স্কুলের অধ্যাপক হলাম আমি। বিয়ের তিন বছর পর ওকে নতুন করে জয় করার জন্য আমি যুদ্ধে গেলাম। ওখানেই শুনতে পেলাম আমি নাকি মারা গেছি। মেয়ে আর স্ত্রীর কথা মনে করে ছুটে আসতে চেয়েছি আমি কতদিন। কিন্তু পারিনি। ওদের একবার চোখে দেখতে চাই আমি।

আপনি লারাকে খুব বেশী ভালোবাসেন তাই না?

আমি জানি সেও আপনাকে ভালো কতখানি বাসে।

—কি করে জানলেন, সাগ্রহে স্ট্রেলনিকভ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ও ওই নিশ্চয়ই মুখভঙ্গি করে নানারকম ঠাট্টা করছিল আপনাকে। আমি জানি, আমি জানি আমার প্রিয়া লারার আচরণ কখন কিরকম হয়। কিন্তু আর, আর বুঝি তার সঙ্গে আমার দেখা হোল না। কাল সকালেই আমি ওই সব নোংরা অসভ্যদের হাতের শিকার হবো, একটা মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে আমায় চলে যেতে হবে ওর কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে।

খুব ভোর বেলায় ইউরা ঘুম ভেঙে উঠে পড়তে পারলো না বিছানা থেকে। সারা রাতের গাঢ় ঘুমের জন্য তার সারা শরীরটা পরিষ্কার লাগছে। কিন্তু বেশী ঘুমের জন্য আবার মাথাতেই অল্প একটু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। মনে পড়ে

গেল স্ট্রেলনিকভের কথা, সে পাশের ঘরে শুয়ে আছে, তবে খুব দেরীতে ঘুম ভাঙলো ইউরার। গত ভোর-রাত্রের স্বপ্ন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হঠাৎ মনে পড়লো স্ট্রেলনিকভ এখানে আছে। ডাকলো, পাভেল পাভলোভিচ। উত্তর এলো না। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো স্ট্রেলনিকভ নেই, টেবিলের উপর তার ফার-এর টুপিটা পড়ে আছে। ইউরা ভাবলো নিশ্চয়ই হাঁটতে বেরিয়েছে। ইউরার দেরী হয়ে যাওয়ায় এখন সে রান্না ঘরে উনুন ধরিয়ে একটা বালতি নিয়ে কুয়োর দিকে চললো।

কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে স্ট্রেলনিকভ, একটা বরফের স্তূপের মধ্যে তার মাথা গোঁজা। নিজেকে গুলি করেছে। তার বাঁ দিকে কপালে লাল খণ্ড হয়ে জমে আছে বরফ। বরফের ওপর রক্তের ফোঁটাকে মনে হচ্ছে ঠিক জমানো জাম ফলের দানার মতো।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপসংহার

শুধু বাকি রইলো জিভাগোর জীবনের শেষ আট কি দশ বছরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এই কয়েক বছরে কি হারিয়ে ফেলেছে ডাক্তার জিভাগো, নিজেই নিজের যে হৃদ্‌রোগ নির্ণয় করেছিল কিন্তু সাংঘাতিক বলে বোঝেনি, এর মধ্যে সেই রোগ আরও অগ্রসর হলো।

মস্কোতে যখন এলো, নতুন অর্থনৈতিক বিধান তখন সবে জারি হয়েছে। পার্টিজানদের হাত থেকে পালিয়ে সে যখন ইউরিয়াটিনে এসেছিল তখনকার চেয়েও শীর্ণ অবহেলিত ও অপরিচ্ছন্ন তার এখনকার চেহারা। আগের মূল্যবান পোষাকের পরিবর্তে কোনোমতে পেট চালিয়ে সে এসে পৌঁচেছে মস্কোতে। এই অবস্থায় ইউরার চেহারাটা যেন ঠিক কয়েদির ওভারঅলের মতো লাগছিল। শহরের পার্ক, রাস্তা ও ষ্টেশনের পুলিশের মধ্যে সেই অবস্থাতেই ইউরা মিশে গিয়েছিল। সে একা আসেনি। তার মতো সেপাইদের পরিত্যক্ত পোষাক পরা একটি সুশ্রী তরুণ কৃষক সর্বত্র তাকে অনুসরণ করছিলো।

সর্বত্র সঙ্গী ছিল ঐ ছেলেটি। তার এই সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে খোঁজ করে জানতে পারলো, কোন অবস্থার ফলে তার স্ত্রী-পুত্রদের রাশিয়া ত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন ছেলেটি অর্থাৎ সঙ্গীটি কে?

ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে ট্রেনে চড়লেও আগের দীর্ঘতর অংশে ইউরা হেঁটেই এসেছে। এবারেও ইউরাকে চলতে হলো প্রায় বিধ্বস্ত সব গ্রামের মধ্যে দিয়ে। অর্ধেক গ্রামই জনশূন্য, ক্ষেতগুলো পরিত্যক্ত, ফসল কেটে নেবার কেউ নেই। গ্রীষ্মের শেষ। উষ্ণ হেমন্তের প্রারম্ভে পথ চলার ক্লান্তি বেশ সহনীয়। পার্টিজানদের ত্যাগ করার পর যে সব গ্রাম ইউরার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল সেগুলি ঠিক একই পর্যায়ভুক্ত। কেবল এর আগের পদযাত্রার সময়টা ছিল শীতকাল। সেপ্টেম্বর-এর শেষের দিকে ইউরা তিনদিন ধরে হেঁটেছিল নদীর খাড়া পাড় ধরে। ডানদিকে ছিল পথ আর বাঁ দিকে অনাবাদী জমি, রাস্তা থেকে থেকে দিগন্তের মেঘপুঞ্জ স্পর্শ করেছে। মাঝে মাঝে অরণ্যের সম্মুখীন হয়েছে সে। বেশীর ভাগই

ওক্, মেপ্‌ল আর এলম-এর বন। পথচলায় ইউরা হয়ে পড়েছিলো ক্ষুধার্ত, ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত ক্ষেতগুলিতে ফেটে পড়া পাকা শস্য রান্নার উপায় না থাকায় কাঁচাই খেয়ে ফেললে।

ঠিক সময়ে রাগি শস্য না কাটায় তার রং হয়েছিলো বাদামী যা ইউরার মনে হচ্ছিল অত্যন্ত অলুক্ষণে।

শস্যপূর্ণ আগুন-রঙা ক্ষেতগুলির ওপর দিয়ে চলে গেছে বিস্তীর্ণ নীলাকাশ। শীতার্তের ছায়া পড়েছে বরফের গায়ে, অপূর্ব সংমিশ্রণ যেন।

নদীর বয়ে চলা, হেঁটে চলা ইউরার সব কিছুর গতিই যেন ধীর, নম্র। ইঁদুরের অবিশ্বাস্য বংশবৃদ্ধি হওয়ায় প্রচণ্ড উৎপাত-এর সম্মুখীন হয়েছিলো ইউরা। রাত্রে শয়নরত ইউরাও হয়ে উঠেছিলো ব্যতিব্যস্ত।

গ্রামের লোমশ কুকুরগুলো সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে চললো ইউরার পিছু পিছু। এত দিন পচা শবের ও ইঁদুরের মাংস খেয়ে তাদের মধ্যে এসেছে এক-ঘেয়েমি, তাই বোধ হয় নতুন শিকারের দেখা পেয়ে টুকরো করার স্বর্ণ সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু কোনো কারণবশতঃ তারা অরণ্যের সামনে চলে গিয়েছিল অন্য পথে।

এই জনশূন্য গ্রামে সুপক্ক বাদাম পেয়ে ইউরা তাই ছিঁড়ে খেতে খেতে পথ চলতে লাগলো। তপ্ত দগ্ধ গ্রাম ও স্নিগ্ধ অরণ্যকে ইউরার মনে হচ্ছে যেন জরা-গ্রস্ত গ্রাম ও রোগমুক্ত আবাস।

তার ভ্রমণের এইরকম সময়ে সে পৌঁছালো এক রৌদ্রদগ্ধ জনশূন্য গ্রামে। বাড়িগুলি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কয়েকটি দাঁড়িয়ে—অপরাপর বাড়ীর ভস্মীভূত ইট, সুরকী ছাড়া কিছুই নেই।

এদের মধ্যে শেষ বাড়ীটিও জনহীন। ইউরা প্রবেশ করলো। শান্ত সন্ধ্যা। কিন্তু ভিতরে ঢুকতেই এক দমকা হাওয়াও ঢুকলো। এইটিও ইঁদুরের উৎপাতে পূর্ণ। ইউরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে একটা পাথরের উপর বসলো। সূর্য তখন উল্টোদিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে গোপন করতেই ব্যস্ত নিজের রূপকেই। হঠাৎ নদীর ধার থেকে এক বালতি জল হাতে উঠে আসতে দেখা গেল কিশোরকে। কিশোরটি ইউরাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো বললো জল খাবেন? আমাকে না মারলে আমিও মারবো না।

ইউরা অবাক হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, মারব কেন? এখানে এসো না। ভয় কি?'

ইউরার সহৃদয় কথা শুনে সন্দিগ্ধ ভাবে তাকালে এবং বালতি রেখে ছুটে আসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়লো সে। আপন মনে হঠাৎ ইউরাকে চেনা মনে হতেই ভাবলো, হয়তো এটা ভুল স্বপ্ন, কিন্তু পরক্ষণেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলো, বললো —"আপনি সেই ডাক্তার না ?"

ইউরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে ? ছেলেটি বললো—আমাকে চেনেন না ? ডাক্তার বললো—না। তখন ছেলেটি মনে করিয়ে দিলো যার সাথে ইউরা মস্কো থেকে আসার সময় এক কামরায় ছিলো।

ছেলেটি হলো ভাসিয়া ব্রিকিণ। এই দগ্ধ ধ্বংসাবশেষ ছেলেটির নিজের গ্রাম ভেরেটেন্নিকি। যখন গ্রাম ধ্বংস হয় তখন ভাসিয়া লুকিয়ে ছিলো এক পাহাড়ের গুহায়। তাঁর মা ভেবেছিলেন তাকে বোধহয় শহরে আনা হয়েছে। তাই মা নদীতে ঝাঁপ দেন। দুই বোন আসিয়া ও আরিয়া এখন এক অনাথ আশ্রমে। ভাসিয়া রওনা হয়েছিলো মস্কোতে, পথে ঘটলো অনেক ঘটনা। শীতের ফসল নষ্ট হয়েছে, নতুন বীজ লাগানো হচ্ছে তখন শুরু হয়েছিলো গোলমাল। পোলিয়া মাসি তখন চলে গেছে, পোলিয়া মাসিও ছিলেন সেই ট্রেনের কামরায়, ভাসিয়া ইউরাকে বর্ণনা দিতে সে পোলিয়াকে চিনতে পারলো। ইউরা বললো সেই মাসি ভাসিয়াদের সঙ্গে থাকতেন কিনা। ভাসিয়া বললো, হ্যাঁ উনি ভাসিয়ার মায়ের বোনের মতোই ছিলেন, খুব শান্ত আর কর্মঠ, ভাসিয়া বলতে লাগলো,—পচা খার্লাম নামে একটা লোক পোলিয়াকে চাইত। পোলিয়া কিন্তু দেখত না। তখন খার্লাম ভাসিয়াকে পোলিয়ার সঙ্গে জড়িত করে বললো নানা কথা। শেষ পর্যন্ত পোলিয়াকে ছাড়তে হয়েছিলো গ্রাম। একবার একটি খুন হয়েছিলো, সে ছল এক বিধবা, থাকতো জঙ্গলে এক, লম্বা একটা শিকলে বেঁধে একটা হিংস্র কুকুর পুষতো সে। নাম ছিলো গর্ণন, বুড়ি চাষের কাজও একাই করত। কিন্তু সেবার শীত তাড়াতাড়ি আসায় বুড়ির আলু তোলা হয় নি। তাই সে মজুর চাইল। ভাসিয়া হলো মজুর। খেতে গিয়ে দেখে খার্লাম সেখানে হাজির। যাই হোক দুজনে মিলে কাজ করলো। খার্লাম পাওনা গণ্ডা নিয়ে চলে গেল, রয়ে গেল ভাসিয়া, বুড়ি তাকে বললো, সরকারকে ফসল দেবে না একথা যেন কাউকে না জানানো হয়। এই ফসল রক্ষার জন্য একটা গর্ত খুড়ে দিলে ভাসিয়াকে বুড়ি তার যথার্থ পাওনা দিয়ে দেবে। নির্বিবাদে গর্ত খুড়ে ভাসিয়া তার শর্ত রক্ষা করেছিলো। একমাস না কাটতেই বুড়ির খামারে ডাকাতি হল—সব কিছু, এমন কি কুকুরটিও উধাও। বুড়ীরও চিহ্ন নেই তার জিনিষেরও না।

আরো কিছুদিন পর বরফ গলতে শুরু করে। বৃষ্টি হলো খুব। উঁচু জমির বরফ ধুয়ে গেল বৃষ্টিতে, ফাঁকা মাটি বেরিয়ে এল, ইতিমধ্যে কুকুরটা হঠাৎ বুড়ির বাড়িতে পুনঃপ্রবেশ করলো। যেখানে ফসল রাখা হয়েছিল সেখানটা খুঁড়তে লাগলো নখ নিয়ে। হঠাৎ বুড়ির পা দুটো বেরিয়ে এল। কেউ এই মৃত্যুর জন্য খার্লামকে সন্দেহ করলো না। এই খুনটা হওয়াতে কুলাকরা খুশী হয়েছিলো। তারা গ্রামে এই সুযো গ গণ্ডগোল পাকাবার ব্যবস্থা করতে লাগলো—এই খুন শহরের লোকের কাজ. কারণ, ওরা চায় না কেউ ফসল লুকিয়ে রাখুক—এই কথার মাধ্যমে। যখন ওরা নিতে আসবে তখন কাস্তে শাবল কাজে লাগানো হবে। এরপর মিটিং হতে লাগলো সর্বত্র। খার্লাম এই সুযোগে গল্পের বোঝা নিয়ে চলে গেল শহরে। বলল, একটা দরিদ্র সমিতি গঠনের প্রয়োজন, তাহলেই ওদের নিজেদের দিয়ে নিজেদের ফসল কাটার বন্দোবস্ত হবে। তারপর সব একের পর এক ঘটনা ঘটলো —শহর থেকে লাল পল্টন পাঠিয়ে গ্রামে বিচারালয় খুললো। এই সময় ভাসিয়াকে খুনের দায়ে কয়েদে রাখা হলো। হঠাৎ ভাসিয়ার মাথায় পালানোর বুদ্ধি চাপায় সে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে। সারাটা গ্রাম পুড়লো, ভাসিয়ার মা মরলেন, কিছুই জানলো না ভাসিয়া। লাল পল্টনের লোকেরা বেহুঁস মাতাল হয়েছিল, অসাবধানতার জন্য আগুন লাগলো বাড়ীতে। সেটা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের সর্বত্র। গ্রামের লোকেরা পালাল। শহুরেরা পুড়ে মরলো। কুলাকরা গুজব ছড়ালো যে প্রতি দশজনের মধ্যে একজনকে গুলি করে মারা হবে। যখন ভাসিয়া গুহা থেকে বেরোলো তখন সব ফাঁকা। ধু ধু করছে সারা ভেরেটেন্নিকি!

১৯২২ এর বসন্তকালে মস্কোতে পৌঁছলো ইউরা ও ভাসিয়া। স্বাধীন বাণিজ্যের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্যরা শুধু এ হাত সে হাত করে চালাচ্ছে ছোট ব্যবসা। এতে কপালও ফিরছে অনেকের। যাদের বাড়ীতে লাইব্রেরী ছিলো সেখানকার বইগুলো জড়ো করে তারা আবেদন জানাচ্ছেন একটা সমবায় লাইব্রেরী খোলার জন্য। যারা লুকিয়ে ব্যবসা করত, তারা এখন করছে প্রকাশ্যে।

মস্কোতে পৌঁছে ইউরা ভাসিয়াকে কাজ-এর কথা বললো। ভাসিয়া জানালো তার ইচ্ছে সে পড়বে ও ছবি আঁকবে। রাজী হলো ইউরা। বন্ধুবান্ধবকে ধরে ইউরা স্ট্রগানভ ইনস্টিটিউটে ঢুকিয়ে দিলো তাকে। সেখানে শিক্ষণীয় ছিল ছাপা, বাঁধান ও বইয়ের ডিজাইন। ইউরাকে সাহায্য করতে লাগল ভাসিয়া। ইউরা

লেখে জীবন দর্শন, রোগ স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সজ্ঞার্থ, কবিতা, গল্প ইত্যাদি। এইসব কাজেও ইউরার সহযোগী হয় ভাসিয়া। ইউরা লেখে, ভাসিয়া সেটা সাজিয়ে ছাপে। তারপর বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

ইউরার লেখা বইগুলো যদিও তর্ক সাপেক্ষ, অপ্রমাণিত—তবুও তার রচনা হয় জীবন্ত। তাই বিক্রি হয় সহজে। সেই সময়ে উদ্ভব হয়েছিলো অসংখ্য বিশেষজ্ঞ সব বিষয়কেই কেন্দ্র করে। ফলে গঠিত হয়েছিলো, 'জ্ঞানমন্দির', 'শিল্প অ্যাকাডেমি' ইত্যাদ। প্রায় এইসব প্রতিষ্ঠানেরই ইউরা ছিলেন চিকিৎসক উপদেষ্টা।

মস্কোতে পৌঁছে তার পুরানো বাসাটা সে দেখতে গিয়েছিলো। কিন্তু তাদের নামে লেখা বাড়ী দেওয়া হয়েছে নতুন ভাড়াটেকে। মার্কেলও নেই সেখানে। সে এখন মুনয়ে গরডের বাড়ীর ম্যানেজার। কোনো একসময়ে ইউরা ও ভাসিয়ার বন্ধুত্ব হয়ে এলো শান্ত, শীতল। ভাসিয়া এখন সদা পরিবর্তনশীল। সে এখন আগের মতো চিন্তা করে না। ইউরার কথাবার্তা ও যুক্তি এখন তার মনে হতে লাগলো ভ্রান্তির কণ্ঠস্বর। তখন ইউরা মস্ত ছিলো দুটো চিন্তায়। তার পরিবারের রাজনৈতিক পুনর্বাসন, রাশিয়ায় ফেরার অনুমতি পত্র, এবং নিজের একটা পাস-পোর্ট। কিন্তু এই সব কিছুই ছিল, কেমন উদাসীন।

ইউরার ছিদ্রান্বেষণে ভাসিয়া বেশ তৎপর হলো। ইউরা উচিত সমালোচনা বিষয়ে সহনশীল হলেও তাদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরলো। অবশেষে সঙ্গ ত্যাগ করলো তারা। ইউরা গেল মার্কেলের কাছে। সেখানে উঠে যাবার পর সে ডাক্তারী থেকে অবসর নিল। নিদারুণ দারিদ্রে কাটতে লাগল তার জীবন। ত্যাগ করল বন্ধুবান্ধব সান্নিধ্য।

দিনটা ছিল শীতের রবিবার। নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ তখনো আসেনি। মুনয়ে গরডের লোকেরা নানা ব্যাধিতে ভোগে কষ্ট পান। সেদিন মার্কেল শ্চাপভ আর তার পরিবারের সকলেই ছিল। মার্কেলের স্ত্রী উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে রন্ধন-কার্যে ব্যস্ত। সব খাবার জিনিষগুলিকে উনুনে গরম করছিলো। রান্নাঘরের বড় টেবিলে খেতে বসেছে তারা। এর আগে রুটি র‍্যাশনের জন্য ভাড়াটেদের কুপন জমা হতো এই টেবিলে। এখন অন্য ধরণের ব্যবস্থা হয়েছে। মার্কেলের স্ত্রী আগাথা একটি 'পাই' উনুনে কড়া হবার জন্যে দিচ্ছে এমন সময়ে দুটো বালতি নিয়ে প্রবেশ করলো ইউরা। আগাথা ইউরাকে খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে, ইউরা খিদে নেই, ঘরের দরজা খোলা ইত্যাদি বলে প্রত্যাখ্যান করলো।

তারপর এইভাবে হঠাৎ ঢুকে পড়ার জন্য ক্ষমা চাইলো। বললো, এছাড়া অন্য কোথাও জল পাওয়া যাবে না তাই এখানে আমার প্রবেশ।

জল নিচ্ছে ইউরা। তিন চার বাঁক জল ভরছে এমন সময়ে সকলের মুখ হয়ে গেল বিবর্ণ। কেন সে জল ছিটোচ্ছে, মেঝেতে জল পড়লে সেটা কি ভাসবে? তারপর মা'র্কলও ছাড়লো না ভ্রূকুটি করতে।

বলে যেতে লাগলো মার্কেল —মারিনা যদি না বলতো তবে সে এতদিন ওর দরজাই বন্ধ করে দিতো? মারিনা বড় ডাকঘরে টেলিফোন অপারেটারের কাজ করে। বিদেশী ভাষা জানে।

এমন সময়ে সকল ভ্রূকুটির মাঝখানে মারিনা জ্বলে উঠল। তার গলার স্বর সকলকে করে দিলো স্তম্ভিত। এমনকি ই রাকেও। মার্কেলকে বললো, বাড়িটা প্রচণ্ড নোংরা হয়েছে, তাছাড়া তার কিছু জামাও কাচতে হবে। আগাথা বললো, তার মেয়েকে সে পঠিয়ে দিচ্ছে ওই সব জামা কেচে দেবে। ইউরা সসংকোচে বাধা দিয়ে বললো—তার জন্য মারিনা কেন ময়লা ঘাঁটবে? মারিনা এক প্রকার জোর করেই সেই প্রস্তাব নিলো। এইভাবে বারবার-বারবার জল বয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে মারিনা ও ইউরা আবদ্ধ হলো বন্ধুত্ব সূত্রে। একদিন মারিনা এসে থেকে গেল ইউরার ঘরে, বাড়ী ফিরল না। এইভাবে ইউরার তৃতীয় স্ত্রী হলো সে, তাদের বিয়ে হলো। পরিচয় পেলো ডাক্তারের মেয়ে বলে। মারিনার আনুগত্য ছিল সম্পূর্ণরূপে কিন্তু ইউরা তখন স্বেচ্ছায় বয়ে যেতে দিচ্ছে নিজেকে। একবার পড়লো দারুণ অভাবে। মারিনা তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব সময় ইউরার সঙ্গে থেকে তাকে দৈহিক কাজে সাহায্য করে। একবার ইউরা আর মারিনা কাঠ কেটে নিয়ে বেন্ট বুট পরে অতি সাবধানে (যাতে কার্পেটের উপর কাঠের গুঁড়ো না পড়ে) যাচ্ছিল। ঘরে দেখলো ঘরের ভদ্রলোকটি বই পড়তে দারুণ ভাবে নিমগ্ন। কৌতুহল বশে কাঁধের কাছ থেকে উঁকি মারতেই দেখলো ইউরারই লেখা বই এর পুরানো সংস্করণ। ভাসিয়া ছাপিয়েছিল। মনে পড়লো তার ম্লান স্মৃতি।

ইউরা আর মারিনা স্পিরিডেনোভকা ষ্ট্রীটে বাসা নিয়ে ছিলো। পাশেই ব্রন্নি ষ্ট্রীটে গর্ডন একটা ঘর নিয়ে থাকে। মারিনা আর ইউরার দুই মেয়ে। কাপকা ও ক্লাজকা। ১৯২৯ এর গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম পড়েছিলো। বসবার ঘরে কাঁচের উঁচু জানালা দিয়ে যে কোনো লোকের হাঁটু পর্যন্ত দেখা যায়। বর্তমানে সেখানে

বসেছিলো ডাঃ জিভাগো, ডুডোরভ, গর্ডন, আর ছেলেপুলে নিয়ে মারিনা। কিছুক্ষণ পরে মারিনা মেয়ে নিয়ে চলে গেল। বাকি তিনজন পুরুষ মন্থর গতিতে আলাপ করে চলেছে। নিজেদের সুসংবদ্ধ কথা হলে চাই নিজের পক্ষে তৃপ্তিকর শব্দ যা তিনজনের মধ্যে একমাত্র ইউরারই ছিলো। নিজেদের আত্মপ্রকাশের জন্য শব্দের খোঁজে পায়চারী করছিলো চঞ্চল পায়ে, তারা জানতো না যে এটা বরং উল্টো দৈন্য ও সীমাবদ্ধতার ফল। গর্ডন আর ডুডোরভ দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিষীদের বই পড়ে, ভালো গীত রচনা ছিল তাদের বিলাস।

তাদের আলাপ কখনোই গন্তব্য স্থলে পৌছাচ্ছিলো না। ডুডোরভ কি গর্ডন কিছুতেই বুঝছিলো না তাদের উপদেশ তার ব্যবহারকে প্রভাবিত করার সহৃদয় ইচ্ছা থেকে ততোটা নয়, যতোটা স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও সহজভাবে কথা বলার অক্ষমতা থেকে। ইউরার কাছে এদের যুক্তি আবেগ সহানুভূতির অস্থিরতা সবকিছুই ছিলো স্পষ্ট। অথচ কিছুই বলতে পারা যায় না সরাসরি, অতি সাধারণ তারা। ইউরা চাইলো না তাদের আঘাত করতে। ডুডোরভ সম্প্রতি নির্বাসন থেকে ফিরেছে তার নির্বাসনকালীন, মানসিক অবস্থার কথাই ব্যক্ত করছিলো সে। আর গর্ডন সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছিলো ডুডোরভের উক্তিকে। কিন্তু ইউরার এই মামুলি বুলিগুলো অসহ্যকর। সে ভাবলো যারা মুক্ত নয় তারা শৃঙ্খলকেই আদর্শ করে তোলে। কিন্তু আঘাত দেবার ভয়ে এবারও চুপ করে রইলো সে।

ডুডোরভ বলছে তার এক নির্বাসন সঙ্গীর-কথা। এবারে ইউরা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এখানে বড় গুমোট তাই সে বাইরে যাচ্ছে। ইউরা জানালো তার হৃদ-রোগের ক্ষয়ের কথা। এই রোগের প্রধান কারণ নৈতিক। সে যা পছন্দ করে হয় তার ঠিক উল্টে, আবার তাকেই করে সবাই শ্রদ্ধা, সেই জন্যই ডুডোরভ জেলে বাস করে কিভাবে নতুন শিক্ষালাভে সাবালক হয়ে উঠলো। এই কাহিনী শুনতে ইউরার কষ্ট হচ্ছিলো। এই বলে ইউরা যেতে উদ্যত হলে বাধাপ্রাপ্ত হলো। তারা বললো টোনিয়া অর্থাৎ মারিনার স্বামীর একটা মীমাংসা দরকার, তাছাড়া সকলের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব থাকা চলবে না ইউরার। আবার শুরু করতে হবে ডাক্তারী। তখন ইউরা জবাব দিল—সে বাঁচতে চায় সম্পূর্ণরূপে।

একটা সুসংবাদ জানালো মিশা। স্ত্রী পুত্রদের কাছ থেকে সব খবর সে পাচ্ছে। তারা এখন প্যারিসের অর্থাৎ ফরাসী নাগরিকের সম্মান লাভ করেছে।

বোধহয় ওরা আবার ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে ইউরার শ্বশুর মশাই আলেক-জ গ্রারও বোধহয় জেনে গেছেন মারিনার কথা—এইরূপ আশংকা করল ইউরা। নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছেন টোনিয়ার কথা ভেবে।

পরদিন হঠাৎ মারিনা উদভ্রান্তের মতো ছুটে এলো মিশার কাছে। জিজ্ঞাসা করল, ইউরা আছে? কাল ও বাড়ী ফেরেনি। মিশা বলল, নিশ্চয়ই নিকির কাছে আছে? কিন্তু মারিনা জানালো সেখানেও সে নেই। মারিনা ক্লাজকাকে রেখে অজ্ঞান হয়ে গেল।

এরপরের দুদিন গর্ডন আর ডুডোরভ পালা করে মারিনাকে পাহারা দিয়ে খোঁজ করলো সর্বত্র ইউরার। কিন্তু খোঁজ মিলল না। তৃতীয় দিনে তিনজনের কাছেই পৃথকভাবে চিঠি এল ইউরার। ইউরা জানিয়েছে তাকে যেন খোঁজ না করা হয়। কারণ সবই হবে ব্যর্থ। ইউরা কিছুদিন একা থেকে নিবিষ্ট করতে চায় নিজেকে। তার বদভ্যাস কেটে গেলেই সে পুনরায় ফিরে আসবে। গর্ডনকে লিখেছে, কিছু টাকা পাঠালো, বাচ্চাদের নার্স রাখার জন্য। নার্স রাখা হলো, মারিনা আবার যোগ দিল তার ডাকঘরের কাজে। মারিনা ইউরার এই উচ্ছৃঙ্খলতাটিকেও মেনে নিলো।

ইউরা যেদিন উধাও হলে সেদিন পথিমধ্যেই দেখা হলো তার ভাইয়ের সঙ্গে। শুনলো তার ভাই ইয়েভগ্রাভ তক্ষুনি মস্কোতে পৌঁচেছে। তার কথা উপলব্ধি করে ইয়েভগ্রাভ তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থার্থে কিছুদিন গুপ্তবাসের বুদ্ধি দিলো। কামের-বাগের স্ট্রীটে—এখনো সেই নামই আছে—আর্টস থিয়েটারের কাছে একটা ঘর নিলো ইউরা। এবারেও ইউরার কাজের সাহায্যে এলো ইয়েভগ্রাভ। কথা দিল যেখানে গবেষণার সুযোগ প্রচুর তেমন কোনো হাসপাতালে তাকে কাজ দেবে। তাছাড়া টাকা দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করলো ইউরাকে। ইয়েভগ্রাভের সাহায্য পেয়ে ইউরার যেন প্রাণ সঞ্চার হলো।

দক্ষিণ মুখো ঘর ইউরার। ইউরার কাছে ঘরটা শুধু কাজ করার, লেখাপড়ার জায়গা নয়। তার ভাগ্য ভালো হাসপাতালের সঙ্গে ইয়েভগ্রাভের কথাবার্তা ঢিমে তালে চলেছে। ইউরার চাকরির ব্যাপারটা স্থগিত রইলো, এই দেরীর জন্য লেখাপড়ার অবকাশ জুটলো তার। সে পুরনো প্রবন্ধগুলি ফেলে দিয়ে নতুন করে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দিল। কল্পনায় যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন খাতার

ধারে ছবি এঁকে মনকে জাগিয়ে তোলে। ছবি আঁকে শহরের তাতে একটি বিজ্ঞপ্তি দেখা যাচ্ছে 'মস্কো অ্যাণ্ড ভোটচিনফিন্'। তার প্রবন্ধের বিষয় শহর।

পরে এই লেখা পাওয়া গিয়েছিলো তার কাগজপত্রের মধ্যে। ছোটো ছোটো লেখা: বাইশ সালে যখন ইউরা মস্কো ফিরেছিলো তখনকার গ্রামের অবস্থার বিবৃতি এবং বর্তমানের অবস্থা। প্রতিটি কবিতায় যে স্বেচ্ছাচারী ও অসংবদ্ধ বস্তু সমাবেশ দেখা যায় সেটা রীতিগত কৌশল নয়, অনুভূতির এক নতুন সমাবেশ। এই কবিতায় ছন্দে ছন্দে কিরকম চিত্রকল্পের পংক্তি তা দ্রুতবেগে এসে পড়ছে। কি ছিল আগের যানবাহন এখনই বা কি! এইসবই ছিল তার লেখা কাগজের মধ্যে। এই শহুরে জীবনের কোথাও পাওয়া যায় না গ্রাম্য চিহ্ন। যখন সেটা অনুকরণ করা হয়—তখন সাহিত্যিককে কি মনে হয় তারও বর্ণনা রয়েছে। সে যুগের জীবন্ত ভাষা হলো নাগরিক।

ইউরার বাসা এক চৌরাস্তায়। সূর্যালোকে ছিটিয়ে পড়ছে শ্বেত উত্তাপ, রাস্তা আর মেঘের বস্তুকে নিয়ে মস্কো শহর যেন ফুটফাট হয়ে উঠেছে।

নগরের বিষয় লিখতে গিয়ে ইউরা লিখেছেন: অন্ধকার গোপন পর্দায় যেমন প্রদীপের আলোয় লাল হয়েছে তেমনিই মানুষের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাহ্যিক শব্দ। ঝিভাগোর রচনাবলীর মধ্যে, কিন্তু এই ধরণের কবিতা নেই। হয়তো 'হ্যামলেট' এর পর্যায়ে।

একদিন সকালে বটকিন হাসপাতালে যাবার জন্য ট্রামে উঠল ইউরা। সেদিন নতুন কাজে যোগ দেবার কথা।

ট্রামের কপাল ভালো না। বারে বারে ট্রামটা হয়ে পড়ছে বিকল।

কখনও বা কারেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই ট্রামটার জন্য রাস্তায় সম্পূর্ণ ট্রাফিক জ্যাম। বাঁ দিকে একটা আসনে বসে আছে ইউরা। হঠাৎ তার চোখে পড়ল ধূসর চুল এক বৃদ্ধার প্রতি। একটা পোঁটলা নিয়ে হাঁপাচ্ছেন তিনি, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন।

ইউরার মনে পড়লো, স্কুলে পড়ার সময় কিভাবে ট্রেনের গতি ও গন্তব্য স্থলে পৌঁছাবার সমস্যার কথা। সমাধানের কথা মনে পড়লো না। চমকে উঠলো বিদ্যুৎ, মেঘ ডাকলো গুরু গুরু। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি রাস্তায় পড়লো। একটা দমকা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল।

অসুস্থ বোধ করছিলো ইউরা, উঠে দাঁড়ালো সে। জানালা খোলার চেষ্টা করেও খুলতে পারলো না। কিন্তু জানালা ছিল একেবারে আটকানো। সকলে তাঁকে চেঁচিয়ে বলা সত্ত্বেও সে যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না। তার মনে হচ্ছে। দেহের অভ্যন্তরে কি যেন ওঁড়িয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সে এক অমানুষিক জোরে উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে চলল সামনের পাটাতনে টলতে লাগল তার পা। লোকেরা তাকে গালাগাল দিতে লাগলো কিন্তু বাইরের হাওয়া যেন তাকে পুনর্জীবন দিয়েছে। সে যাচ্ছে নতুন কাজে যোগ দিতে। যাই হোক, যখন সে পাটাতনের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল, তখন পুনরায় গালাগালি শুনতে হলো তাকে। এই সব কিছুই তুচ্ছ করেই সে ভিড় বাইরে ছিনিয়ে আনল নিজেকে। নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। তারপর এক পা এক পা করে চলতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে সে পড়ে গেল এবং পথের উপর, আর উঠল না। সব শেষ হলো। এরপর উঠলো হাজার লোকের যুক্তি, তর্ক ও উপদেশ। চারদিক থেকে ইউরার মৃতদেহকে ঘিরে ফেলল সবাই। আসলেন সেই ধূসরবর্ণের চুলওয়ালা ভদ্রমহিলাও। শুনলেন, কারো ইচ্ছা মৃতদেহকে ট্রামে করেই হাসপাতালে পাঠানো হোক, কেউ চান সেনাবাহিনী ডাকা হোক। শেষ পর্যন্ত না দেখেই তিনি চলে গেলেন।

এই ভদ্রমহিলা হলেন সুইস নাগরিক। তিনি হলেন মেলিউজেইয়েভোর মাদমোয়াজেল ফ্লুরি। বারো বছর পর দেশে ফেরার অনুমতি চেয়ে তিনি মঞ্জুরী পেয়েছেন। তিনি চলেছেন সেই অনুমতিপত্র নিতে। ইতিমধ্যে তিনি জিভাগোকে ছাড়িয়ে গেলেন।

ইউরার ঘরের টেবিলের উপর শায়িত যেন হাতে তৈরী নিপুণ ডিঙি নৌকো। দরজা দিয়ে ঢুকলেই এক দিকটা, যে দিকে মৃতের পা থাকে, সেই দিকটা চোখে পড়ে। এই টেবিলেই ইউরা লিখতো। বালিশ দিয়ে উঁচু করে দেওয়া হয়েছে ইউরার মাথা। তার মৃতদেহ সজ্জিত করানো হয়েছে রাশি রাশি ফুলের দ্বারা। জানালার ফাঁক দিয়ে ঢোকা সূর্যালোক ফুলগুলোকে যেন পর্দার মত আড়াল করছে। ততদিনে মৃতদেহ দাহ করার প্রথা চালু হয়েছে। মারিনার চাকরীর কথা ভেবে বাচ্চাদের সরকারী মাসহারার আশায় মৃতের আত্মার জন্য কোন মঙ্গল প্রার্থনা করা হয়নি। শুধু আইন সম্মতভাবে দাহ করা হবে। মৃত ইউরার কাছে এসেছে তার অজানা অচেনা পাঠকবৃন্দ। যা কেউ আশা করতে পারেনি। তারা

এসেছিল কবিতা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের আকর্ষণে। এই মৃতকে তারা শেষবারের মত দেখছিল।

এরপর খবর পেল মারিনা। আকস্মিক আঘাতে মূর্ছিতা হল মারিনা। ইতিমধ্যে কফিনের অর্ডার হয়ে গিয়েছিল। এদিকে মারিনা কেঁদে চলল অবিরল ধারায়। তবে মৃতদেহ যখন স্নান করিয়ে কফিনে পোরার ব্যবস্থা হল তখনি মারিনার কাছ থেকে মৃতদেহ ছিনিয়ে নেওয়া তেমন সহজ ব্যাপার হল না। গর্ডন ও ডুডোরভ শোকার্ত হয়েছিল প্রচণ্ডভাবে, মারিনার বাবা মার্কেল তার পাশে বসে সজোরে কাঁদলো। মারিনার মা সেখানে এসেছিলেন। তারা স্পষ্ট ভাবে না জানালেও বোঝা যাচ্ছিল ইউরার ওপর বিশেষ কোন অধিকার তাদের আছে। অত্যন্ত শান্ত ও সক্ষমভাবে করে চলেছিল প্রত্যেকটি কর্তব্য। যে পুরুষটি, যাকে দেখে সকলের বিশেষ কৌতুহল জাগছে সে যখনই একটি সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, তখন সবাই উঠে দাঁড়াচ্ছিল। মহিলা ও পুরুষটিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল নির্জনে। এরা অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে পরিপূর্ণ যুক্ত থাকার তাদের পরামর্শের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়েভগ্রাভকে—'কি খবর ?'

ইয়েভগ্রাভ জানালো, রাত্রেই সৎকার হবে আইনমাফিক ভাবে। লেবর কার্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, নতুন কার্ডও নেয়নি, চাঁদাও দেয়নি অনেক বছর—তাই দাহকার্য্যে দেরী হলো। সেই সময়ে ইয়েভগ্রাভ এর ফোন আসায় সে বাইরে এলো। বাইরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মারিনা তার দুই মেয়েকে নিয়ে। সেই বিরামহীন গুঞ্জন ছাপিয়ে কোনোমতে ইউরার মৃত্যুর বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফিরে এল।

তারপর ভদ্রমহিলা লারিসা ফিয়োডোরাভেনা ও ইয়েভগ্রাভ ইউরার কাগজপত্র গোছানো সম্পর্কে কথা বলছিলো। ভদ্রমহিলাকে জানালেন যতদিন না পাণ্ডুলিপিগুলি বাছাই করা হয় ততদিন তারা এই বাড়ীর কাছাকাছিই থাকতে পারবে। ভদ্রমহিলা জানালেন,—তিনি যখন মস্কোতে পৌঁছালেন—দেখলেন অনেকদিনের অদর্শনের পর সমস্ত মস্কো শহরের অধিকাংশই তাঁর কাছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ এক জায়গা তাঁর অত্যন্ত চেনা লাগল, মনে হলো—মুহূর্তে চিনতে পারলেন। এই জায়গাতেই থাকতেন তার স্বামী আন্টিপভ। যাকে গুলি করে

মারা হয়েছে। তারপর তিনি পুরানো ভাড়াটেরা আছেন মনে করে এগিয়ে গেলেন এবং এসে দেখলেন জনসমুদ্র। ভিতরে এক মৃত মানুষ।

ফিয়োডোরোভেনাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ইয়েভগ্রাভ বা ইউরা কেউই জানতো না এখানে আন্টিপভ থাকতো।

কিন্তু তিনি শুনেছিলেন—আন্টিপভ, স্ট্রেলনিকভ আত্মহত্যা করেছিলেন কিন্তু এখন শুনেছেন তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। ভদ্রমহিলা বলছেন, তিনিও শুনেছিলেন, কিন্তু তিনি সেটা বিশ্বাস করেন নি।

ইয়েভগ্রাভ জানালেন "কিন্তু ভল্ডিভস্টকে যাবার আগ তিনি সেই বাড়িতেই আত্মহত্যা করেন। ইউরা বলেছিলো ইয়েভগ্রাভকে। ভদ্রমহিলা বললেন তার কাছে একই জায়গায় এই রকম হত্যা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু যখন শুনলেন ইউরা স্ট্রেলনিকভকে চেনার সুযোগ পেয়েছিলো তখন অন্টিপভ আশ্চর্য হয়ে অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন বললেন। কিন্তু এই অবস্থায় শোকার্তদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার সমীচীন মনে করে তাঁরা ঢুকতে দিলেন।

ল্যান্টিপভ ইয়েভগ্রাভকে পাণ্ডুলিপি বাছাই প্রভৃতি সব কাজে সাহায্য করবে বলে কথা দিলো, চেয়ে নিল সরকারী বিভাগের নিয়ম-কানুন জানা ইয়েভগ্রাভের সাহায্য একটা খবরা-খবরের জন্য। খবরটা একটা শিশুর। কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে তিনি বলতে বা শুনতে রাজী নন, কারণ ফল যদি আশানুরূপ না হয়। শিশুটির ছিল অসাধারণ অনুকরণ শক্তি। কিন্তু বাইরের দরজায় টোকা পড়তেই তারা সভা-সমিতির লোক এসেছে অনুমান করে দরজা খোলার ব্যবস্থা করতে লাগল। পা দানী রাখা হলো ইউরার কাছে। তারপর খোলা হলো দরজা। কিন্তু লারা দাঁড়িয়েছিলো অত্যন্ত আত্মনিমগ্ন ভাবে। দরজা খোলার শব্দ, প্রধান শোকার্তদের প্রতি ইয়েভগ্রাভের নির্দেশ কিছু শুনতে পারলো না। ভিড়ের দ্বারা সন্নিবিষ্ট আছে সে। একঘেয়ে শব্দ তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল, বমি পেতে লাগলো তার। কেউ রইলো না। একজন হলো মৃত ও অপরজন আত্মঘাতী।

কিন্তু যার বেঁচে থাকার কথা নয় সেই রইলো। যার সঙ্গে তার কোনই মিল নেই, সে অর্থহীন, অস্তিত্বহীন। একমাত্র যার খোঁজ রাখে ডাকটিকিট সংগ্রাহকের দল। এখন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এশিয়ায়।

মনে পড়ে গেল লারার—তখন ক্রিশমাসের সময়, অন্ধকারে বসে এই ঘরেই কথা বলছিলো সে পাশার সাথে। যখন পাশা—তখনও ইউরা তার জীবনে প্রবেশ করেনি। এই মৃতদেহই একদিন তার জানালার আলো দেখে লারার

জীবনের ভার নিয়েছিল। লারার মনে হলো, গির্জায় অন্ত্যেষ্টি হলে বড় বেশী ভালো হতো। তাছাড়া ইউরা যোগ্যও ছিলো।

এই কথা ভেবে তার বুকটায় গর্বের দোলা দিয়ে গেল এক ঝলক। যেমনি ঢেউয়ের অবকাশ থাকতো না যখন সে ইউরার কাছে ছিল। যে মুক্তি ও নির্লিপ্ততা ইউরাকে ভরিয়ে রেখেছিলো সেই একটি বাতাসে যেন লারার নিঃশ্বাস ভ'রে উঠল। চেয়ার থেকে তক্ষুনি উঠে পড়লো সে। ব্যাকুল ব্যস্ততায় চারদিকের ভিড়ের দিকে তাকালো সে, দৃষ্টিহীন অশ্রুপূর্ণ তার চোখ, যেন ডাক্তারের ওষুধ লেগে জলে ভ'রে ভ'রে উঠেছে। এগিয়ে গেলো কফিনের টেবিলটির কাছে। ক্রুশ চিহ্ন এঁকে, ইয়েভগ্রাফের আনা ফুল দানের পাশে দাঁড়িয়ে, মৃতদেহের ওপর তিনবার বড়ো করে ক্রুশচিহ্ন এঁকে ঠোঁট ছোঁয়ালো শীতল কপাল আর হাতের ওপর। কিন্তু না-ভেবে, না-কেঁদে, ঝুঁকে পড়লো কফিনের ওপর, ফুল আর মৃতদেহের ওপর। তার সমস্ত সত্তা, দেহ, মাথা, বুক, হৃদয় আর তার হৃদয়ের মতো শক্তিশালী দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলে [illegible] মধ্যে।

চেপে রাখা কান্নায় [illegible] তার শরীর। হায়, বললো না সে! এমনি এক জ্ঞান ভরে তুললো না [illegible] মৃত্যুর অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর জন্য সেই প্রস্তুতি, যার সামনে বর্তমানের সব অশক্তি তুচ্ছ হয়ে যায়। সে তার হৃদয়কে হারিয়েছে অসংখ্য বার। সঞ্চয় করছে নানা অভিজ্ঞতা। সেই প্রেম সেই স্বাধীন নতুন প্রেম, পৃথিবীতে যার তুলনা চলে না। পরস্পরকে তারা ভালোবাসেনি, তাঁরা ছিলেন সংযোগের দাস [illegible] কফিনের মধ্যে ইউরার দেহকে আলিঙ্গন করে দুজনে হয়ে গেল একাত্ম। যেমন করে থাকতো সে আগে।

এবার সে ইউরার কাছ থেকে বিদায় নিল। তার চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে জলের ধারা। যা লারার কাছ থেকে নিঙড়ে আনছে চিন্তাহীন লঘু সাধারণ শব্দগুলিকে, যার ভাষা অতি সাধারণ। বলে চলল সে—"হে ভগবান" এই চলে যাচ্ছি আমার সব শেষ হয়ে গেল জীবনের রহস্য, মৃত্যুর রহস্য, প্রেমের সৌন্দর্য্য, প্রতিভার সৌন্দর্য্য, সব বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিদায় আমার বড় প্রিয়! গর্ব বিদায় আমার গভীর নদী, একদিন ভালবেসেছিলাম তোমার জলোচ্ছ্বাস কিন্তু, আজ —"? মনে পড়ে গেল তার. শেষ হয়ে যাওয়া একদিনের বিদায় বেলা, যেদিন

তারা ঠকেছিল—সেটা এই মুহূর্তে যেন সে বেশী করে উপলব্ধি করলো। ভেবেছিল ইউরা-এই বিদায় তারার পক্ষে ভাল হবে। ইউরা যার কিছুই জানে না। তারাকে যার জন্য কতটা শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। এমনি বিলাপ করে কেঁদে চললো তারা। হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো ঘর খালি হয়ে গেছে লোকজনে, সরে এল সে কফিনের কাছ থেকে, ছয় জন লোক কফিনটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

তারা সেখানে আরো কয়েকদিন রইলো। তার সহায়তায় ইউরার কাগজ-পত্রের খোঁজই শুরু হলো। কিন্তু শেষ হলো তার ছাড়া। একদিন তারা বেরিয়ে পড়লো [illegible] বলল না। ইয়েভগ্রাভ ভাবলো রাস্তায় নিশ্চয়ই তারা গ্রেপ্তার হয়েছিল। তারপর তারা হয় মারা গেল, নয়তো নিখোঁজ হয়ে গেলো। উত্তর অঞ্চলে মেয়ে পুরুষ মেশানো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিলো। তারই একটাতে সেই বাঁধনহারা আত্মা [illegible] হয়ে গেল একদিন

পঞ্চদশ অধ্যায়

শেষ কথা

১৯৪৩ এর গ্রীষ্ম, ওরেল শহর শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। গর্ডন সম্প্রতি লেফটেনান্টের পদে উন্নীত হয়েছে। মেজর ডুডোরভও একসঙ্গে চাকরীতে ফিরেছে। তাদের দেখা হয়েছে পথে, চের্ণি নামে একটা শহরে রাত কাটালো তারা। সেই মরুপ্রদেশে একটা অক্ষত গোলাঘরে রাতে আশ্রয় নিলো। ভোরের দিকে গর্ডনের নড়া-চড়ার শব্দে ডুডোরভের ঘুম ভেঙে গেল। খড়ের গাদার উপর গর্ডন কাপড়-চোপড় একটা পুটুলিতে বেঁধে নিয়ে দরজার দিকে টলতে টলতে চললো।

যাবার পথে বাধা দিলো ডুডোরভ। বললো—'কোথায় যাচ্ছো'। গর্ডন জানালো নদীতে জামা কাচতে। ডুডোরভ ওর সঙ্গেই গেল। গত রাতের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো তারা।

কাপড় কাচতে গোপনে চললো তারা নদীর কিনারায়।

বোধহয় জুপা নদীর কিনারায় এল। কিন্তু এটা ছিল আনুমানিক। এটি জুপা নয়, কিন্তু জুপার ধারেই ক্রিষ্টিনার ঘটনাগুলো ঘটেছিলো। একটা পুরানো পাথরের বাড়ী ছিল সেখানে। খুব পুরানো জায়গা ছিল, পুরু দেওয়াল ছিলো, জার্মানরা সেটাকে পরিণত করেছিল দুর্ভেদ্য দুর্গে। বাড়িটা ছিলো পাহাড়ের মাথায়। সেখান থেকে সারা এলাকার উপর গোলা চালিয়ে গর্ডনের পথ আটকে দিয়েছিল। ঐ কেল্লা ধ্বংস না করলে রাস্তা অবরোধ থেকে যেত। এই সময় এসেছিল ক্রিষ্টিনা, সে অলৌকিক সাহস-বুদ্ধির দ্বারা জার্মান ব্যূহ ভেদ করে কেল্লা উড়িয়ে দিল। তারপর ধরা পড়ায় তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়েছিল। তবু ওকে ডুভোরভা বলা হয় না। কারণ সে ছিল বাগদত্তা, বিয়ে হয়নি। আশ্চর্য ছিলো ক্রিষ্টিনার বীরত্ব, মহান ছিলো তার মৃত্যু। তারপর গর্ডন ডুভোরভ-এর মধ্যে চলতে লাগলো কথাবার্তা। গর্ডন কাপড় কাচতে নামলো নদীতে। কিন্তু জিভাগো যিনি ইউরার ভাই—তিনিই নাকি এ অঞ্চলে এর বিষয় জানবার জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত।— কিন্তু না, অনেকক্ষণ কথা বলার জন্য আমাদের কাজ কিছু হচ্ছে না।

গর্ডনকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে কাপড় কাচতে দেখে অবাক হয়ে গেল ডুভোরভ। তার চোখ এড়ালো না—মৃদু হেসে বলল, "যেদিন থেকে শাস্তির শিবিরে নাম লিখিয়েছি, সেদিন থেকেই অন্যান্য শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে এই অভ্যাসটাও রপ্ত করেছি। আমাদের ক্যাম্পের নাম হোল "গুলাগ ৯২ ওয়াই এন ৯০। কি বীভৎস পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল আমাদের সেদিন, তবুও মনে মনে এই ভেবে পরম স্বস্তি-লাভ করেছিলাম যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের তুলনায় আমাদের ক্যাম্পের এই জঘন্য পরিবেশ অনেক অনেক ভালো।"

—"স্বীকার করছি, যুদ্ধ সমস্ত পরিবেশকে নারকীয় করে তুলেছিল, কিন্তু আমার মনে হয় এর একটা প্রয়োজন ছিল। কেননা, মনুষ্যত্বের এই চরম অপমান, স্বাধীনতার অপব্যবহার এর আগেই পৃথিবীটাকে বীভৎস করে তুলেছিল ব্যাপকভাবে। তাই প্রায় জীবন্মৃত মানুষগুলো হাঁপিয়ে উঠেছিল। প্রাণে মনে চেয়েছিল মুক্তি। এমনই সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো যুদ্ধ এল—হ্যাঁ, যুদ্ধের উন্মাদনার মধ্যেই, বিপ্লবের মধ্যেই আগামী মানুষের মুক্তির বীজ নিহিত। যুদ্ধের বিপুল উন্মাদনার স্রোতে, যা কিছু পুরানো জীর্ণ সব কিছু ধুয়ে মুছে যায়, নবীন প্রাণের জন্ম হয় সেই পূত অগ্নি থেকে।" ডুভোরভ বললে, ক্রিষ্টিনার সঙ্গে এখানেই আমার পরিচয় হয়। অবশ্য ওকে অনেকদিন আগেই দেখেছিলাম, তখন

ওর বয়স নিতান্ত কম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইতিহাসের ছাত্রী হয়ে পড়তে এল। কিন্তু আমার প্রতি ওর একটা কেন জানিনা প্রবল বিদ্বেষ ছিল। তখনও জানতাম না। যে ওর এই বিদ্বেষ আসলে আমার প্রতি গভীর ভালোবাসারই এক রূপান্তর।

৪১ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ যখন সবে শুরু হয়েছে তখনই আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হই। ঠিক করেছিলাম গ্রীষ্মের পর আমাদের বিয়ে হবে। কিন্তু এই মস্কোর যুদ্ধ আমাদের দুজনকে টেনে নিয়ে গেল অনেক দূরে। ওর সঙ্গে আর আমার কখনও দেখা হোল না। খোপানি টোনিয়া ওর নিকটতম বন্ধু—ফ্রন্ট লাইনেই আলাপ হয়েছিল ওদের। টোনিয়ার মুখটা ইউরোপীয় ধাঁচের- রুশদেশীয় বলে মনে হয়, তাই না? ওর নাম টোনিয়া ফালতু কেন রাখা হয়েছে বলতে পার? —"ফালতু' কথাটা এসেছে 'পিতৃহীন' শব্দ থেকে—গ্রাম্য উচ্চারণ এটা। লোকের মুখে মুখে এই বিস্তৃত লাভ করেছে।

কারাচেভ শহর ধ্বংসপ্রায়। এখানে এসে কয়েকটা ছোটখাট দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল গর্ডন আর ডুডোরভের। ওরেল ব্রিয়াংস্কের মধ্যবর্তী ব্রিয়ান-সিচনয়র সোনালী মাটি চকোলেটের রঙ ধরেছে রোদে পুড়ে পুড়ে।

গৃহহীন মানুষরা একটু মাথা গোঁজার জন্য পরিত্যক্ত ফেলে আসা টুকরো জোগাড়ে ব্যস্ত। চারদিকে কঙ্কালসার রুগ্ন মানুষের দল বাঁচবার শেষ আশাটা এখনও হারিয়ে ফেলতে পারেনি সম্পূর্ণ, বাঁচবার ক্ষীণ আশায় তার রক্তহীন পাংশুমুখে সামনের দিকে হেঁটে চলেছে আশায় আশায়।

দূরের জমিটা থেকে কালো, ধোঁয়াটে রঙের কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে উপরে তারপর আগুনের শিখা মাঝে মাঝে তেড়ে ফুড়ে উঠছে ওপারে আকাশটার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ জানিয়ে—এখান কর্মরত আশঙ্কাবিহ্বল মানুষরা তার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখছে, বিস্ফোরিত দাহসের প্রচণ্ড গর্জন ওদের কানে তালা ধরিয়ে দিছে। বিরাট পোড়ো জমটার মাঝখানে এই ধ্বংসাবশেষের উল্টোদিকে একটা সুন্দর গাছপালাবেষ্টিত ছায়া শীতল জমি পড়ে আছে—মনে হয়, যুদ্ধের বীভৎস তাণ্ডবলীলা এছানে প্রবেশাধিকার পায়নি।

গর্ডন আর ডুডোরভের সঙ্গে সঙ্গে টোনিয়া আরও কিছু লোকজন অপেক্ষা করছে, তাদের নিতে যে লরিটা আসবে তার জন্য।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন লরিটা এল না, তখন তারা সময় কাটাবার জন্য টোনিয়ার কথাই শুনতে লাগল মন দিয়ে। ও বলছিল, জেনারেল জিভাগোর সঙ্গে ওর সেই আকস্মিক সাক্ষাৎকারের কথা, ততোধিক বিস্ময়কর ওর কথাগুলো। "না উনি মোটেই ভয়ঙ্কর কিছু নয় সাধারণ মানুষের মতোই বড়ো দরদী ওর কথাগুলো। আমার সমস্ত কথা বেশ মন দিয়ে শুনলেন, আর শেষে যা বললেন তাতে আমি প্রায় অবাক হয়ে গেলাম। আপনারও বোধহয় অবাক হয়ে যাবেন ওর কথা শুনে, উনি বললেন, আমি বোধহয় তোমার কাকা, তোমাকে আমি কলেজে পড়াব, কেমন ?"

লোকেরা হয়ত কিছু বলতে চাইল, কিন্তু তার আগেই দূর থেকে একটা ঘোড়ায় টানা খালি গাড়ি এসে মাঠে ঢুকল, আর সঙ্গে সঙ্গেই লোকেরা ঘিরে ধরল, তাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবার জন্য। গাড়োয়ান রাজী হোল না, সে চলে যেতেই খালি গাড়িটাতেই শুধু সবাই জাঁকিয়ে বসল, আবার আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়ল।

"আমার মা ছিলেন রুশ মন্ত্রী কমারোভের স্ত্রী। কিন্তু জন্ম থেকেই আমি আমার মা বাবাকে কখনও দেখিনি, অনাথ আশ্রমেই আমি বড়ো হয়েছি।

শুনেছি, তখন আমরা সাইবেরিয়ায় শেষ চীনসীমান্তে বাস করতাম। যখন আমায় সাদা ঘাঁটিতে অর্থাৎ সাদা মঙ্গোলিয়ায় অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন আমার মাকে একটা স্পেশাল ভ্যানে তুলে দিয়ে বাবা চলে যাবার হুকুম দেন। তখনও অবশ্য উনি জানতেন না আমার কথা, বাচ্চা একদমই সহ্য করতে পারেন না কমারেভ কমারভ।

লালেরা যখন শহরে ঢুকতে লাগল তখন তার কথামতো সিগন্যাল সওয়ালী মারফাকে ডেকে পাঠালেন। পাহাড়ের মাথায় থাকতেন উনি, পাহাড়ের পথ বেয়ে ও শহরে সব্জি বেচতে আসত। জানি না, মা জেনে শুনে কি মার অজান্তেই ওরা আমায় মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, তার জন্য মারফা নাকি অনেক টাকা পেয়েছিল।

মারফা মাসির স্বামী মদ খেত কিন্তু মনটা খুবই উদার ও খোলামেলা ছিল। ঐ ছোট্ট বয়স থেকেই মারফার ওপর আমার প্রচণ্ড বিদ্বেষ জেগে ছিল, ওকে আমি কখনোও 'মা' বলতাম না। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা জাগত, বহুদিনের কথা মনে করে ভয়ে কাঁদতাম। কিন্তু আস্তে আস্তে সব কিছু

সয়ে যেতে লাগল, ঘরের সমস্ত কাজই আমি হাসি মুখে করতাম কিন্তু পেটিয়ার রোগা সরু পা দুটোর দিকে তাকিয়ে যখন মারফা মাসি আমার দিকে প্রবল ঈর্ষা নিয়ে তাকাত তখন ভয়ে সারা শরীর শিউরে উঠত। পেটিয়া অর্থাৎ মারফা মাসির ছেলেকে আমি খুবই ভালোবাসতাম।

তারপর ১৯২ -২২ সালের চরম মুদ্রাস্ফীতির সময় প্রচুর টাকা রোজগার করল মারফা মাসি তার গরুবিক্রি করে। আমার দিন মোটামুটি ভালই চলতে লাগল।

এক হেমন্তকালের সকালে গুরুতর পেটের পীড়ায় মুমূর্ষু এক বুড়ি এলো। বাবা উডায়াভের গাড়িতে জুড়ে তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। যাবার সময় বুড়ি বলেছিল, সে অনেক টাকা দেবে এর জন্য।

তার কিছুক্ষণ বাদেই দরজায় কড়া নড়ে উঠলো। বাবা এসেছে ভেবে মারফা মাসি যেই না দরজা খুলে দিল, অমনি এক ভীষণ কালো মোটা লোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকলো, বন্দুক উঁচিয়ে বলল, "শিগ্গির সব টাকা দিয়ে দাও। তোমার স্বামীকে খুন করেছি, তোমাকেও করত ম। কিন্তু সব টাকা দাও আগে।"

অনেক কাকুতি-মিনতি করেও যখন কিছু হোল না, তখন মারফা মাসি বলল, ঘরের তলায় ভাঁড়ারে টাকা আছে নীচে নেমে যাও। আমার মেয়েকে সঙ্গে দিচ্ছি আমি। ওর চালটা আমার কাছে অজানা রইল না, কেঁপে উঠলাম ভয়ে। কিন্তু ভগবান বাঁচিয়ে দিলেন আমার, লোকটা সব বুঝতে পেরে গেল। বুঝতে পারল আমি তার পেটের মেয়ে নই বলেই মারফা মাসি এমন ভয়াবহ বিপদের সামনে আমায় ঠেলে দিচ্ছে। প্রবল হেসে পেটিয়াকে নিয়ে নীচে নেমে গেল ও। আর যেই না ওরা নীচে নেমে গেল, পারও মারফা-মাসি দুম করে ঝাঁপটা বন্ধ করে তালা দিয়ে দিল। আর ট্রাঙ্কটা সরিয়ে গর্তটাকে ঢেকে দিল। সেই যমদূতটা প্রথমে চেঁচাতে লাগল আর তারপর ছোট্ট পেটিয়াকে কামড়ে কামড়ে মেরে ফেলল। আমি কাঁদলাম, চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম মারফাকে স্থানচ্যুত করতে—কিন্তু পারলাম না, মাটির নীচে ছোট্ট পেটিয়া মারা গেল করুণ চীৎকার করে। যমদূতটা মারা গেল, মারফা মাসিও উন্মাদ হয়ে গেল।

উডায়াভের ডাক শুনে সম্বিত ফিরে পেলাম। পালালাম, হাতে একটি মাত্র থলি। পাহাড়ের গা বেয়ে যখন দ্রুতপদে নামছি তখনই দূর থেকে ইঞ্জিনের বাঁশি কানে এল। দ্রুত মন স্থির করে নিলাম। উন্মাদের মতো দৌড়াতে লাগলাম রেললাইন লক্ষ করে—আলো দুলিয়ে ট্রেনটা থামালাম। এত রাত্রিতে ট্রেন

থামাতে পল্টনের দল নেমে এল গাড়ি থেকে। আমার মুখে সব শুনে সিগন্যাল ঘরে এল, মেঝের তলা থেকে টেনে বার করল দৈত্যটাকে। আর তারপর বড়ো কঠিন শাস্তি দিল—লাইনে হাত পা বেঁধে ট্রেনটা চালিয়ে দিল।

ঐ বীভৎস পরিবেশ থেকে বাঁচতে আমি ওদের সাহায্য চাইলাম। ওরা আমায় ট্রেনের কামরায় তুলে নিল। আর তারপর ওদের সঙ্গে সঙ্গেই আমি কতো জায়গায় যে ঘুরেছি, তার ইয়ত্তা নেই। দীর্ঘ বন্দীত্বের পর মুক্তির উল্লাসে আমি জেগে উঠলাম। ওখান থেকেই শুনলাম, ওই ট্রেনেই একজন যাত্রীর তত্ত্বাবধানে মারফা মাসি পাগলা গারদে ভর্তি হয়, সেখানে মৃত্যু হয় ওর।"

ওর গল্প শেষ হতেই লরি এলো। গাড়িতে উঠতে উঠতে গর্ডন বলল, বাস্তবে আর আদর্শে অনেক তফাৎ আছে। বাস্তবে যারা সৎ আদর্শে বিশ্বাসী হয়ত তাদের সঙ্গে মিল থাকতে না পারে। কিন্তু যথার্থই তারা মনীষীদের বংশধর। টোনিয়া হোল তাদেরই একজন।

পাঁচ কিংবা দশবছর পরে রাশিয়ার এক গ্রীষ্মকাল। বিশাল শহরের বিরাট অট্টালিকার নির্জন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে আলোচনারত গর্ডন আর ডুডোরভ। হাতে ধরা তাদের ইউরার লেখা ইয়েভগ্রাভের সঙ্কলিত বইটি।

এখন তাদের চুলে পাক ধরছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে প্রচুর, চিন্তাও হয়েছে পরিণত! গ্রন্থকারের জন্মভূমি, যার সঙ্গে পরিচিত ইউরা আন্দ্রোইয়োভিচ সেই মস্কো যেন এক রহস্যময়ী নায়িকা—ইউরার লেখা ঘটনায় যার সূচনা, তারই পরিণতি যেন চোখে ভেসে উঠল—এখন আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের রাশিয়ার সঙ্গে ওরা যেতে লাগলো—স্বাধীনতার নীরব সঙ্গীত যাদের কীর্তির গৌরব নিয়ে আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে—সেই বিপ্লবীদের সঙ্গে একাত্ম বইটার দিকে পূর্ণ আনন্দে তাকাল ওরা। পড়তে চেষ্টা করল ওরা ভবিষ্যতের ঠিকানা।

॥ সমাপ্ত ॥